# উত্তরতিরিশ

প্রথম প্রকাশ

১৯৪৫

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশক

জে. এন. সিংহ রায়

নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড

২২, ক্যানিং স্ট্রীট

কলকাতা-১

প্রচ্ছদপট

অজিত গুপ্ত

মুদ্রক

রণজিৎ কুমার দত্ত

নবশক্তি প্রেস

১২৩, লোয়ার সার্কুলার রোড

কলকাতা-১৪

চার টাকা

# উত্তরতিরিশ

বুদ্ধদেব বসু

নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড
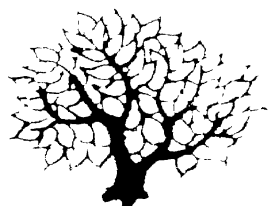
'উত্তরতিরিশে'র দ্বিতীয় সংস্করণে ছুটি নতুন প্রবন্ধ যোগ করা হ'লো : 'সবচেয়ে দুঃখের দু-ঘণ্টা' ও 'নোয়াখালি'।

বু. ব.

# সূচীপত্র

শ্রী যতীন্দ্রমোহন ও শোভনা মজুমদার

যুগলকরকমলে
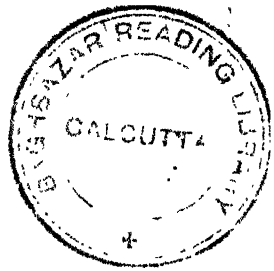
# উত্তরতিরিশ

আমি এখন আছি তিরিশ আর চল্লিশের মাঝামাঝি জায়গায়। সেখান থেকে তিরিশ যত দূর, চল্লিশও প্রায় তা-ই। অবস্থাটাকে বলা যেতে পারে প্রৌঢ়ত্বের শৈশব। আমার জীবনে যৌবন যখন সগুোজাত, সেই রঙিন বছরগুলিতে তিরিশের ধূসর দিগন্ত একটা অস্পষ্ট বিভীষিকার মতো বোধ হ'তো। ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের উদাহরণে উৎসাহিত হ'য়ে মনে-মনে এও প্রার্থনা করেছি যে ঐ শোচনীয় পরিণাম আসন্ন হবার পূর্বেই আমার জীবনের যেন অবসান হয়। খেয়ালি নিয়তি আমার সে-প্রার্থনা মঞ্জুর করেনি। ভাগ্যিশ করেনি!

আমাদের যে বয়স বাড়ছে তার অনুভূতি নিজের মধ্যে অনেক সময়ই স্পষ্ট হয় না। এই দেহটাকে অনেকদিন ধ'রে ভোগ করবার মাশুলস্বরূপ মৃত্যুর নানা অগ্রদূত যতদিন না জানানি দিতে শুরু করে, ততদিন বয়োবৃদ্ধির অনস্বীকার্য ঘটনাকে প্রায় ভুলে'ই থাকি। বিশেষ ক'রে জীবনের মধ্যবয়সে চারদিকে কর্মের তরঙ্গ যখন উদ্বেল, তখন সে-দিকে মন দেবারই সময় থাকে না। পৃথিবীর সূর্য-পরিক্রমণের একটি অনভিপ্রেত কিন্তু নিশ্চিত ফল এই যে, আমার জন্মের তারিখটি প্রতি বছরেই ঘুরে-ঘুরে একবার এসে হাজির হবে; কিন্তু তার সম্বন্ধে বালকের আগ্রহ কিংবা চিরযৌবনলুব্ধা বিগতযৌবনার উৎকণ্ঠা কোনোটাই অনুভব করি না। সে জড়িয়ে ধরবার

মতো ক্ষণিকের প্রণয়ী অতিথিও নয়, এড়িয়ে যাবার মতো ভয়ংকরও নয় সে ; সে যেন কোনো বাল্যবন্ধু, পঁচিশ বছর আগে যার সঙ্গে খুবই ভাব ছিলো, কিন্তু অধুনা যার সঙ্গে যোগসূত্র গেছে ছিন্ন হ'য়ে, এখন কদাচ রাস্তায় দেখা হ'লে একটু মাথা নেড়ে আপন কাজের তাড়নায় নির্দিষ্ট পথে ধাবিত হই। ওর বাৎসরিক আবির্ভাব যে যৌবনের চোর এবং জরা-মৃত্যুর দেহ-দেশ-ব্যাপ্ত পঞ্চমবাহিনী, সে-কথা তথ্য হিশেবে নির্ভুল ব'লে জানি, কিন্তু সত্য ব'লে অনুভব করি না।

তাই ব'লে এমনও নয় যে বয়স বাড়বার খবরটা আমরা একেবারেই ভুলে' থাকতে পারি। মনে করিয়ে দেবার জন্য আছে বাইরের জগৎ। যেমন রেলগাড়ির ভিতরে ব'সে তার গতিটা উপলব্ধি করতে হ'লে তাকাতে হয় বাইরের বিপরীত-ধাবমান গাছপালার দিকে, তেমনি বহির্জগতের পরিবর্তনের ছবি দেখেই আমরা অনুভব করতে পারি যে আমাদের বয়স বাড়ছে। বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের যে-আন্তরিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে, প্রকৃতির যে-কোনো প্রক্রিয়ার মতোই তা এমন একটি নিখুঁত ছন্দে বাঁধা যে তা সহজে লক্ষ্যগোচর হয় না ; আমাদের ছেলেপুলেরা যে বাড়ছে তা যেমন আমরা বুঝেও বুঝি না, তেমনি আমরা নিজেরা যে বদলাচ্ছি তাও নিজের কাছে স্পষ্ট হ'তে-হ'তে অনেকগুলো বছর কেটে যায়। মনে-মনে কেমন একটা ধারণা থাকে, এখনো সেই কলেজের ছাত্রই আছি বুঝি— এই তো সেদিন কম্পিত বক্ষে ম্যাট্রিকুলেশনের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়েছিলুম। স্মৃতির ভেলকিতে মাঝখানকার অনেকগুলো বছর ঝাপসা হ'য়ে আসে, জীবনের অতীতাংশ

যতই বছরে বাড়তে থাকে, ততই দূর অতীতের কাছে চ'লে আসবার ঝোঁক দেখা যায়। বার্ধক্যে বাল্যস্মৃতিই হয় প্রিয়তম আলোচ্য। পূর্বজন্মের সংস্কার নিয়ে জীবন যখন অনায়াসে চলতে থাকে, এমন সময় একদিন দেখি সদ্য এম. এ.-পাশ-করা ছেলেরা আমার কাছে এসে খুব সমীহ ক'রে কথা বলছে। সাহিত্যে যারা নবাগত তাদের নতচক্ষু বিনয় দেখে মুগ্ধ হ'য়ে যাই। আরো বেশি মুগ্ধ হই, যখন দেখি আমার বিরুদ্ধে তরুণতরদের রসনা ও লেখনীর দুর্দম উদ্যম। তখনই বুঝতে পারি, আমার বয়স হয়েছে। যাদের সমবয়সি ব'লে গ্রহণ করেছি তাদের সঙ্গে আমার এক যুগের তফাৎ। সাহিত্যক্ষেত্রে এক যুগের তফাৎ প্রায়ই দুর্লঙ্ঘ্য, দু-তিন যুগ কেটে গেলে আবার প্রশস্ত হয় মিলনের ক্ষেত্র। যে-আমি একদিন ছিলাম তরুণ লেখকদের মধ্যে তরুণতম, সেই আমাকে এখন থেকে তরুণদের হাতে ক্রমাগত মার খেতে হবে, এ-কথা ভেবে কাল-রহস্যের বিচিত্রতায় রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠি। নবযুবকের দল যদি আমার বিরুদ্ধতা না করতো, সেটা হ'তো প্রকৃতির বিরুদ্ধতা। পূর্ববর্তীকে এই আক্রমণ ওদের যৌবনের স্বাক্ষর, আর আমার আসন্ন প্রৌঢ়ত্বের অভিজ্ঞান।

এদিকে হয়তো একদিন দেখা হয় কোনো-একটি তরুণীর সঙ্গে— দস্তুরমতো ভদ্রমহিলা, বিবাহিতা, মাতা, সংসারের বিচিত্র বন্ধনে স্নিগ্ধ গম্ভীর। অবাক হ'য়ে খবর শুনি যে ইনি সেই বালিকা, যাকে মাতা-ঈভের সজ্জায় ধেই-ধেই ক'রে লাফাতে দেখেছি। সেই সঙ্গে দেখি কলেজের সহপাঠিনীকে, সংস্কৃতের অধ্যাপক যাকে ভুল ক'রে ডাকতেন বনশ্রী ব'লে,

তার মুখে জরার সুস্পষ্ট মানচিত্র। তারপর হঠাৎ একদিন বন্ধুকন্যার বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র আসে। সব মিলিয়ে আমাকে মনে করিয়ে দেয় যে আমি বয়স্ক; আমাকে বয়স্ক বানিয়ে ছাড়ে। নিজের ভিতরের পরিবর্তন সহজে ধরা পড়ে না, কিন্তু বহির্জগতের এই পরিবর্তন-স্রোত বার-বার আমার মনের তটরেখায় ধাক্কা দিয়ে ব'লে যায়—বয়স বাড়ছে, বুড়ো হ'তে চলেছো। তার পৌনঃপুনিক পরামর্শ শেষ পর্যন্ত আর অবজ্ঞা করতে পারি না, বয়স্কোচিত স্থৈর্য ও গাম্ভীর্যের ভাব ধরি; আমি-যে আর যুবক নই সে-কথা অনায়াসে মেনে নিই, এবং তার জন্য মনে কোনো দুঃখও হয় না।

অন্তত, আমার তো হয়নি। বরং যৌবনের ঝড়-ঝাপটা পেরিয়ে মধ্য বয়সের গভীর গম্ভীর একাগ্রতায় যে পৌঁছতে পেরেছি, এতে আমি আনন্দিত।

আমার মনে হয় যৌবনকে নিয়ে কবিরা চিরকালই কিছু বাড়াবাড়ি করেছেন। এত স্তব, এত স্তুতি, এত ছন্দ—সে কার উদ্দেশে? কত মুগ্ধ ভক্তের অর্ঘ্যনিবেদন শতাব্দীর স্রোত পার হ'য়ে এসে পড়ছে কায়িক যৌবনের একটি মনোহারিণী প্রতিমার পায়ে, যার রূপের অনেকখানি কবিকল্পনা থেকেই আহরিত। আর যেহেতু কবিরা বেশির ভাগই পুরুষ, সেই প্রতিমা নারীদেহেরই অবয়ব দিয়ে গড়া। তাহ'লে দাঁড়াচ্ছে এই যে, নারীদেহে যৌবনসমাগমের যে-ব্যঞ্জনাটি প্রাকৃতিক কারণেই সুনির্দিষ্ট, তারই বন্দনায় বিশ্বের কবিকুল মুখর। কবিদের পক্ষে খুব প্রশংসার কথা নয় এটা, কিন্তু কথাটা কি সত্য নয়?

তবে কবিদের পক্ষেও বলবার কথা আছে। যৌবনের যে-সংকীর্ণ সংজ্ঞা আমি দিয়েছি তা হয়তো তাঁরা সম্পূর্ণ মেনে নিতে রাজি হবেন না। তাঁরা হয়তো বলবেন : বিশ্বপ্রকৃতির আদিম প্রাণশক্তি যেখানেই অখণ্ডরূপে প্রকাশিত, সেখানেই আমাদের অভিনন্দন উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে ; সূর্যোদয় আমাদের মুগ্ধ করে, সমুদ্র আমাদের রক্তে ঢেউ তোলে, বসন্তে সবুজ গাছটির দিকে তাকিয়ে চোখে আমাদের পলক পড়ে না। মানুষের দেহে যৌবনবিকাশও সেই আদিম প্রাণশক্তিরই একটি উচ্ছ্বাস, তাই সে এত সুন্দর ; সে-উচ্ছ্বাসের আধার যখন হয় নারী তখন আমাদের সর্বদেহমনের ব্যাকুলতা দিয়ে যে তার ভজনা করি তার কারণ প্রাকৃতিক হ'লেও নিতান্তই জৈব নয়। ওর সমস্তটাই সৃষ্টির আদিলীলার অন্তর্গত ; যে-বিশ্বশক্তির টানে নদীতে জোয়ার আসে, বসন্তে ফুল ফোটে, এখানে আমরা তারই অধীন। কবিরা বলবেন, এ-জিনিশটাকে ছোটো ক'রে দেখো না। বস্তুর দিকে না তাকিয়ে ভাবের দিকে চেয়ে ছাখো। কোনো বিশেষ-একটি মেয়ের দেহে যৌবনের আবির্ভাব একটা জীবতত্ত্বঘটিত তথ্য মাত্র, তা নিয়ে বিস্মিত কি উল্লসিত হবার কিছু নেই ; কিন্তু বাসনার যে-বিপুল আলোড়ন সে নিজের অজানিতেই তার চারদিকে বিস্তার করে, যে-মোহ সে ছড়ায়, যে-স্বপ্নে সে জড়ায়, তারই বন্দনা যুগে-যুগে যদি আমরা না করি, তবে আমরা কবি কিসের। যৌবনের ক্ষয় আছে, কিন্তু সেই মোহ তো চিরন্তন, সেই মোহই তো আমাদের অনন্তযৌবনা উর্বশী।

কবিদের এ-কথা মেনে নিয়েও বলা যায় যে পৃথিবীর কাব্য-সাহিত্যে নিছক শারীরিক যৌবনের বন্দনার পরিমাণও বড়ো কম নয়। বিশেষত, কবিরা নিজেরা যখন সভ্যযৌবনাপন্ন, সেই সময়টায় যৌবনের তথ্যকেই সত্যরূপে চিত্রিত করার ঝোঁক প্রবল হ'য়ে ওঠে। স্বয়ং শেক্সপিয়র কাঁচা বয়সে 'ভিনাস অ্যাণ্ড অ্যাডনিস' লিখেছিলেন। যৌবনই প্রাণীজীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতার সময়, এই ধারণাটি নানা ভাষার কাব্যে বার-বার ফিরে-ফিরে এসেছে। 'The days of our youth are the days of our glory';—যখন জীবন-তরণী অনুকূল হাওয়ায় পাল তুলে মৃদু তালে ভেসে চলে— 'Youth at the prow and Pleasure at the helm',— তার সঙ্গে কি অন্য-কোনো অবস্থার তুলনা হয়! যৌবন যে ক্ষণিক, সে-বিষয়েও কবিদের বোধ তীব্র; তাই এই অচিরস্থায়ী স্বর্ণযুগটুকু হেলায় না-হারিয়ে তার যথোচিত সদ্ব্যবহার করো, এই পরামর্শ অনেকবারই তাঁরা দিয়েছেন। 'Gather ye rose-buds while ye may.' প্রৌঢ়ত্বের কাছাকাছি এসে হারানো যৌবনের জন্য বিলাপ করেছেন অনেক কবি—'When we *were* young! Ah, woeful when!' রবীন্দ্রনাথও করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপের সঙ্গে একটি সূক্ষ্ম হাস্যের চকিত আভা ধরা পড়ে; যৌবন চ'লে যাচ্ছে তা ঠিক, কিন্তু আমি জানি ও যাবার নয়—তাঁর ভাবখানা যেন এই রকম। তাঁর যৌবন-বিদায় যেন তাঁরই বর্ণিত প্রেমিকের বিদায়ের মতো—

উত্তর তিরিশ

ভাবচ তুমি মনে-মনে
এ লোকটি নয় যাবার,
দ্বারের কাছে ঘুরে ঘুরে
ফিরে আসবে আবার —

ওতে অনেকখানি ছল আছে। এ যেন সদর দরজায় বন্ধুকে বিদায় দিয়ে খিড়কির দোর দিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনা— তাই করুণ কাতর বিদায়-বাণী বলতে গিয়েও মুখের হাসি চাপা থাকছে না। এইজন্য 'ক্ষণিকা'তে হাসি-কান্নার এই বিচিত্র বিজড়িত লীলা, এইজন্য পঞ্চাশোর্ধ্বে 'বলাকা'র অপরূপ যৌবন-বন্দনা। রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই যৌবনের তথ্যকে বড়ো ক'রে দেখেননি, তার সত্যকেই দেখেছিলেন— সে-কথা স্পষ্ট বলা আছে 'চিত্রাঙ্গদা'য়; তাঁর সাধনা যৌবনের আয়ুর উদ্দেশে নয়, তার আত্মার উদ্দেশে, এবং সে-সাধনায়, আমরা সকলেই জানি, কী অসামান্য তাঁর সিদ্ধি। (যৌবনের যে-পরশমণির স্পর্শ আছে 'বলাকা'য়, কোনো তরুণ রূপ-পূজকের সাধ্য নেই তা দিতে পারে। সত্তরের মোহানায় এসে তিনি প্রশ্ন করলেন:

যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি
হে কালের অধীশ্বর, অন্য মনে গিয়েছো কি ভুলি'?

জবাব দিলেন নিজেই:

নহে, নহে, আছে তারা; নিয়েছ তাদের সংহরিয়া
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে …

আশি বছরের রোগ-জর্জর দেহে যখন তিনি বন্দী, তখনও তাঁর মধ্যে দেখেছি যৌবনের এই উপলব্ধি। মানবজীবনে

চিরযৌবনের যদি কোনো মানে থাকে সে তো এ-ই, এ ছাড়া আর কী? রবীন্দ্রনাথই প্রকৃতপক্ষে যৌবনের কবি—হেরিক নন, বায়রন নন, ভারতচন্দ্র নন।

তবে যৌবনের যেটা নিতান্ত দৈহিক দিক, তার নুন আমরা সকলেই কোনো-না-কোনো সময়ে খেয়ে থাকি, অতএব তার গুণ গাইবার লোক কোনোকালেই বিরল হয় না। তার আবির্ভাব দেহে-মনে এমন একটি জন্মান্তরকারী বিপ্লব আনে, যার সংঘাতে কবিতা ফুটবেই। আমি শুধু বলতে চাই যে ঐ অবস্থাটাকে কবিতায় যতটা সুখের ব'লে বর্ণনা করা হয় আসলে তা তত সুখের হয় না—অনেকের পক্ষেই হয় না। নবযৌবনের অকারণ পুলকের সঙ্গে অনেকখানি অনর্থক দুঃখও জড়িত, যাদের স্বভাব কল্পনাপ্রবণ তাদের পক্ষে সে-দুঃখ প্রায় দুঃসহ হ'য়ে উঠতে পারে। একদিকে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, অন্যদিকে চারদিকের পাথরের দেয়ালে নির্ঝরের কপাল ঠুকে মরা। একদিকে আশ্চর্য জাগরণ, বিশ্বজগতের সঙ্গে সচেতন মনের প্রথম রোমাঞ্চকর পরিচয়, অন্য দিকে নিরন্তর আত্ম-নিপীড়ন, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সংগতি-স্থাপনের অক্ষমতাজনিত অফুরন্ত যন্ত্রণাভোগ। এক হিশেবে ষোলো বছরের ছেলের মতো দুঃখী আর নেই; তার নবজাগ্রত, বিনিদ্র আত্মচেতনা তাকে এক মুহূর্তের শান্তি দেয় না; তার চালচলন, হাবভাব, কথাবার্তা সবই কেমন খাপছাড়া; সামাজিক পরিবেশে সে অত্যন্ত অসংগত, এবং সে নিজেও তা জানে। তাতে তার দুঃখ বাড়ে বই কমে না। মনে-মনে তার ধারণা যে পৃথিবীটাকে বদলে দেবার জন্যই সে

এসেছে, কিন্তু তার ইচ্ছেমতো পৃথিবীর এক চুল বদল হচ্ছে না, সব দিকেই বয়স্কদের পাষাণ-রাজত্ব অটুট থেকে যাচ্ছে ; এমনকি বাস্তব জীবনে সে নিজেও তার আদর্শকে সব সময় অক্ষুণ্ণ রাখতে পারছে না, প্রায়ই ঘটছে স্খলন-পতন, এবং এ নিয়ে তার মনে একটি তীব্র বিক্ষোভের তোলপাড় অবিশ্রান্ত চলেছে। শুধু তা-ই নয়, তার এই দুঃখে সে নিতান্ত নিঃসঙ্গ, কারণ দুঃখটা যে তার ঠিক কী নিয়ে, তা ধারণা করবার মতো পরিণত চিন্তাশক্তি তার নেই, তার উপর মুখের কথায় মনের ভাব প্রকাশ করবার কৌশলও সে শেখেনি। তাই ঠিক তার মনের কথাটি কাউকেই সে বলতে পারে না—খুব অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও না—বোবা দুঃখের বোঝা অসহায়ভাবে ব'য়ে বেড়াতে হয়। যে-সব উপলক্ষ্যে তার দুঃখের অনুভূতি প্রবল হ'য়ে ওঠে সেগুলি প্রায়ই তুচ্ছ—পরবর্তী জীবনে যে-সব স্মরণ ক'রে হয়তো তার হাসি পায়—কিংবা পায় না। যাঁরা একেবারেই পাকা হিশেবিয়ানার উচ্চচূড়ায় অধিরূঢ় না হন তাঁদের পক্ষে হাসি না-পাওয়াই স্বাভাবিক, কারণ উপলক্ষ্যটা যা-ই হোক, দুঃখটা তো বাস্তব, সেটাকে অস্বীকার করা যায় না। শিশু তার পুতুলের পা ভাঙলে কাঁদে, আমাদের চোখে কারণটা অতি তুচ্ছ, কিন্তু তাই ব'লে তার দুঃখটা তো কম নয়। সে-দুঃখের স্থায়িত্ব হয়তো অল্প, কিন্তু তীব্রতা খুবই বেশি। শেলির বিষয়ে লিখতে গিয়ে ফ্রান্সিস টমসন ঠিকই বলেছিলেন যে শিশুর দুঃখ যেমন ছোটো, শিশুও তো ছোটো। ছোটো মানুষের পক্ষে ছোটো দুঃখের নিপীড়নই দুঃসহ। কথাটা

এত সত্য যে বলবার যোগ্যই হ'তো না, যদি-না দেখা যেতো যে ব্যবহারিক জীবনে আমরা প্রায়ই এটা ভুলে থাকি।

নবযৌবনের এই যে ছবি আমি আঁকলুম তা সকল বয়স্কজনের স্মৃতির সঙ্গে মিলবে কিনা জানি না। আমি অবশ্য আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। হয়তো আমি অত্যন্ত বেশি ভাবপ্রবণ ছিলুম ব'লে অত্যন্ত বেশি কষ্ট পেয়েছি। আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমার বয়স যখন আঠারোর অঞ্চলে, আমি মনে-মনে এ-প্রার্থনাও জানিয়েছি— ঈশ্বর, আমাকে খুব চটপট বুড়ো ক'রে দাও, তাহ'লে বাঁচি। এ-প্রার্থনায় আন্তরিকতার অভাব ছিলো না, কেননা চারদিকে তাকিয়ে দেখেছি বয়স্কদের প্রশান্ত নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা; তারা খায় দায়, আপিশ করে, ঘুমোয়, কিছু নিয়ে ছটফট করে না— এদিকে আমি কত কিছু নিয়েই দিন-রাত জ্ব'লে-পুড়ে মরছি। সে-বয়সেও এটা বুঝেছিলাম যে আমার অতি-তারুণ্যই আমার এই যন্ত্রণাভোগের হেতু, বুড়োদের যতই না মুখে ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছি, মনে-মনে তাদের হিংসে না-ক'রেও পারিনি। আমার সেই কাঁচা বয়সের মন ছিলো এত বেশি অনুভূতিশীল যে সেটা প্রায় একটা ব্যাধির মতো, যে-কোনো দিক থেকে একটুখানি হাওয়া দিলেই আমি উদ্দাম হ'য়ে উঠতুম, নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাতে নিজেকে এক-এক সময় মনে হ'তো ঝড়ের ঝাপটা-খাওয়া ক্ষত-বিক্ষত জাহাজের মতো।

বেঁচেছি। যৌবনের উত্তাল জলরাশি পার হ'য়ে এসেছি, প্রৌঢ়ত্বের শান্ত দিগন্ত দেখা যাচ্ছে চোখের সামনে। যদি দেবতা এসে বর দিতে চান— তোমাকে আবার আঠারো

বছরের যুবা ক'রে দিচ্ছি, আমি হাত জোড় ক'রে বলবো, দোহাই তোমার, প্রভু, বর ফিরিয়ে নাও। আঠারো হবার দুঃখ একবার যে পেয়েছে, সে কি আবার সেখানে ফিরে যেতে চাইবে! অনেকে বলেন, আহা, শিশুরা কী সুখী! যদি আবার শিশু হ'তে পারতুম! কথাটা মোটেও চিন্তা ক'রে বলেন না। শিশুর মন সচেতন নয়; তার কল্পনা আছে, চিন্তা নেই; তাই তার সুখদুঃখ কুয়াশার মতো ব্যাপ্ত কিন্তু অনবয়ব; আর বয়স্কদের শাসনে শিশুর জীবন এমন আষ্টে-পৃষ্ঠে বিজড়িত যে আমার তো মনে হয় তার জীবনে দুঃখের ভাগই বেশি। বেচারারা কি ইচ্ছেমতো দেয়ালে ছবি আঁকতে পারে, না কি সোফার কাপড় কাটতে কিংবা নিজেদের হাত-পা ভাঙতেও পারে! এমনকি তারা রেলগাড়ির জানলার ধারে বসলেও আমরা হৈ-হৈ ক'রে উঠি। নিজস্ব দেহের কিংবা পৈতৃক সম্পত্তির যেটুকু ভাঙচুর তারা ক'রে উঠতে পারে, সে নেহাৎই বয়স্কদের কঠিন প্রহরী-দৃষ্টি এড়িয়ে, এবং বিধাতার অবিমিশ্র আশীর্বাদে। কোনোরকমে যে একবার সাবালক হ'য়ে উঠতে পেরেছে, সে যে কী ক'রে আবার শৈশবে ফিরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে, আমার তা কল্পনার অতীত। ঠিক তেমনি অবিশ্বাস্য মনে হয় যখন বয়স্ক লোক তারুণ্যের উন্মত্ততায় আরো একবার ঝাঁপ দিতে চায়।

তারুণ্যের উন্মাদনা শেষ হয়েছে, বেঁচেছি। জীবনে মধ্যবয়সের স্থৈর্য এসেছে, বেঁচেছি। যে-কোনো ক্ষণিক আকস্মিক হাওয়ায় আর আন্দোলিত হ'তে হয় না। একটি

মুহূর্তের একটি অনুভূতি আর মনকে ধ'রে নাচিয়ে বেড়াতে পারে না। যখন-তখন যে-কোনো কারণে-অকারণে চিত্তবিক্ষেপ আর ঘটে না, হাতের কাজে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট হ'তে পারি, এদিকে অবকাশসম্ভোগের আনন্দকেও থামকা মন-খারাপের হাওয়া এসে মলিন করতে পারে না। রাগ চাপতে শিখেছি, শিখেছি উদ্যত অভিমানকে এক চড়ে দাবিয়ে দিতে, ফুটো কলসী থেকে জলের মতো ভালোবাসা আর যেখানে-সেখানে ঝরঝর ক'রে ঝ'রে পড়ে না। তুচ্ছকে তুচ্ছ ব'লে অবজ্ঞা করার শক্তি পেয়েছি। জীবনে দুঃখের ভাগ আশ্চর্যরকম ক'মে গিয়েছে। সেই সঙ্গে সুখও কি কমেছে? না তো।

আমার বিশ্বাস জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় যৌবন নয়, জীবনের মাঝামাঝি অবস্থাটাই সবচেয়ে ভালো। আমি নিজে আপাতত ঐ অবস্থায় এসে পড়েছি ব'লেই যে তার প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করছি, তা নয়; শুনতে পাই বর্তমানকে অবজ্ঞা ক'রে অতীতের অতিরঞ্জিত স্তাবকতা করাই মনুষ্য-স্বভাব। তার উপর জীবন যখন মধ্যদিনে, তখন ভোরবেলার সোনালি আলোর জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলাই সাহিত্যের ঐতিহ্য-সংগত। কিন্তু সত্যি বলছি, এই সময়টাতেই জীবন সবচেয়ে উপভোগ্য, অন্তত আমার তো তা-ই বোধ হচ্ছে। দেহের ও মনের, ইন্দ্রিয়ের ও বুদ্ধির পরিপূর্ণ শক্তির আমি এখন অধিকারী, জরার আভাসমাত্র পাওয়া যাচ্ছে না; অথচ সে-শক্তি যেখানে-সেখানে ডন কুইক্সোটীয় চালে অন্ধ বেগে ধাবিত হচ্ছে না, তাকে সংহৃত রেখে তার যথাসম্ভব সুমিত

প্রয়োগের বিদ্যা আমার শেখা হয়েছে। কাঁচা বয়সে জীবন ছিলো গুরুজনের শৃঙ্খলে জড়িত; এখন আমি স্বাধীন, নিজের জীবিকা একান্তরূপে নিজেই উপার্জন করি, আমার উপর কথা বলবার কেউ নেই। এই স্বাধীনতা যে কত আনন্দের তা কেমন ক'রে বোঝাই। স্বোপার্জিত অন্নের প্রথম স্বাদ আমার মনে এনেছিলো এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, সে-রোমাঞ্চ এতদিনের অভ্যাসের চাপেও একেবারে নষ্ট হয়নি। জীবিকা-অর্জনের যে-পরিশ্রম ও বিরক্তি সেটা কখনোই যে নিপীড়ক ব'লে বোধ হয় না তা বলবো না, কিন্তু মোটের উপর ওটাকে আমি কিছু মনেই করিনে, তার বিনিময়ে যে-স্বাধীনতা পেয়েছি তাতে ক্ষতিপূরণ হ'য়েও অনেকখানি হাতে থাকে। তার উপর, আমি বিশেষভাবে ভাগ্যবান, কারণ আমার জীবিকার কিছু অংশ আমার আনন্দের সঙ্গে মিলিত; আমাকে যে সব সময়ই নিরানন্দ অপ্রিয় কাজ করতে হয় না এ-জন্য নামহীন অদৃষ্টের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা স্বতই উচ্ছ্বসিত। এই সাহিত্যরচনা আমার জীবিকাও বটে, আনন্দও বটে; আমার কাজের আর খেলার স্রোত এখানে এক হ'য়ে গেছে, এবং আধুনিক জগতে কাজে যার আনন্দ সে-ই তো ভাগ্যবান।

তরুণ বয়সে মনে-মনে ভয় ছিলো যে প্রৌঢ়ত্বের প্রভাবে আমারও হৃদয়বৃত্তি হয়তো নিঃসাড় হ'তে আরম্ভ করবে। কিন্তু এখন দেখছি যে তা তো হ'লো না। অনেকেরই হয়— আবার কারো-কারো হয়ও না; কেন হয় না, সে-আলোচনায় গিয়ে কাজ নেই। বিশ্বজগতের সঙ্গে এখন আমার

কী সম্বন্ধ, সেটা স্পষ্ট ক'রে বোঝবার যখন চেষ্টা করি, তখন দেখতে পাই যে নবযৌবনের শক্তি তার অমিত অনুভূতিশীলতায়, তার দুর্বলতা তার ভারসাম্যের, তার মাত্রাজ্ঞানের অভাবে। আর পরিণত বয়সের শক্তি তার সংযমে, তার বুদ্ধির বলশালিতায়, তার দুর্বলতা তার হৃদয়-বৃত্তির ক্ষীণতায়, তার উৎসাহের রক্তহীনতায়। 'If youth could and age would!' এই তো চিরকালের আক্ষেপ। কিন্তু একটা অবস্থা নিশ্চয়ই আছে যখন উভয়শক্তির মিলন হয়, নয়তো পৃথিবীতে এত বড়ো-বড়ো কাজ সম্পন্ন হ'তে পারতো না। সেটাই মধ্যবয়স।

দেখতে পাচ্ছি পৃথিবী সম্বন্ধে আমার কৌতূহল, আমার আনন্দবোধে এখনো মরচে পড়ার লক্ষণ নেই। অশিথিল উৎসাহ নানা কর্মস্রোতে প্রবাহিত। কাঁচা বয়সের অনুভূতির প্রবলতা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, তার প্রয়োগ-বিদ্যা তখনও অনায়ত্ত, তাই ও-বয়সে ভালো কবিতা লেখা সম্ভব হ'লেও অন্য কোনো দিকেই কাজের মতো কাজ প্রায় কিছুই হ'য়ে ওঠে না। নবযৌবনের বিপুল ব্যর্থতা প্রকৃতিরই নির্দেশ, অনেকখানি অপব্যয় না-ক'রে প্রকৃতি কিছুই গড়তে পারে না; মানুষের দেহ যেমন বহু শতাব্দীব্যাপী অমিতব্যয়ী বিবর্তনের ফল, তেমনি শৈশব-যৌবনের বিস্তর বাজে খরচের ফলেই মানুষের পরিণত মন গ'ড়ে ওঠে। এখন আমার অনুভূতির সঙ্গে মিলেছে পর্যবেক্ষণ; উৎসাহের উচ্ছলতা বুদ্ধির দৃঢ়তাকে অঙ্গীকার ক'রে নিয়েছে; প্রতিদিনের হাতে এই শিক্ষাই আমি পাচ্ছি কেমন ক'রে মনের সচেতনতাকে,

হৃদয়ের সংবেদনাকে জীবনক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হয়— আর এখানেই নবযুবকের উপর আমার জিৎ। বিশ্বপ্রকৃতিকে যেন এইমাত্র প্রথম দেখলুম, নবযৌবনে এই আনন্দ অস্পষ্ট ভাব-নীহারিকার আকারে মনের আকাশ আচ্ছন্ন ক'রে রাখে; সে-আনন্দ অনেকটা নিপীড়নেরই মতো, তার বিদ্যুৎময় স্পর্শ প্রায় শ্বাসরোধকারী। এখন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার দেখাশোনা প্রতিদিনের নতুন আলোয়, প্রতি মুহূর্তের নতুন কোণ থেকে, সেটা কেবলই একটা ভাব আর নয়, সেটা রূপ; তাকে শুধুই অনুভব করি না, তাকে চোখেও দেখি। এই দেখার পটভূমিকায় আছে অতীত জীবনের সঞ্চিত অচেতন অভিজ্ঞতা; তারই আলোয় বস্তু স্পষ্ট আকার নেয়, যা ছিলো হাওয়া তা হ'য়ে ওঠে ছবি। অল্প বয়সের বাষ্পাকুল মন কিছুই ছাখে না, শুধু অনুভব করে— তাই তার আনন্দের মধ্যে দুঃখের পরিমাপ এত বৃহৎ।

সেই ভাববিহ্বল তারুণ্যের লীলা আজ আমার আশে-পাশে চোখ মেলে দেখছি, আর মনে-মনে হাসছি। সে-হাসি ঈর্ষার নয়, করুণার নয়, ব্যঙ্গের নয়, সে-হাসি ভালোবাসারই। ওর মধ্যে আমারই অতীতের ছবি দেখতে পাচ্ছি, ওখানে চলেছে আমারই পুনর্জন্ম, এদিকে আমি নির্লিপ্ত হ'য়ে কোণের আসনটিতে ব'সে দেখছি। এর চেয়ে উপভোগ্য অবস্থা আর কী হ'তে পারে? কোনো সন্দেহ নেই, এই সময়টাই জীবনের শ্রেষ্ঠ। এই অবস্থায় আরো কুড়ি বছর হয়তো কাটাতে পারবো, এমন আশা করা অন্যায় নয়। আরো কুড়ি বছর! আরো কত ঐশ্বর্য, আরো কত পরিণতি,

আরো কত সার্থকতা! আনন্দে উৎসাহে আমার বুক ভ'রে উঠছে। জীবনের জয় হোক! কত নতুন দিগন্ত আমার চোখের সামনে কাঁপছে, পূর্ণতার সম্ভাবনায় অচেতন মনের বিশাল অরণ্যে কত আলোড়ন।—কিন্তু অচেতনকে এখনই আহ্বান করবো না; যা প্রচ্ছন্ন তা প্রচ্ছন্নই থাক, যথাসময়ে তা প্রকাশিত হবে। আপাতত আমি আমার এই সদ্য-আগত মধ্যজীবনকে, আমার নবীন প্রৌঢ়ত্বকে স্বাগত-সম্ভাষণ জানাই, সাদরে সানন্দে তাকে বরণ করি; সে আমাকে ধন্য করেছে, পূর্ণ করেছে, আশা করি আমিও তাকে কিছু ফিরিয়ে দিতে পারবো। আপাতত আমার নতুন-পাওয়া শিশু-বয়স্কতার গৌরবে শীতের এই সকালবেলার রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে আমি বসলুম—জীবনের স্রোত চোখের উপর দিয়ে ভেসে যাক, আমি চুপ ক'রে দেখি।

১৯৪২

# নব বসন্ত

সত্যি তাহ'লে কলকাতায় বোমা পড়লো। পুরো একটি বছরের আতঙ্কিত উৎকণ্ঠা, উন্মত্ত জল্পনা-কল্পনার পরে— যা ছিলো অভাবনীয়, সংবাদপত্রসেবিত সুদূর সমুদ্রপারের কাহিনী, তা-ই ঘটলো আমাদের জীবনে। যখন জাপানিরা বর্মার দক্ষিণতম প্রান্তে মাত্র পা দিয়েছে, তখন থেকে আমরা কলকাতার বাবুরা, এবং আমাদের বাবুত্ব যারা আপন প্রাণ দিয়ে রক্ষা করে সেই সব কুলি-মজুর চাকর-বাকররা— আমরা সবাই পাগলের মতো দিগ্বিদিকে ছুটোছুটি করেছি; বাবুদের মধ্যে অনেকেরই নাগরিক সভ্যতার উপর ধিক্কার এসেছে, বালিগঞ্জের বাড়ি ও হৃষ্টপুষ্ট ব্যাঙ্ক-বইয়ের অনিত্যতার আকস্মিক চেতনায় জীবনের সমস্ত ভোগ্য বস্তু অনির্গতমল রোগীর মুখে সুখাদ্যের মতো বিস্বাদ ঠেকেছে, এবং শহরের কলুষিত কারাগার ত্যাগ ক'রে উন্মুক্ত পল্লীশ্রীর প্রতি উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে তাঁদের মন।

হঠাৎ গ্রাম হৃদয়ে দিলো হানা
পড়লো মনে, খাশা জীবন সেথা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই ধারালো লাইন দুটি প্রয়োগ করবার এমন চমৎকার উপলক্ষ্য আর কি কখনো হবে! Back to Village মন্ত্র। বিদ্যুতের মতো আমাদের ছুঁয়ে গেলো— গান্ধিজির মুখ থেকে নয়, রয়টারের টেলিগ্রাম

থেকে। আত্মরক্ষায় বদ্ধপরিকর জনতার উন্মত্ততা হাওড়ায় শেয়ালদায় গঙ্গায় গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে আবর্তিত হ'য়ে উঠেছে— এ-দৃশ্য কলকাতার ইতিহাসে আর কি কখনো দেখা গেছে? আমি আমার স্ত্রী-পুত্র টেবিল-চেয়ার রেডিও-গ্রামোফোন নিয়ে সকলের আগে বাঁচবো— এই প্রতিজ্ঞাপালনের চেষ্টায় কত অর্থই আমরা নষ্ট করেছি, কত কষ্টই সহ্য করেছি! জীবনে যে-সব জনপদের নামও শুনিনি, কিংবা নামমাত্র শুনেছি, সে-সব অঞ্চলে স্বপ্নাতীত ভাড়ায় আমরা এক-একটি পর্ণকুটির বা অতি জীর্ণ ইষ্টকালয় দখল ক'রে বসলুম— কেউ রামপুরহাটে, কেউ দর্শনায়, কেউ মতলবগঞ্জে, কেউ বা— কিন্তু গেলো বছরের প্রাণরক্ষার বড়ো-বড়ো কেন্দ্রগুলির নাম ইতিমধ্যেই ফিকে হ'য়ে এসেছে। কলকাতা থেকে পালিয়ে শীতটা ভালোই কাটলো, গ্রীষ্ম নিপীড়ক হ'লেও দুঃসহ হ'লো না, কিন্তু দিগন্ত আচ্ছন্ন ক'রে বর্ষা যখন নামলো, তার ভৈরব রভসে আমরা শৌখিন পল্লীপ্রেমিকেরা উল্লসিত হ'তে পারলুম না; ততদিনে কলের জল, বিজলি-বাতি, ওষুধ-ডাক্তার ও বন্ধু-বান্ধবের অভাবে আমরা নগরবিরহে কাতর হ'য়ে পড়েছি, তার উপর মাসের পর মাস কলকাতার বোমা-হারা সুস্থ অবস্থা লক্ষ্য ক'রে নিজেদের একটু বোকা-বোকাও বোধ হচ্ছে। অতএব আমরা দলে-দলে রাজধানীতে ফিরতে লাগলুম, কলকাতা আবার কূলে-কূলে ভ'রে উঠলো, এবং আবার শীতঋতু ফিরে আসতে-আসতে যে যেখানে আমরা পলাতক ছিলুম প্রত্যেকেই আবার চিরাভ্যস্ত নগর-নীড়ে এসে যেই আশ্রয় নিলুম,

অমনি এক জ্যোছনার বান-ডাকা রাত্রিতে কলকাতা অঞ্চলে প্রথম বোমাবর্ষণ হ'য়ে গেলো। এই ঘটনা কল্পনার দুর্দান্ত আকাশ থেকে বাস্তবের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে নেমে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই তার ভয়ংকরতার অধিকাংশ হারিয়ে গেলো; আমাদের মনের মধ্যে এই কথাটাই প্রবলভাবে নাড়া দিলো— ও, এই! এরই জন্যে এত!

তারপর এ-ক'দিনে বোমা নিয়েও অনেক স্যাটায়ার জন্ম হয়েছে, বালকবালিকাদের কাছে সাইরেন-ধ্বনি হ'য়ে উঠেছে খুব অভিনব রকমের একটা পিকনিকের সংকেত, দু-একটা আঁচড়চিহ্ন অঙ্গে ধারণ ক'রে কলকাতা আছে সগর্বে দাঁড়িয়ে। বোমা যখন হাজার মাইল দূরে, তখন আমরা আতঙ্কে পাগল হ'য়ে গিয়েছিলাম, আর আজ যখন বোমার আওয়াজ কানে এলো তখন আমরা সকলেই দিব্যি গ্যাঁট হ'য়ে ব'সে আছি— এবার আর সহজে নড়ছিনে। এটা কি বীরত্ব, না কি অসহায়ের মরীয়া উদাসীনতা, না কি অভ্যাসের জাদুকর স্পর্শ মাত্র? একটা কথা আছে যে মানবপ্রকৃতির সম্প্রসারণ-শীলতা অসীম, কতটা যে তার সহ্য হয় তার কোনো হিশেব পাওয়া যায় না, উটের পিঠে শেষ কুটো যে ঠিক কোনটি তা কে বলবে! যুদ্ধ, বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ— মানুষের দুঃখদুর্দশার যা-কিছু চরম, তার কল্পনাতেই আমাদের বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়, কিন্তু সর্বনাশ সত্যই যখন ঘাড়ের উপর এসে পড়ে তখন তার চাপে মানুষ ম'রে যায় না, বরং তারই রক্তমাংসলিপ্ত ধ্বংসস্তূপের উপর নবজীবনের ফুল ফোটে, পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই বার-বার দেখা গেছে। আলাদা ক'রে দেখলে কত

জীবন যে অনশনে কিংবা রক্তবন্যায় অকালে অনর্থক শেষ হ'য়ে যায় তার অন্ত নেই, জীবনের ব্যক্তিগত সীমানার মধ্যে দেখতে পাই ধ্বংসের করাল মূর্তি নরকের সিংহদ্বার পর্যন্ত প্রসারিত — কিন্তু মানবজীবনের দিকে সমগ্রভাবে, সমষ্টিগতভাবে তাকালে এইটেই মনে হয় যে তাকে ক্ষয় করবার মতো প্রচণ্ড কোনো যন্ত্রই মানুষের বা প্রকৃতির হাতে নেই, কোনো আঘাতই তাকে তার আদিম অনাক্রমণীয়তা থেকে টলাতে পারে না— না বন্যা, না দুর্ভিক্ষ, না হত্যার উন্মত্ততা। সকল প্রলয় পার হ'য়ে এই জীবনস্রোত যে নিরবচ্ছিন্ন নির্মম একাগ্রতায় আপন ভাগ্যের পূর্ণতার উদ্দেশে চিরকাল প্রবাহিত, এই উপলব্ধি অত্যন্ত বিস্ময়কর। যেমন কিনা এমন-কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে না যাতে সমস্ত মানুষ ম'রে যাবে; ট্র্যাজেডির শেষ অঙ্কে যদিও রঙ্গমঞ্চের চারদিকেই মৃতদেহ ছড়ানো, তবু দু-একজন পাত্রপাত্রী কুরুক্ষেত্রের সাক্ষী হ'য়ে বেঁচে থাকে, এবং তারাই আবার নতুন ক'রে সংসার পাতে— নিবিড় সর্বনাশের মধ্যেও এটুকু আশ্বাস আমাদের মনের কোণে লুকিয়ে থাকে যে এই পঞ্চমাঙ্কই শেষ নয়, এর পরেও আবার কুটির থেকে রান্নার ধোঁয়া উঠবে, প্রাঙ্গণে শোনা যাবে শিশুর কলকাকলি— তেমনি, কোনো সর্বনাশই জীবিতের মনকে খুব বেশিক্ষণ অভিভূত ক'রে রাখতে পারে না, কারণ মানুষের মন স্বভাবতই বহুরূপী, বিশেষ-কোনো একটি ঝোঁক— তার সাময়িকতার দাবি যতই প্রবল হোক— সেখানে বেশিক্ষণ স্থায়ী হ'তেই পারে না; যদি হঠাৎ কখনো স্থায়ী হয়, সেই

মনকেই আমরা অপ্রকৃতিস্থ বলি। সব মানুষই মরে, কিন্তু সব মানুষই একসঙ্গে মরে না, এই অর্থেই মানুষ অমর; এমন-কোনো দুঃখী নেই যে সব সময়ই দুঃখী, এই অর্থে মানুষ স্বভাবতই দুঃখজয়ী। সন্তশোকাতুর ব্যক্তির জঠরও নির্দিষ্ট সময়ে আহার্যের দাবি জানায়, প্রকৃতির যে-অমোঘ বিধানের ফলে এটা সম্ভব, তারই ফলে এটাও হ'তে পারে— হ'য়ে থাকে— যে রাজপথে যখন হাতাহাতি মারামারি চলছে ঠিক তখনই কোনো একতলার ঘরে তিন বন্ধু চায়ের পেয়ালা সামনে নিয়ে সাহিত্যচর্চায় মগ্ন। এটা অ-মানুষিক নয়, বরং এটাই সম্পূর্ণ মানুষিক, এ-ধরনের অসংগতি নিজের মধ্যে বহন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব ব'লেই মানুষের প্রাণ অমর।

আমরা যে মুখের কথায় বলি, মানুষের সবই সয়, তার মানেই এই যে জীবন অত্যন্ত বিচিত্র ও জটিল, আর মানুষের মনের গড়নই এমন যে কোনো-একটা প্রসঙ্গ আপাতত খুব বড়ো হ'য়ে দেখা দিলেও তা নিয়ে বেশিক্ষণ ব্যাপৃত থাকতে সে পারে না। তার জীবনযাপনের ভিত্তিতে কিছু তথ্য আছে যা জৈব, যা অপরিবর্তনীয়, যার দাবি যে-কোনো অবস্থায় অপ্রতিরোধ্য। সেখানে সে চিন্তাশীল মুক্ত-ইচ্ছাসম্পন্ন ব্যক্তি নয়, সেখানে সে প্রকৃতির ক্রীতদাস প্রাণীমাত্র। ভেবে দেখলে বোঝা যাবে যে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে আমরা যে একান্তই প্রকৃতির অধীন, এইটেই সকল দুঃখে সংকটে আমাদের বাঁচায়। কোনো-একটা দুঃখ হঠাৎ যখন মাথার উপর ভেঙে পড়ে তখন খানিকক্ষণ আমরা

একেবারেই আত্মহারা হ'য়ে পড়ি বটে, কিন্তু সেই বিবশকারী প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেলেই আমাদের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি আবার উন্মুখ হ'য়ে উঠতে থাকে — যে গান শুনতে ভালোবাসে সে গ্রামোফোন চালায়, যে খেলা ভালোবাসে তার মন আবার মাঠের দিকে দৌড়োয়। ব্যক্তিগত শোক সম্বন্ধে এ-কথা যেমন সত্য, একসঙ্গে বহু লোকের জীবনে ছায়া-প্রসারী যুদ্ধ কি রাষ্ট্রবিপ্লব সম্বন্ধেও তা-ই। প্রথমটায় আমরা খুব চমকে উঠি, হয়তো মুহ্যমান হ'য়ে পড়ি, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সেই দুঃখের অবস্থাটাই আমাদের স'য়ে যায়, সেটাকে আমরা মেনে নিই, এবং তারই মধ্যে বসবাস ক'রে ছেলেকে দুধ খাওয়ানো থেকে কবিতা লেখা পর্যন্ত সমস্ত কাজই যতদূর সম্ভব সম্পন্ন ক'রে চলি— তার মানে, উপস্থিত দুঃখের উপরে আমরা আপন স্থায়ী স্বভাবের জোরেই জয়ী হই।

ব্যঙ্গনিপুণ অল্ডস হক্সলি তাঁর একটি উপন্যাসে বলেছেন যে মানুষের কোনো-কোনো সুখের কোনো অবস্থাতেই ব্যতিক্রম ঘটে না— যেমন কিনা গা চুলকোবার সুখ। কথাটা ঠাট্টার মতো শোনায়, কিন্তু ভেবে দেখবার মতো। এ-কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে চুলকোনি যদি তেমন ক'রে পায় তাহ'লে মধ্যবয়স্ক স্থিতধী পণ্ডিত থেকে রাস্তার উড়ুক্কু ছোকড়া পর্যন্ত যে-কোনো লোকই যে-কোনো অবস্থায় গা চুলকিয়ে একই রকম সুখ পাবে। এ-রকম ক্ষেত্রেই মানুষ তার জৈব তথ্যের বিষয়ীভূত, এবং এ-সব ক্ষেত্র যে অবশ্যতই নিচু স্তরের এমন কথা মনে করবারও কারণ নেই। মানুষ যে মনস্বী, সেটাই [illegible] তার

শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ, কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও সত্য যে শুধু মনীষার চর্চা ক'রেই সে বাঁচে না। জীবনের ধারাবাহিকতায়, প্রাণের অমরতার উৎস যদি সন্ধান করি, তাহ'লে দেখতে পাবো সেখানে আছে কতগুলি জৈব প্রেরণা, কতগুলি প্রাকৃতিক বৃত্তি, যা হঠাৎ মনে হ'তে পারে স্থূল, বড়ো বেশি স্পষ্ট, কিন্তু মানুষের সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরপারে যা আজ পর্যন্ত রহস্য হ'য়ে রইলো। স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণ—সে-ও এমনি একটা প্রাকৃতিক ব্যঞ্জনা ছাড়া আর কী! কিংবা আজ ফাল্গুন মাসের আকাশে যে বসন্তের আভাস দিয়েছে তাও তো একটা জৈব উদ্দীপনা ছাড়া কিছু নয়। প্রকৃতির এই সব অপ্রতিরোধ্য এবং নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ আমাদের জীবনকে চিরন্তনের একটি পটভূমিকা দেয় ব'লেই মানবজীবন সাময়িকতার অতি বড়ো দুঃসহতাও যেন অনায়াসে অতিক্রম ক'রে যায়।

ব্যক্তিগত শোকের দিনে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি লজ্জা দিয়ো না।' লজ্জা দিয়ো না—এই কথাই নিজের অন্তিম পীড়ার সময় আরো একবার তিনি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন।—'কিছুকাল থেকে আমি দুঃসহ রোগ-দুঃখ ভোগ ক'রে আসছি সেইজন্য যদি ব'লে বসি যাঁরা আমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত তাঁরাও মুখে কালো রঙ মেখে অস্বাস্থ্যের বিকৃত চেহারা ধারণ ক'রে এলে তবেই সেটা আমার পক্ষে আরামের হোতে পারে তাহলে মনোবিকারের আশঙ্কা কল্পনা করতে হবে। প্রকৃতির মধ্যে একটা নির্মল প্রসন্নতা আছে। ব্যক্তিগত জীবনে অবস্থার

বিপ্লব ঘটে কিন্তু তাতে এই বিশ্বজনীন দানের মধ্যে বিকৃতি ঘটে না; সেই আমাদের সৌভাগ্য।'—সত্য কথা! আমি শোকগ্রস্ত কিংবা পীড়িত ব'লেই বিশ্বসংসারের মুখ কালো হবে না এ-কথা যেমন সত্য, তেমনি এও সত্য যে কোনো বড়ো রকমের দুঃখপীড়া যখন সমগ্র মানবসমাজেই সংক্রমিত হয় তখনও ঋতুর পর ঋতু আসে, মেঘলা দিনে মন-কেমন করে, এবং তরুণ-তরুণীরা প্রেমে না-প'ড়ে পারে না। এটুকুই আমাদের স্বাস্থ্যের স্বাক্ষর, আমাদের প্রাণধারণের, প্রাণলালনের ভিত্তি। যে-কোনো দুঃখদুর্দশাই আমাদের বুকের উপর চেপে থাক না কেন, পৃথিবীর ঋতুবৈচিত্র্য আমাদের মনে ঢেউ তুলবেই, প্রেমে আমরা পড়বোই; এমনকি, বোমা-পড়া রাত্তিরে যে-লালমুখো মস্ত চাঁদটাকে রাক্ষুসি ব'লে মনে হয়, সেই চাঁদেরই আলোয় কয়েক ঘণ্টা পরে আমাদের মন স্বপ্নিল হ'য়ে ওঠে। এতে অবাক হবার কিছু নেই, এটাই স্বাভাবিক।

আজ এ-সব কথা আমার মনে হচ্ছে তার কারণ দীর্ঘ শীত ঋতুর পরে সম্প্রতি নব বসন্তের প্রথম আমেজ পাওয়া যাচ্ছে। আমি নিশ্চয়ই জন্ম-জন্মান্তরের বাঙালি, কেননা শীত আমার ভালো লাগে না, গ্রীষ্মের উত্তাপই দেহ-মনের পক্ষে অনুকূল ব'লে বোধ হয়। এ-ক'দিন সর্দিতে কাশিতে কনকনে উত্তুরে হাওয়ায় একটা আড়ষ্ট জবুথবু অবস্থার মধ্যে কম্বল-চাপা হ'য়ে প'ড়ে ছিলুম—তারপর সেদিন ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ দেখি হাওয়ার মোড় ফিরেছে, আকাশের মুখে কী-যেন এক অভ্যর্থনার উৎসুকতা, সূর্যের নবীন মধুর

উত্তাপের আভাসে যেন পৃথিবীর পুনরুজ্জীবনের নিঃশব্দ মন্ত্র পড়া শুরু হ'লো। ঘরের দরজা-জানলার সঙ্গে-সঙ্গে আমারও মন দিগন্তের দিকে খুলে গেলো; সেখানে কত কল্পনার আনাগোনা, কত কবিতার মায়াজাল—গরম কাপড়ের অবরোধ গা থেকে যেমন ছুঁড়ে ফেললুম, তেমনি খ'সে পড়লো সাম্প্রতিক উৎকণ্ঠার নিপীড়ন। যেদিকে চোখ ফেরাই, যেদিকে পা বাড়াই, নব বসন্তের বিশ্বব্যাপী উল্লাস আমাকে স্পর্শ করে, কখনো হাওয়ার হিল্লোলে, কখনো আলোর ইঙ্গিতে, কখনো বা একটি অনির্ণেয় অপরিমেয় মদিরতায়। এ কী আশ্চর্য নবজন্ম!—প্রতি বছরই একবার ক'রে এটি ঘটছে, তবু কী আশ্চর্য! ঋতুবদলের আয়োজনে বিশ্বপ্রকৃতির বেশ একটা ব্যস্ত ভাব ক-দিন ধরেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে—অনেকটা যেন আমাদের বাড়ি-বদলের পালার মতো—কেমন-একটা অনিশ্চিত চঞ্চলতা আকাশে-বাতাসে ছড়ানো;—হঠাৎ হয়তো একদিন মেঘ ক'রে এলো, আবার পরদিন উত্তুরে হাওয়া জেগে উঠে মেঘ নিলো ঝেঁটিয়ে, কিন্তু সন্ধ্যাবেলাতেই আধখানা চাঁদের আধিপত্যে দক্ষিণে হাওয়ার মন্ত্রণা পাওয়া গেলো। আপাতত কিছুটা এলোমেলো হ'লেও শীতের মেয়াদ যে আর বেশিদিন নেই এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতিতে এলোমেলো বলতে সত্যি হয়তো কিছু নেই। আমাদের বাড়ি-বদলের সঙ্গেই যদি এই ঋতুবদলের তুলনা করি তাহ'লে দেখতে পাবো যে আমরা যে-সব বিশৃঙ্খলা, বিরক্তি ও ক্লান্তির হাত কিছুতেই এড়াতে পারি না, প্রকৃতিতে তার চিহ্নমাত্র নেই; সে যা-কিছু

করে তা-ই অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও সম্পূর্ণ—সৌষম্য থেকে কখনো সে ভ্রষ্ট হয় না। পৃথিবীতে বসন্তঋতু আসবার এই যে আয়োজন, এই যে ধূসর মেঘমণ্ডলের মাঝখানে হালকা-নীল আকাশের হঠাৎ-জেগে-ওঠা একটুখানি দ্বীপ, এই কি কম সুন্দর! আলো-হাওয়ার কত চক্রান্তের, স্থান-কালের কত আকস্মিকতার সংযোজনার ফলে ঐ অপার্থিব অবিশ্বাস্য নীলটুকু যে আমার চোখে পড়লো, বসন্তের সমস্ত আনন্দের মধ্যে তারই কি মূল্য কিছু কম!

লজ্জা করবো না, মন খুলেই বলবো যে নব বসন্তের এই আভাস আমার ভালো লেগেছে, আমি এতে সুখী হয়েছি। ঠিক এই সময়ে আমরা যে-অবস্থায় আছি তার মধ্যে এমন কিছুই নেই যাকে সুখের বলা যায়। আমরা যেন একটা সর্বগ্রাসী না-য়ের মধ্যে ডুবে আছি—চাল নেই, চিনি নেই, কয়লা নেই, কাপড় নেই, শান্তি নেই, আশা নেই—কিছু নেই। কিন্তু এত দুঃখ, এত অশান্তি সত্ত্বেও পৃথিবীতে তো বসন্ত এলো—কিছুই তাকে ঠেকাতে পারলে না, না যুদ্ধের বীভৎসতা, না আমাদের হতাশার অতলতা। এ কি আশ্চর্য নয় যে এই পাপমগ্ন অভিশপ্ত গ্রহে এ-বছরও সেই চিরকালের বসন্ত এলো, ঠিকানা ভুল করলো না, তারিখ ভুল করলো না, অজস্র ছড়িয়ে দিলো তার শ্যামল সরসতা, তার দক্ষিণে হাওয়ার প্রাণময় স্পর্শ! কিন্তু এ-আশ্চর্যটুকু আছে ব'লেই তো বেঁচে আছি। যত উন্মত্ত দুঃশাসন আজ মানুষের বুক চিরে রক্তপান করছে তাদের সকলের শক্তি একত্র হ'লেও যে একটি ফুল ফোটা বন্ধ করতে পারে না, এ-দুর্দিনে এই তো

একমাত্র আশার বাণী। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন প্রকৃতির নির্মল প্রসন্নতা, একদিক থেকে দেখলে সেটাকে মনে হয় নির্মম উদাসীনতা, কেননা মানুষের ব্যক্তিগত কি সমষ্টিগত জীবনে যত অঘটনই ঘটুক, প্রকৃতি তার কাজ ক'রে যাবেই। কিন্তু আসলে এই নির্মমতা, আর প্রকৃতির অনাক্রমণীয় শান্ত ভাব—এ দুই একই বস্তু। এই রক্তাক্ত ফাল্গুনেও যখন বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র পাই, এবং বন্ধু-বান্ধবের ঘরে নবজাতকের আবির্ভাবের খবর কানে আসে, তখনই বুঝতে পারি যে উপস্থিত মুহূর্তে যে-আগুনে আমরা সবাই মিলে পুড়ছি, সেটাই জীবনের শেষ কথা নয়, তা পেরিয়েও আরো-কিছু আছে, অন্য-কিছু আছে, এমন-কিছু আছে যা চিরন্তন, ধ্বংসহীন, ঘটনার উত্থান-পতনের সঙ্গে-সঙ্গে যা আন্দোলিত হয় না, যার সঙ্গে আমাদের প্রাণ একটি অদৃশ্য অচ্ছেদ্য সূত্রে যুক্ত আছে ব'লেই আজও আমরা পাগল হ'য়ে যাইনি, অন্ন বস্ত্র মনুষ্যত্বের এই নিদারুণ দুর্ভিক্ষের মধ্যেও এখনো আমাদের খুশি হবার সহজ ক্ষমতা একেবারে লোপ পায়নি।

আজ বসন্ত এসেছে আমাদের সেই আদিম অভিজ্ঞান নিয়ে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মন খামকা খুশি হ'য়ে উঠছে, জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে হাতের কাজ ভুলে যাচ্ছি। সন্ধ্যাবেলায় যখন গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দুর্লভ করুণ শঙ্খের মতো প্রায়-পূর্ণ চাঁদটি চোখে পড়ে, আর তার ঝিরিঝিরি আলো সোনালি সুতোর মতো ডালেপালায় জড়িয়ে যায়, তখন মনে করতে পারি না যে আমি ক্ষণকালীন দুঃখসুখভোগী একটা জীব মাত্র; মনে হয় আমার

প্রাণের ধারা অতীতের বিচিত্র যুগ-যুগান্তর থেকে যাত্রা ক'রে ভবিষ্যতের নিঃসীম সম্ভাবনার মধ্যে পরিব্যাপ্ত; মনে হয় এই চাঁদ-জ্বলা মুহূর্তটিতে আমি যে আছি, এর পিছনে যেন শত শতাব্দীর একটি ইতিহাস আছে। এমনও হ'তে পারে যে আমার ব্যক্তিগত অস্তিত্বটা আগামী বোমাতেই লুপ্ত হ'য়ে যাবে, হয়তো গভীরতর আরক্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হবে আমার স্বদেশ ও স্বকাল, কিন্তু এই মুহূর্তটি মনে হয় কখনো থামবে না, প্রাণ থেকে প্রাণে একটি অলৌকিক মালা হ'য়ে জ্বলবে, তার যেন আর শেষ নেই। এবার বসন্ত আমার কাছে যে-বাণী নিয়ে এলো তাতে আছে এই অসাময়িকতার আশ্বাস।

আজ আমার মনে এ-কথাটাই খুব স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে যে আমরা যে-সব বড়ো-বড়ো কীর্তি অনেক চিন্তায় অনেক যত্নে গ'ড়ে তুলি সেগুলোই অত্যন্ত ভঙ্গুর ও দ্রুত-পরিবর্তনশীল, কিন্তু যেগুলো আমাদের ছোটো-ছোটো অতি সাধারণ প্রতিদিনের কাজ, কোনো আগুনে তা পোড়ে না, কোনো জলে তা ডোবে না—যেমন চাষির কাজ, তাঁতির কাজ, মেয়েদের ঘরকন্নার কাজ। আর তারই সঙ্গে জড়িয়ে মিশে আছে শিশুর মুখ দেখে মায়ের আনন্দ, চাঁদের মুখে তাকিয়ে মানুষের শান্তি, পদ্যের মিল বানিয়ে কবির তৃপ্তি। ভাবতে রোমাঞ্চিত হচ্ছি যে ঐ শেষের কাজটিতে আমারও যৎকিঞ্চিৎ দখল আছে। গেলো বছরের বোমাতঙ্কের সময় কলকাতার যখন বিমর্ষতম অবস্থা, তখন পথে যেতে-যেতে দেখতুম একটি ছোটো ঘরে

দরজি ব'সে শেলাইয়ের কল চালাচ্ছে, সামনেই ফুটপাতে মুচি বসেছে তার জুতো মেরামতের সরঞ্জাম নিয়ে, আর তেতলার বারান্দায় একটি মেয়ে শুকনো কাপড় তুলছে—এই অতি পরিচিত ছোটো-ছোটো দৃশ্যগুলি দেখে আমার মনে যে-রকম আশা আর সাহসের সঞ্চার হ'তো, এমন আর কিছুতেই হ'তো না। মনে-মনে বলতুম, রাজনীতি, কূটনীতি কি রণকৌশলের মর্ম কিছুই তো বুঝি না, শুধু নিশ্চেতন পদার্থের মতো তার ফল ভোগ করি— কিন্তু এই দরজিকে বুঝি, ঐ মেয়েটিকে বুঝি—এটুকু বুঝি যে ওরা না-হ'লে জগৎ-সংসার কিছুতেই চলতে পারে না, মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে এরা চিরকাল ছিলো এবং থাকবে; আজ যাদের নাম প্রতিদিন খবর-কাগজে তারস্বরে ঘোষিত হ'য়ে কারো মনে আতঙ্কের কারো মনে উল্লাসের সঞ্চার করছে, তারা একদিন ইতিহাসের পাঠ্যকেতাবে শুকনো মৃত নাম মাত্র হ'য়ে প'ড়ে থাকবে—কিন্তু এই সব অখ্যাত সাধারণ লোক, কালের হাত তাদের ছুঁতে পারে না, চিরকালই কেউ-একজন কাপড় শেলাই করবে, এবং কোনো-একটি মেয়ে বিকেলের বারান্দা থেকে শুকনো কাপড় ঘরে তুলবে। আমি কবি, এই ধ্বংসাতীত সাধারণ জীবনের একজন অংশীদার, আজকের নব বসন্তের এই দিনটির মুখে এই বাণী আমি শুনলুম।

১৯৪৩

# বড়ো রাস্তায় ছোটো ফ্ল্যাট

বড়ো রাস্তার উপরে ছোটো একটি ফ্ল্যাটে আমার বাসা। গলি থেকে যখন এলুম তখন বড়ো রাস্তার অবিরাম কোলাহল সম্বন্ধে মনে উৎকণ্ঠা ছিলো। আর সত্যিও, এই সাত বছরের অভ্যেসেও গোলমালটা এখনো যে ঠিক গা-সহা হ'য়ে গেছে তা নয়। এক-এক সময় অসহ্য ঠেকে বইকি। মনে করুন জ্যৈষ্ঠ মাসের কোনো গুমোট-করা সন্ধ্যায় উজান-ট্রাম আর ভাটির ট্রামের কর্কশ ধাতব চীৎকারে বায়ুমণ্ডল যখন মুখরিত, এদিকে ঘরের মধ্যে কেউ রেডিওর খবর শুনছে এবং আমাদের গীতরসিক দরোয়ান একতলায় বাদ্যসহযোগ রাগসংগীতশিক্ষায় নিযুক্ত, তখন গরমে গোলমালে আর চারদিকের দেয়ালের অবরোধে প্রাণমন তৃষিত হ'য়ে ওঠে একটু নির্জনতার জন্য, খোলা হাওয়ায় একটুখানি আকাশ-স্পর্শের জন্য। তখনকার মতো আমাদের এই ঔপনাগরিক ঔপমানবিক অস্তিত্ব সুদ্ধু লুপ্ত ক'রে দিয়ে কবি জীবনানন্দের মতোই কোনো এক ঘাস-মাতার নিবিড় সবুজ সুস্বাদু অন্ধকারে ঘাস হ'য়ে জন্মাতে ইচ্ছা করে।

এটাই যে দুঃসহতম দুঃখ তাও নয়। সান্ধ্য কোলাহলটা নিজেরা কোলাহল ক'রে কোনোরকমে চাপা দেয়া যায়—একবার তর্ক জ'মে উঠলে নিজেদের কণ্ঠস্বরই সকল কলরব ডুবিয়ে দিতে পারে, এ-অভিজ্ঞতা আমার বার-বার হয়েছে।

চরম দুর্গতি ঘটেছিলো কয়েক বছর আগে এক গ্রীষ্মে যখন পাড়ার গৃহসেবকেরা তাদের নৈশ ক্রীড়াস্থলরূপে ঠিক আমার বাড়ির সামনের রাস্তাটুকুই নির্বাচন করেছিলো। ট্র্যাম-লাইনকে মধ্যবর্তী রেখে দু-পক্ষের হা-ডু-ডু খেলা যখন জ'মে উঠেছে, ঠিক সেই সময়ে আমাদের চোখ সারাদিনের ক্লান্তির ভারে বুজে আসতো, আর তখন তাদের নিঃশাসন উল্লাসের যৌথ ধ্বনি দেহের প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রীকে যেন টেনে হিঁচড়ে মুচড়ে ছিঁড়ে দিতো। ভদ্র গৃহস্থের যখন ঘুমের সময় তখনই যে এদের ছুটির ঘণ্টা সেটা আমাদেরই দোষে, এই মনে ক'রে খুব মহৎভাবে এ-যন্ত্রণা সহ্য করার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দৈহিক দুর্বলতার কাছে আত্মিক শক্তি হার মানলো, নিতে হ'লো আইনের শরণ। এখন পর্যন্ত সেই শান্তিহন্তা, নিদ্রালুণ্ঠনকারী, প্রায়-প্রাণঘাতী নৈশ অট্টরোল স্মরণ ক'রে মাঝে-মাঝে আমার হৃৎকম্প হয়। বর্তমান নিষ্প্রদীপকতার ফলে, আর যা-ই হোক, এই যন্ত্রণা থেকে অন্তত রক্ষা পেয়েছি।

অবশ্য বড়ো রাস্তার উপরে বাসা নেবার সবটাই যে দুর্ভোগ তা নয়। এর ভালো দিকও আছে। সারাদিন মিছিল চলেছে রাস্তায় : তাকিয়ে ভাখো। অবসরের অলস মুহূর্তে, কিংবা কাজের ফাঁকে-ফাঁকে, পরম মনোহর এই জীবন্ত চলচ্চিত্র। আমি ভেবে দেখেছি, এর সঙ্গে সিনেমা-গৃহের শতবিশেষণবিভূষিত চিত্রেরও তুলনা হয় না। নিজের ঘরটির অভ্যস্ত আরামের মধ্যে আবদ্ধ থেকে বাইরের জগতের এই যে বিচিত্র ও চিরগতিশীল ছবি আমি দেখছি

তার জন্য আমার একটি পয়সাও অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে না, অথচ ব্যাপারটা একই সঙ্গে উপভোগ্য এবং শিক্ষাপ্রদ; কৌতুকের উপকরণের অভাব নেই, অথচ সমসাময়িক রীতি-নীতি গভীরভাবে যেখানে অধ্যয়ন করতে পারি, এই বড়ো রাস্তাটি সেই অফুরন্ত উন্মুক্ত গ্রন্থ। আমার লেখবার টেবিলের ধারে আছে একটি জানলা, আর সেই জানলা ঘেঁষে উঠেছে সবুজ একটি গাছ; উপরের দিকে তাকালে ডালপালা ছাড়িয়ে অল্প একটু আকাশ চোখে পড়ে, আর তলার দিকে কয়েক গজ বড়ো রাস্তাই দৃশ্যপিপাসু চোখের সর্বস্ব—আমোদপ্রমোদস্বরূপ এইটুকু মাত্র নিয়ে কত সময় দিনের পর দিন আমার কেটে যায়। ট্র্যাম-বাস্-এর যাওয়া-আসা, মস্ত মসৃণ গর্বিত নিঃশব্দ অটোমবীল—কিংবা স্বতশ্চল, খিটখিটে মেজাজের কটকট-শব্দিত ট্যাক্সি, ফুটপাতে ফুর্তিবাজ যুবকের দল, স্বচ্ছন্দচারিণী আধুনিকার দৃপ্ত ভঙ্গিমা—এই দেখে-দেখে অনেক শূন্য মুহূর্ত রসে ভ'রে ওঠে, লিখতে-লিখতে ভাবনার জট খুলে যায়। সন্ধ্যার দিকে রাস্তা যখন ছায়ায় আর লোকজনে ভ'রে যায়, তখন স্নাত স্নিগ্ধ দেহমন নিয়ে রাস্তার দিকের অতি সংকীর্ণ বারান্দাটিতে দাঁড়ানো আমার পক্ষে একটি বিলাসিতা। শাড়ির বর্ণহিল্লোলে, শিশুর কলস্বরে, দায়িত্বহীন যৌবনের উচ্ছ্বাসে, আপিশ-ফেরার ঘর্মাক্ত ক্লান্তিতে, সব মিলিয়ে এই রাজপথে বিচিত্র বহুমুখী জীবনের চঞ্চল মেলা ব'সে যায়। আর যদি পশ্চিমের আকাশে মেঘপুঞ্জ প্রস্তুত হ'য়ে থাকে তবে তো কথাই নেই, রঙের অপ্সরীরা ঘোমটা খুলে দিয়ে স্বর্গের

জানলায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পৃথিবীর ছবি ভাখে—একটি জ্বলন্ত সূর্য-স্রোত স্বর্গে-মর্ত্যে সেতু রচনা ক'রে দিয়ে মুহূর্ত-পরেই মিলিয়ে যায়, কিন্তু সেই ক্ষণমিলনের মধুর রক্তিম আভায় এই মর জীবনের গতানুগতিকতা যেন চিরকালের লীলাক্ষেত্রে রূপান্তরিত হ'য়ে ওঠে, রাসবিহারী এভিনিউকে মনে হয় স্বর্গোদ্যান।

এই ছবি প্রতিদিন দেখি, প্রতিদিন নতুন লাগে। নাগরিক জীবনের যে একটি অবিশ্রাম জঙ্গমতা আছে, যা এই বড়ো রাস্তাতেই পরিপূর্ণরূপে প্রকাশমান, আমার পক্ষে তার আকর্ষণ সুতীব্র। নিজে রাস্তায় নামলে দৃশ্য আর দর্শকে পার্থক্য ঘুচে যায়, সেই জন্য সবচেয়ে ভালো হ'লো নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখে—অর্থাৎ স্বগৃহের অন্তরালে থেকে—শুধু চোখ আর মন দিয়ে বহির্জগৎকে ভোগ করা। আমাকে কেউ দেখছে না অথচ আমি সকলকে দেখছি, এর মতো উপভোগ্য অবস্থা আর নেই। কার হাঁটা দাম্ভিক, কার হাঁটা ঢিলেঢোলা, কে হাত দুটোকে প্রবলভাবে দোলাতে-দোলাতে চলে, কে চটিজোড়াকে পায়ের আগে-আগে ঠেলে-ঠেলে নিয়ে যায়, আপিশমুখী ট্র্যাম ধরবার জন্য প্রৌঢ় গম্ভীর সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের কী-রকম দৌড়ঝাঁপ করতে হয়—কোনো পরিহাসনিপুণ সঙ্গী থাকলে তার আলোচনাতেও অনেক অবসর উজ্জীবিত হ'তে পারে।

এত বছর ধ'রে এই বড়ো রাস্তায় কত রঙ্গই দেখলুম, কিন্তু নিখরচায় নিজের বাড়িতে ব'সে সমস্ত দেশের জীবন্ত চলন্ত প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবো তা কখনো আশা করিনি। সম্প্রতি

তা-ই দেখছি। রোদে বৃষ্টিতে, দিনে রাত্তিরে, [illegible] অন্ধকারে অবিরাম তাদের যাওয়া-আসা, ফুটপাত আচ্ছন্ন। নানা বয়সের মেয়ে, নানা বয়সের শিশু, মাঝে-মাঝে দু-একজন বুড়ো। পরনে একটি কাপড়, হাতে একটি ন্যাকড়ার পুঁটলি। এরা কারা? স্বদেশসেবক বন্ধু বলছেন, এরাই তোমার দেশ। আমার দেশ? অবিশ্বাসী বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকি। দলে-দলে ঊর্ধ্বশ্বাসে চলেছে ওরা, সদ্যোজাত শিশুকে বুকে আঁকড়ে, সত্তর বছরের বুড়িকে সঙ্গে-সঙ্গে টেনে নিয়ে,—ঘণ্টার পর ঘণ্টা অটল ধৈর্যে অপেক্ষা ক'রে তাদেরই জমিতে তাদেরই শ্রমে উৎপন্ন চাল কিছু যদি কিনে নিতে পারে, সমস্ত আশা নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েও এই আশাটুকু এখনো তাদের বুকের মধ্যে ধুকধুক করছে। আহা, কত ভাগ্য তাদের, তবু তো কনট্রোলের দরে চাল পাচ্ছে, না-হ'লে তো একেবারেই না-খেয়ে মরতে হ'তো! তাই ফুটপাতকেই তারা কেউ-কেউ বাসস্থান ক'রে নিয়েছে, প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্ম-সুদ্ধু সবটুকু জীবনযাপন সেখানেই, রাত্রে যে যার জায়গায় ঠিক কিউ ক'রেই শুয়ে থাকে, সকালে দয়ার দোকানটি খুললে আবার হাত পেতে দাঁড়াবে। আমাদের দেশের এই মূঢ় অশিক্ষিত বিশৃঙ্খল জনসাধারণ—তারাও যে কিউ ক'রে দাঁড়াতে, এমনকি শুতে পর্যন্ত শিখেছে, এটাই কি আমাদের পক্ষে কম গৌরবের বিষয়!

এ-গৌরব সম্বন্ধে ওরাও কি সচেতন? জানি না। এদের একজনকে একবার বলতে শুনেছিলাম—'আমাদের ভিখিরি বোলো না, আমরা কনটোলের নোক।' কনট্রোলের লোক!

এত বড়ো পদমর্যাদা—আর তাও কিনা এই ক্ষুধাজর্জরা প্রদর্শিতপঞ্জরা বঙ্গগ্রামিকার! কিন্তু এতই দুর্ভাগা এরা যে এতখানি সম্মানলাভের পরেও ক্ষুধার কশাঘাত ভুলতে পারে না—দরজা-দরজায় ভিখিরির মতো হাত পাতে, বিয়ে-বাড়ির প্রাঙ্গণে কুকুরের মতো ভিড় করে;—প্রেম নয়, গৌরব নয়, সম্ভোগ নয়, নিছক খাদ্যের জন্য এদের নিদারুণ প্রতিজ্ঞার দৃশ্যে তখনকার মতো জীবনের সব স্বাদ চ'লে যায়। 'মাগো—দুটি খেতে দাও, পেট জ্ব'লে গেলো, ম'রে গেলাম—' এই অসহ্য আর্তস্বর বাদলার হাওয়ায় ঝেঁকে-ঝেঁকে ভেসে বেড়াচ্ছে।

আমরা যে আজন্ম দুঃখে-দারিদ্র্যে অভ্যস্ত, আমরাও কখনো যা কল্পনা করতে পারতুম না, আজ তা-ই দৈনন্দিন সাধারণ ঘটনায় পর্যবসিত হ'লো। শেষরাত্রে আমাদের ঘুম ভেঙে যায় বুভুক্ষাবাহিনীর পদশব্দে। এরা ভেবেছে রাত পোহাবার আগেই করুণা-বিপণীর সামনে সকলের আগে দাঁড়াতে পারবে, যারা দোকানের সামনেই সারা রাত শুয়ে ছিলো, তাদের কথা বোধহয় ভাবেনি। বেলা দুপুর পর্যন্ত ক্রমাগত উজান-স্রোত চলেইছে—কলকাতার দক্ষিণে যত গ্রাম সব শূন্য ক'রে বেরিয়ে পড়েছে স্ত্রী, মা, বোন, কন্যা—তারপর অনেক রাত পর্যন্ত ভাটির স্রোতে তারা ফিরে যায়, কোমরে চালের পুঁটলি বাঁধা, কোলে শিশু, চলার ভঙ্গিতে একটা ব্যস্ত, ব্যাকুল ভাব। রোদ, বৃষ্টি, ব্যাধি, আবর্জনা—এদের মুখ কি সকল পার্থিব ক্লেশের মানচিত্র নয়? কিন্তু না, এদের মুখে ক্লেশের বা ক্লান্তির কোনো চিহ্ন তো

নেই—অন্তত আমাদের চোখে ধরা পড়ে না—সর্বগ্রাসী অচেতন সহিষ্ণুতা এদের মুখ থেকে অন্য সব চিহ্ন শুষে নিয়েছে। এ-জনতায় যুবক নেই, প্রৌঢ়ও না; এদের স্বামীরা, ভাইয়েরা, ছেলেরা সারাদিন খেটে যা রোজগার করে, সারাদিন দাঁড়িয়ে থেকে এরা তা-ই দিয়ে চাল কিনে ঘরে ফেরে। ভাগ্যিশ এদের আহারের আয়োজনটা নিতান্তই বাহুল্যবর্জিত, নয়তো এদের রাঁধবার খাবার সময় হ'তো কখন ?

বারান্দায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এদের দেখি আর ভাবি—এরাই দেশ, এরাই আমার দেশ। এরা ভিখিরি নয়, সমাজের আবর্জনা নয়, যন্ত্রতন্ত্রের মনুষ্যত্ব-নিষ্কাশিত ছিবড়ে নয়; এরাই আমাদের প্রাণস্রোত, বাংলাদেশের হাজার-হাজার গ্রাম ভ'রে রেখেছে এরাই, শহরে ব'সে-ব'সে এদের কথা বইয়ে পড়ি, কখনো চোখে দেখি না। এরা দরিদ্র কিন্তু ভদ্র, এরা নিরন্ন তবু মানুষ। এই মেয়েরা, যারা চিরকাল ঘরের কাজ করেছে, কখনো ঘর থেকে বেরোয়নি, অতি দুরবস্থাতেও গৃহকর্ত্রীর সম্মান থেকে যারা বঞ্চিত হয়নি, আজ যুগসন্ধির ধাক্কা তাদেরও পথে বের ক'রে দিয়েছে। আমরা যারা শহুরে জীব, আমরা এদের এই প্রথম দেখলুম। মাথায় সিঁদুর, একখানা নাতিদীর্ঘ কাপড়েই নিখুঁতভাবে দেহ আবৃত, আধো-ঘোমটা-দেয়া যুবতী বধূ শাশুড়ির সঙ্গে চলেছে, কনট্রোলের চাপও তার সলজ্জ ভঙ্গিটিকে নষ্ট করতে পারেনি। বৌ বলতে যে-ছবিটি মনে জাগে, যার প্রতিরূপ শহরে আজকাল আর দেখা যায় না, ঐ মেয়েটি ঠিক

যেন তা-ই। শিক্ষায় সচ্ছলতায় পরিমার্জিত হ'লে তার মুখটি কি সুন্দর হ'তে পারতো না, আর তার আপাত-অচেতন মনেও এমন শিখা কি নেই যা আলোর জন্য উন্মুখ? কিন্তু তার ঐ তালি-দেয়া অসহ্য নোংরা কাপড়টাই আমাদের চোখ থেকে তাকে আড়াল করেছে। তারই পাশে-পাশে জুতো গটগট ক'রে চলেছেন গর্বিতা বালিগঞ্জিনী, পিছনে চাকর চলেছে মস্ত একটা অ্যালসেশিয়নেকে শিকলে বেঁধে। কুকুরকে হাওয়া-খাওয়ানোর ঐ দৃশ্যটাই আমাদের পরিচিত, জর্জেট-জড়ানো মহিলাটিকেও আপন জন ব'লে বোধ হয়, কিন্তু যদিও বুদ্ধি দিয়ে জানি যে দেশ বলতে এই নোংরা-কাপড়-পরা মেয়েটাকেই বোঝায়, তবু প্রাণের মধ্যে তার সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করতে পারি না। ইচ্ছা আছে, পথ জানা নেই।

তোমরা কোথায়, আমরা কোথায় আছি।
কোনো স্থলগনে হবো নাকি কাছাকাছি?

সে-শুভলগ্ন কবে আসবে জানি না, আপাতত এদের যে চোখে দেখলুম এইটেই অভিজ্ঞতা হিশেবে মর্মান্তিক হ'লেও মূল্যবান। সবচেয়ে অবাক লাগে যখন এদের মধ্যেও মানবিক জীবনযাত্রার সেই ছবিটি দেখতে পাই, যা দেশকালের অতীত, উপস্থিত পরিবেশ হত্যাকারী হ'লেও যাকে ধ্বংস করতে পারে না। ফুটপাতে ব'সে-ব'সে মেয়ের দল পরস্পরের চুল বেঁধে দেয়, উকুন বাছে, হাসিগল্প করে, আর যখন রেলিঙে-ঘেরা বাগানওলা বাড়ির ভিতর থেকে মোটর বেরিয়ে আসে, অল্প একটু স'রে পথ ছেড়ে দেয়;

## উ স্ত র তি রি শ

হাড়-বের-করা শিশু ধুলো-কাদা-নোংরার মধ্যে খেলা করে, মা-র কোলে চ'ড়ে চকচকে চোখ আমাদের বারান্দার দিকে তাকাতে-তাকাতে চ'লে যায়—দেখে মনে হয় তার অন্নহীন জগৎটাও তার পক্ষে যথেষ্ট কৌতূহলেরই বিষয়। চারদিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্য হৃদয় যেন স্তব্ধ হ'য়ে যায়। আর যখন কোনো রাত্রে ক্ষুধার তীক্ষ্ণ হাহাকার বাদলা হাওয়ায় ফিরে-ফিরে কানে এসে লাগে, কিংবা ভিড়ের মধ্যে ছেলেকে হারিয়ে ফেলে কোনো মা পাগলের মতো চীৎকার করতে-করতে ছুটোছুটি করে রাস্তায়, তখন এই ভেবে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না যে এই অতলস্পর্শী নিঃসহায়তায় যারা ডুবে আছে, তারাও এখনো হাসবার অধিকারটুকু হারায়নি, তাদের শিশুরাও চাঁদ ধরবে ব'লে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় কোন আনন্দে! এ কি প্রকৃতির অপরিমেয় নির্মমতা, না কি অতুলনীয় করুণা?

১৯৪৩

# খাকি

ড্রাইভরের দিকে পিঠ-দেয়া লম্বা বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসলো ওরা পাঁচজন। সঙ্গে-সঙ্গে বেলেল্লা হল্লায় আট নম্বর বাস্ মুখর হ'য়ে উঠলো। সকলেই অমিশ্র বঙ্গীয়, ঘোর তাম্রবর্ণ, যুবা। কারো গোঁফ উঠেছে, কারো ওঠেনি। কিন্তু মুখে তারুণ্যের স্নিগ্ধতা নেই, অত্যন্ত বেয়াড়ারকমের চোয়াড়ে চেহারা, দেখলে মুখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে। একদা এরা ছিলো কলকাতার স্ট্রীট-বয়, রাজপথের টেড়ি-কাটা বিড়ি-ফোঁকা স্বারাজ্যে এদের আস্তানা ছিলো। আজ যুদ্ধের দৌলতে খাকি প্যাণ্ট প'রে পদস্থ হয়েছে। আজ এদের মুখে বিড়ির বদলে সিগারেট, ককনি বুলির বদলে ইংরেজি বুকনি। আহা, কী ইংরিজি! মাতৃভাষাপ্রেমিক কোনো ইংরেজ যদি শুনতেন তিনি নিশ্চয়ই মনে করতেন যে বড়ো হাতের E-ওলা 'দি এম্পায়ার'-এর জন্য বড্ড চড়া দাম দিতে হচ্ছে। ইংরেজি ভাষাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে সেই মৃতদেহটাকে টুকরো-টুকরো ক'রে কাটছে কারা? তারা মার্কা টোয়েন বর্ণিত ইটালিয়ানরা নয়, তারা কলকাতার রাস্তার ছোঁড়ারা, যারা আজ জনরক্ষার ভার পেয়ে খাকি পাৎলুন পরেছে।

হী-হী ক'রে হাসতে-হাসতে এ ওর গায়ে ঢ'লে পড়ছে, গাল টিপে দিচ্ছে, একই সিগারেট এক মুখ থেকে পাঁচ মুখে ঘোরাঘুরি করছে। অথচ এরা পাগল কিংবা মাতাল নয়।

এরা স্বভাববর্বর মাত্র। কোনোদিন লেখাপড়া শেখেনি, ভদ্রসমাজে মেশেনি, কোনো সৌকুমার্যের চর্চা করেনি। সব দেশের বড়ো শহরেই এ-রকম একটা শ্রেণী থাকে। আমাদের দেশে এরা নতুন, কেননা যন্ত্রযুগের নাগরিক সভ্যতা আমাদের দেশে নতুন। আমাদের দেশের গেঁয়ো অভাজন যারা, তারা আলাদা জাতের। তাদের অজ্ঞ মনে হয়, মূর্খ মনে হয়, বর্বর মনে হয় না। মানুষিক কমনীয়তা থেকে বঞ্চিত নয় তারা। কিন্তু কলকাতার, ঢাকার, লক্ষ্ণৌর রাস্তার ছোঁড়াদের কুখ্যাতি কে না শুনেছেন? তাদের দুর্মানুষিকতায় কে না মর্মাহত হয়েছেন? তবু মনে হয় এরা যখন ধুতি কি পাজামা কি লুঙ্গি প'রে বেড়ায়, তখন পরিধানের নম্রতাই তাদের চরিত্রকে ঈষৎ যেন মার্জিত করে। আমরা বহুদিন পরাধীন আছি ব'লেই হোক, বা স্বভাবতই নম্র ব'লে হোক, আমাদের পরিচ্ছদে, কথাবার্তায়, ব্যবহারে যে-ভাবটি সবচেয়ে পরিস্ফুট তাকে বিরূপ সমালোচক বলবেন দাস্যভাব, অনুকম্পায়ী বন্ধু বলবেন শান্তভাব। আমরা যেখানে একই চেয়ারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একভাবে ব'সে থাকবো, সেখানে একজন ইংরেজ তাঁর উচ্ছল প্রাণশক্তির তাড়নায় কখনো এ-পাশে বেঁকবেন, কখনো ও-পাশে হেলবেন, কখনো পা দুটোকে লম্বা ক'রে চালিয়ে দেবেন মেঝেতে, আবার কখনো গুটিয়ে নেবেন হাঁটুর উপর হাঁটু তুলে। কথা বলতে-বলতে সুখ দুঃখ বিস্ময় সংশয় ইত্যাদির ছায়া ইংরেজের মুখে সিনেমার অভিনেতার মতোই স্পষ্ট হ'য়ে ফোটে; আমাদের মুখে ব্যঞ্জনা কম, চীনেদের মুখে আরো কম। আমাদের কাছে পাশ্চাত্ত্য

অঙ্গভঙ্গি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি মনে হয়, পাশ্চাত্ত্য চোখে আমাদের ঠেকে রহস্যময় পাষাণমূর্তি। কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, সে-কথা অবান্তর, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জাতির মৌল প্রভেদের পরিচয় আছে এখানে। ওদের চঞ্চল স্বভাবে ওরা বিশ্বজয় করেছে, আমাদের শান্ত স্বভাবের জোরে আমরা মরতে-মরতেও মনুষ্যত্ব হারাইনি। আমাদের ইতর জন যারা, তারাও মানুষ, এতদিন এ-কথা আমরা জোর ক'রেই বলতে পারতুম। বিলেতি ফিল্মে বিলেতি ছোটোলোক যখন দেখি, তখন আশ্চর্য হ'য়ে এটাই উপলব্ধি করি যে লোকটা চেহারায়, চরিত্রে, হাবে-ভাবে আমাদের দেশের ইতর জনের চেয়ে ঢের বেশি ছোটোলোক। আবার ওদের মধ্যে যাঁরা ভালো, যাঁরা বড়ো, তাঁরা আমাদের উঁচকপালদের চাইতে সত্যি-সত্যি অনেক উঁচুতে, সেটাও মানতে হয়। ওদের সবচেয়ে ভালোটা আশ্চর্যরকম ভালো, খারাপটাও অতিশয় মারাত্মক। আমাদের ভালোটা হয়তো মাঝারিগোছের, কিন্তু মন্দটাও দুঃসহ নয়। আমাদের রাস্তার ছোঁড়ারাও মেজর বার্বারার পুষ্যিদের মতো একেবারেই 'খাঁটি মাল' নয়, তাদের উদ্ধারের জন্য স্যালভেশন আর্মির প্রয়োজন হয় না; মনুষ্যত্বের যেটুকু ভেজাল নিয়ে তারা জন্মেছে তার কিছু-না-কিছু ছিটেফোঁটা শেষ পর্যন্ত তাদের গায়ে লেগেই থাকে।

এতদিন অন্তত, তা-ই ছিলো। এতদিন এরা ধুতি পরেছে, চপ্পল পায়ে ফটফট ক'রে পথ চলেছে, শিষ দিয়েছে, মেয়ে-ইস্কুলের বাস্‌-এর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপেছে;—

তাতে অপৌরুষ ছিলো, আস্পর্ধা ছিলো না। ধুতি জিনিশটা যেমন দেহের অনেক খুঁত গোপন করে, তেমনি চরিত্রেরও। কিন্তু কাটাছাঁটা খাকি প্যান্ট আজ এদের চেহারার এবং চরিত্রের সমস্ত বরর্বতা নিঃশেষে উদ্ঘাটন ক'রে দিয়েছে; অশিক্ষার সঙ্গে সামরিক ঔদ্ধত্যের সংযোগে এরা আজ মনুষ্যসমাজে অপাংক্তেয়। প্রভুত্বের স্বাভাবিক পৌরুষ এদের কোনোকালেই ছিলো না, তার বদলে সেবকের যে-শান্ত ভাবটুকুর গুণে এতদিন এদের মানুষ ব'লে মনে হ'তো, আজ একটা খাকি পাৎলুনের মূল্যে তাও এরা খুইয়ে বসেছে। এতদিন নিজেদের হীনতা সম্বন্ধে এদের কোথায় একটু লজ্জা ছিলো; আজ তাও নেই, আজ এরা সম্পূর্ণ নির্লজ্জ ও নির্জলা; বীরত্বের আর-কোনো উপাদান সংগ্রহ না-ক'রে শুধু একটা রণবেশের মহিমায় এবং যোদ্ধার হাব-ভাব অঙ্গভঙ্গির কুৎসিত অনুকরণে বিজিত এবং বিজয়ী জাতি উভয়কেই লজ্জা দিচ্ছে। চৈত্রের দুপুরবেলায় এদের চূড়ান্ত অসভ্যতায় আট নম্বর বাস্ উন্মথিত। তাকিয়ে থাকতে-থাকতে অন্নদাশঙ্করের চমৎকার কথাটি মনে পড়লো—'খাকি পরলেই খোক্কস হয়।'

জীবনে কোনোদিনই আমি খাকির প্রেমে পড়িনি। এই অনির্ণেয় অস্পষ্ট অনুজ্জল রং যে আজ পৃথিবীকে এমন ক'রে ছেয়েছে সেটা আমাদের সভ্যতার রুগ্ন দশারই একটা লক্ষণ নয় কি? নয়তো এত ভালো-ভালো রং থাকতে সামরিক ব্যবহারের জন্য খাকি কেন নির্বাচিত হ'লো? শোনা যায় বুওর যুদ্ধের সময় খাকির জন্ম। আফ্রিকার তামাটে মাটির

সঙ্গে রং মিলিয়ে সৈন্যদের পোশাক তৈরি করা হ'লো, প্রকৃতির অনুকরণে এও আত্মগোপনের একটা কৌশল। জানি না আজকালকার যুদ্ধে এই কামুফ্লাজ কতটা কার্যকারী। সামগ্রিক হত্যাকাণ্ডে মনুষ্যজাতি দিন-দিন যে-রকম উপায়নিপুণ হ'য়ে উঠছে, তাতে খাকি প'রে শত্রুর চোখে ধুলো দিতে পারার আশা কম। খাকি তবু দুর্মর। দেশ ছেয়ে গেলো। শুধু রণবেশীরাই নয়, ট্রামের কণ্ডক্টর, ডাকঘরের পিওন, মিলিটারি লরি, সরকারি লেফাফা—যেদিকে তাকাই, চেতন অচেতন সবই যেন খাকি। এই নীরস নিষ্প্রাণ বিবর্ণ বর্ণ আর কত দেখতে হবে! তার উপর আবার কয়েক বছর ধ'রে আপিশের শ্বেতাঙ্গ বেশে খাকি কোর্তার প্রবর্তন হয়েছে, লালদিঘির অর্ধেকটাই আজ খাকি। এদিকে অনেক অগ্রগামী যুবক শখ ক'রে খাকি ইজের পরছেন আর গায়ে চাপাচ্ছেন ঝোপ-কামিজ, ইংরেজিতে যাকে বলে বুশ-শার্ট। যাদের অস্ত্র হাতে নিয়ে ঝোপ বুঝে কোপ মারতে হয়, তাদের পক্ষে ঝোপ-কামিজটা হয়তো মানানসই, কিন্তু তোপের মুখ থেকে যাঁরা অনেক দূরে তাঁরা যে কোন আহ্লাদে ঐ বিচিত্র পোশাকটি অঙ্গে ধারণ করেন তা তো ভেবে পাই না। এর চেয়ে যে বড়ুয়া-পাঞ্জাবি কিংবা 'রাশিয়ান' শার্টও ভালো। হায়রে, এত খাকিও যথেষ্ট নয়, বাঙালি মেয়েরাও নারীবাহিনীতে যোগ দিয়ে খাকি শাড়ি ধরেছেন! হয়তো কয়েক মাসের মধ্যে খাকি শাড়িটাই ফ্যাশান হবে, এবং আমাদের শ্যামশ্রীময়ীরা খাকির খাপে তাঁদের সৌন্দর্যকে কবর দিয়ে সগর্বে ঘুরে বেড়াবেন।

খাকির সমর্থনে একটি কথা শুধু বলা যেতে পারে। ওটা সহজে নোংরা দেখায় না, ওতে খরচ কম। কিন্তু কোনো উজ্জ্বল রঙের পক্ষে ও-কথা তো আরো সত্য। চোখে কী সুন্দর লাগে গাঢ় নাবিক-নীল! দমকলের টকটকে লাল রং কী মনোহারী! অমনি টকটকে লাল রং পরিয়ে সৈন্যদের রণক্ষেত্রে পাঠানো হোক না। রক্ত নিয়েই তাদের খেলা, মানাবে ভালো। খাকিটা অমন নিরপেক্ষ, অমন নৈর্ব্যক্তিক ব'লেই অত খারাপ লাগে, তাতে রাগ বিদ্বেষ ভালোবাসা কিছুই নেই। এর চেয়ে ঢের ভালো কি হয় না, যদি যোদ্ধৃবেশে রাগের লাল রং আগুনের মতো জ্ব'লে ওঠে? কেননা রাগের ধর্ম এই যে তা কোনো-এক সময়ে থামে, এবং একবার থামলে শান্তির প্রেরণা প্রাণের মধ্যেই পাওয়া যায়। কিন্তু রাগদ্বেষবর্জিত, বিশুদ্ধ লুব্ধতাপ্রসূত, একান্ত নৈর্ব্যক্তিক খাকি-রঙা যুদ্ধ—এ কি কোনোদিন থামবে? কাগজে-কলমে শান্তি হ'লেও ভিতরে-ভিতরে ধিকিধিকি জ্বলবে আগুন—১৯১৯ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত যুদ্ধ কি থেমে ছিলো? যদি যুদ্ধ করতেই হয়, রেগে গিয়ে যুদ্ধ করা ভালো, সেটা আপন বিবর্তনের বিধানেই ঠিক জায়গায় এসে সুসম্পূর্ণ হবে—এবং শেষ হবে। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ, রাম-রাবণের যুদ্ধ, পৌরাণিক কোনো যুদ্ধেই উভয় পক্ষের লুব্ধতা নেই, তাই তাদের অবসান শুধুই প্রালয়িক নয়, মানবিক; বিপুল হত্যার পরে মনুষ্যত্ব তার আদিম মর্যাদা ফিরে পেয়েছে। দুর্যোধন-যে বলেছিলেন বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমিও দেবেন না, তার কারণ তাঁর ভূমিলিপ্সা নয়, পাণ্ডবদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ঈর্ষা

ও বিদ্বেষ। ঈর্ষাবিদ্বেষও মানবিক, কিন্তু লোভ দানবিক; রাবণ লোভী, তাই সে রাক্ষস। যদি এমন হ'তো যে রামচন্দ্রও লোভী তাহ'লে রাম-রাবণের যুদ্ধ আজ পর্যন্ত থামতো না। কিন্তু রামচন্দ্র মনুষ্যত্বের মহিমা নিয়েই লোভের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন; তিনি নিজে লোভ করেননি, তাই ব'লে মনুষ্যধর্মের উর্ধ্বে তিনি ছিলেন না, সীতাবিরহে সাধারণ মানুষের মতোই কাতর হয়েছিলেন। রামচন্দ্র-যে সম্পূর্ণই মানুষ, দেবতা নন, অবতার নন, কিংবা হ'লেও সে-বিষয়ে অচেতন, এটাই রামায়ণের সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা এবং বাল্মীকির সবচেয়ে বড়ো কীর্তি।

আজ পৃথিবীর লোককে এ-কথা বলবারই সময় এসেছে—তোমরা ক্রোধ থেকে, ঈর্ষা থেকে, হৃদয়ের কোনো গভীর দুঃখ থেকে যুদ্ধ করো, তাহ'লেই যুদ্ধ থামবে। কলের মতো লড়াই কোরো না, মানুষের মতো যুদ্ধ করো। মানুষে-মানুষে মারামারি হোক, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের সংঘর্ষ বাধুক। তাহ'লে রণক্ষেত্রই একদিন মিলনক্ষেত্রে পরিণত হবে। কিন্তু আজকালকার লড়াই যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রের, ট্যাঙ্ক বোমা মেশিন-গানের মতো মানুষও যুদ্ধের একটা উপাদান মাত্র। আসল সংঘর্ষ কূটবুদ্ধিপ্রসূত চালের সঙ্গে চালের, সে অতি দুর্গম নেপথ্য থেকে আপন কাজ ক'রে যাচ্ছে। আধুনিক জগতের এটাই বোধহয় সবচেয়ে অভিনব আবিষ্কার—এই বিনা-রাগের লড়াই, এই হৃদয়বর্জিত, নৈর্ব্যক্তিক, অ-মানুষিক যুদ্ধ। খাকি তারই প্রতীক।

আধুনিক যুদ্ধের অ-মানুষিক চরিত্র থেকেই খাকির জন্ম,

না কি খাকি রঙের প্রভাবেই আধুনিক যুদ্ধের এই অ-মানুষিকতা, এ-প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব নয়—এবং আপাতত না-করলেও চলতে পারে। আপাতত যেটা শাদা চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সেটা এই যে খাকি রংটা ঘোরতর অপ্রীতিকর। রং হিশেবে এটা নিকৃষ্ট তাতে সন্দেহ নেই; তার উপর আমাদের চোখে খারাপ লাগবার বিশেষ একটু কারণ আছে। সেটা এই যে আমাদের দেশে খাকি কখনো ছিলো না; ওটা ইংরেজ এনেছে, এবং ইংরেজের সঙ্গে আমাদের প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ ব'লে খাকিকে আমরা অত্যন্ত সমীহ করি এবং কিছুটা ভয় করি, কিন্তু তার সঙ্গে মেলামেশার পথ খুঁজে পাই না। আমাদের জীবনের অনেক দূরে, অনেক উপরে, সরকারি স্বর্গলোকে খাকি প্রতিষ্ঠিত। যাঁরা খাকি পরেন তাঁরা আমাদের কর্তা, আমরা দোষ করলে ধমক দেন, যথোচিত সেবা করলে একটু পিঠ চাপড়িয়ে কৃতার্থ করেন। আমাদের মনে খাকি এই প্রভুবৃত্তির সঙ্গে এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যে আমাদের অবচেতনেও এই মনোভাবের প্রভাব কাটে না। অত্যন্ত নিকট আত্মীয়ও যখন খাকি পরেন তাঁকে কেমন পর-পর ঠেকে; কোনো খাকিপরিহিত সুহৃদ সজ্জনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের রাস্তা সহজ মনে হয় না। ও-জিনিশটার বিজাতীয় দূরত্ব আমাদের একটা বহুকালের সংস্কার। তাহ'লেও এটা মানতে হয় যে শ্বেতাঙ্গরা যখন খাকি পরেন তাঁদের বেশ ভালোই দেখায়, কিন্তু আমাদের চর্মের তৈলচিক্কণ তাম্র আভা খাকি এমনই নির্মমভাবে প্রকট ক'রে তোলে যে

ওর সঙ্গে রাজকীয় মহিমার অনুষঙ্গ না-থাকলে আমরা খাকি পরবার আগে সাত বার গলায় দড়ি দিতুম। কথাটা শুনে বন্ধুবান্ধব অনেকেই খুশি হবেন না, কিন্তু সত্যের খাতিরে বলতেই হয় যে কোনো বঙ্গবীর যখন খাকি পাৎলুন আর ঝোপ-কামিজ প'রে বুক টান ক'রে টগবগিয়ে চ'রে বেড়ান, সে-দৃশ্য দেখে ইংরেজের কী মনে হয় তাঁরাই জানেন, আমরা লজ্জায় চোখ তুলে তাকাতে পারি না। শিল্পী যামিনী রায়ের মুখে একটা কথা অনেকদিন শুনেছি: দেশ স্বাধীন হ'লে সেপাইদের পোশাক কী-রকম হবে এ নিয়ে তিনি গভীরভাবে ভাবিত। স্বীকার করবো, তাঁর এই সমস্যা নিয়ে আমি বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিনি; দেশ যদি স্বাধীনই হ'তে পারে তাহ'লে সেপাইদের পোশাকও একটা উদ্ভাবন করা অসম্ভব হবে না, আমার মনের ভাবটা ছিলো এই রকম। কিন্তু সম্প্রতি বুশ-শার্ট পরা বঙ্গবীরদের দেখে যামিনী রায়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গেলো; তাঁর মনে যে এ-প্রশ্নটা উঠেছে তাতে বোঝা গেলো তাঁর জীবনদর্শন কত গভীর। সত্যিই তো, আমাদের সেপাই সান্ত্রী, পোস্টম্যান লিফটম্যান, ট্রাম-কণ্ডক্টর এ. আর. পি., সকলকেই কি আমরা হৃদয়হীন খাকিতে মুড়ে রাখবো? আর সকলেরই ঐ পাৎলুন আর কোর্তা? ধুতি শৌখিনতার অপবাদে লাঞ্ছিত, কিন্তু পাজামা-পাঞ্জাবি কেন আমাদের সরকারি পোশাক হ'তে পারবে না? আর পৃথিবীর স্নিগ্ধ মধুর রংগুলোকেই বা কোন অপরাধে নির্বাসনে পাঠাবো? মনে করুন চাঁপা-রঙের পাজামা-পাঞ্জাবি পরা ট্রাম-কণ্ডক্টর, মেটে

সিঁদুরের রঙে সুসজ্জিত ডাকওলা চিঠি নিয়ে এলো, পায়রার ডিমের মতো ঈষৎ নীল পুলিশম্যান রাস্তার মোড়ে-মোড়ে দাঁড়িয়ে। কল্পনা করতেই জীবনটাকে কত সহজ, স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর মনে হয়। লণ্ডন শহরের রাস্তায় ছ-ফুট লম্বা পুলিশ যখন দাঁড়িয়ে থাকে, তখন তার জাঁদরেল চেহারাসত্ত্বেও তাকে সর্বজনের বন্ধু ব'লে মনে হয়, কারণ সমগ্র পরিবেশের সঙ্গে পোশাকে হাবে-ভাবে চলাফেরায় সে সংগতিরক্ষা করেছে। তাকে দেখেই মনে হয় যে সে সর্বসাধারণেরই একজন, দূর কেউ নয়, পর কেউ নয়, সর্বসাধারণের ইচ্ছাই তাকে ওখানে দাঁড় করিয়েছে। লণ্ডনের লোক তাকে আপন জন ব'লে না-ভেবেই পারে না। কিন্তু আমাদের দেশের পুলিশ তার পরিবেশের মধ্যে একটি জীবন্ত ছন্দপতন, লাল পাগড়ি তাকে সর্বসাধারণের জীবন থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছে। তাকে লোকে ভয় করে বটে, কিন্তু বড্ড বেশি ভয় করে। পুলিশ যদি শুধুই বিভীষিকা হয়, তাহ'লে তার পক্ষে যথার্থ কর্তব্যসম্পাদন সম্ভব হয় না। পট্টি বুট জুতো কোর্তা কামিজে জড়ানো এই রাজপ্রতিভূর সর্বসাধারণের জীবনে স্থান নেই। ও-সব পরিহার ক'রে তাকে যদি আজ ধুতি কিংবা পাজামা পরানো হয়, তাহ'লে সঙ্গে-সঙ্গেই দেশের লোকের সঙ্গে তার একটি হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হ'য়ে যায়। আজকের এই বোমা-পড়া কৃষ্ণপক্ষে এ-সব কথা বাজে কথা নয়, গভীরভাবে ভেবে দেখবার। এমন যদি হয় যে বাড়িতে বোমা পড়েছে, আর খাকি-পরা এ. আর. পি. এলো উদ্ধার করতে, ঐ দুঃসময়েও খাকি রংটাকে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে

পারবো কি? কল্পনা করা যাক সেই একই লোক এলো শুভ্র খদ্দর প'রে; আমাদের মন মুহূর্তে উন্মুখ হবে তার দিকে, সহজ হবে সহযোগিতা। আর যদি রং চাই তো আছে গেরুয়া—আমাদের দেশের জনসেবার প্রাচীন প্রতীক—আর গেরুয়া পছন্দ না হয় তো উজ্জ্বল বৌদ্ধ হলদে আছে, আমাদের হৃদয় তাকেও সানন্দে গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু খাকি নয়, কিছুতেই খাকি নয়।

১৯৪৩

# জিনিশ

মক্কিয়ানির সঙ্গে এ-বিষয়ে আমার বরাবর মতভেদ ছিলো। আমি তাঁকে বলেছি লঘুচিত্ত, মোহাচ্ছন্ন, বস্তুতান্ত্রিক; প্রত্যুত্তরে তিনি কিছুই বলেননি, শুধু ব্যাগের মুখ খুলে যে-জিনিশটি ইচ্ছে সংগ্রহ ক'রে নিয়েছেন। জিনিশের প্রতি তাঁর অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ লক্ষ্য ক'রে আমি বিস্মিত, অনেক সময় বিচলিত, বোধ করেছি। ফেরিওলাদের জন্য বাড়ির দরজা এবং হাতের মুঠো তিনি সর্বদাই খুলে রেখেছেন; ধরমতলার ফুটপাতে চলতে-চলতে ক্ষণে-ক্ষণে তাঁর দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত ও চরণ স্তব্ধ হ'য়ে যাচ্ছে, পথের ধারের প্রতিটি ছোটো দোকানের দ্রব্যসম্ভার একটুখানি নেড়ে-চেড়ে অন্তত না-দেখে তিনি এগোতেই পারেন না; পুরী থেকে ফিরতি ট্রেনে দুপুর রাত্তে কটক স্টেশনে জেগে উঠে হঠাৎ দশ আনা মূল্যে একখানা জাঁতি কিনে গর্বিত পরিতৃপ্ত ভঙ্গিতে একটু হেসেই আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। এক পয়সার কাগজের পুতুল থেকে শুরু ক'রে (এমন দিন ছিলো যখন এক পয়সা দিয়েও কিছু পাওয়া যেতো) দামি-দামি শাড়ি সুজনি আসবাবপত্র পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁর উৎসাহিত আনাগোনা; নানা দেশের কারুকর্মের নমুনা-সংগ্রহ তাঁর পক্ষে দেশভ্রমণের প্রধান না হোক অন্যতম সার্থকতা; একটি শাড়ি কেনার জন্য পঞ্চাশটি দোকানে পদার্পণে ও পাঁচশো

শাড়ি দর্শনে স্পর্শনে তাঁর অক্লান্ত আনন্দ। বলা বাহুল্য, তাঁর বিপণী-অভিযানে আমি কখনোই তাঁর সঙ্গী হই না, এবং তাঁর এই বস্তুমুগ্ধতার সুতীব্র সমালোচনা প্রায়শই ক'রে থাকি। আমার মতে, এক্ষুনি যে-জিনিশের প্রয়োজন নেই সেটা কেনা অপব্যয়, এবং যে-বস্তুর বিহনেও জীবন দিব্যি সুখে-স্বচ্ছন্দে কেটে যাচ্ছে, সেটিকে ঘরে ডেকে আনলে গৃহস্থালির ভার অনর্থক বাড়ানো ছাড়া আর-কিছু লাভ নেই। সম্ভবত বস্তুবিষয়ে আমার মনে একটি দুরারোগ্য অন্ধতা আছে; এটা নিশ্চিত যে আমি স্বভাবতই বস্তুবিলাসী নই। শৌখিন মানুষের দলে আমি পড়ি না; ব্যবহারিক জীবনের মোটামুটি প্রয়োজনগুলি মোটামুটিরকম মিটলেই আমার দিন চ'লে যায়। আরাম ভালোবাসি, কিন্তু উপকরণের বৈচিত্র্যের অভাবে মন ক্লিষ্ট হয় না। জিনিশ ব্যবহার করতে ভালো লাগে, জিনিশ সাজিয়ে রাখতে ভালোবাসি না। জিনিশ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো রসবোধ নেই; ও-বিষয়ে আমি একটু ভোঁতা।

অথচ এটাও ঠিক যে মক্ষিরানি যখনই কোনো আপাত-অনর্থক জিনিশ কিনেছেন, তখন যদিও ঘোর আপত্তি করেছি, পরে দেখা গেছে সেই জিনিশটি আমার জীবনেও কোনো নতুন সূক্ষ্ম সুখ সংযোজন করেছে। একটি নীল রঙের ছাইদানে লেখার টেবিলটি যেন হেসে উঠেছে; লক্ষ্ণৌয়ের টেবিল-ঢাকা কাপড়টি যেই পাতলুম, ঘরে নতুন প্রাণ এলো। জিনিশগুলিকে লক্ষ্য করি আর না করি, তাদের প্রভাব আমার অন্যমনস্কতা অতিক্রম ক'রেও

সঞ্চারিত হয়। এদের না-হ'লে দিন কাটতো না এমন নয়, কিন্তু এদের উপস্থিতি যে উপভোগ্য সেটা শেষ পর্যন্ত না-মেনেও পারি না। কিংবা হয়তো গৃহস্থালির কোনো উপকরণ, যেটা কেনার সময় বাহুল্য মনে হয়েছিলো, ছ-মাস পরে দেখা গেলো সেটাই অপরিহার্য প্রয়োজন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, কেননা ততদিনে তার পূর্ববর্তীর অন্তিম দশা উপস্থিত। তখন মক্ষিরানির নিছক দূরদৃষ্টি ও সাংসারিক সুবুদ্ধির প্রশংসা করতেই বাধ্য হয়েছি; এবং এইভাবে বারে-বারেই যদিও তাঁর কাছে আমার পরাভব ঘটেছে, তবু পুনরায় ঠিক উপলক্ষ্যটি এলেই তাঁর বস্তু-সঞ্চয়ী স্বভাবের প্রতি বক্রোক্তি করতেও আমি ছাড়িনি।

কিন্তু এইবার বুঝি মক্ষিরানির কাছে আমার সম্পূর্ণ, নিঃশর্ত পরাজয়ের দিন এলো। বস্তু সম্বন্ধে আমার অন্ধতার ধন্বন্তরি অযাচিতভাবে দেখা দিয়েছেন; তার চিকিৎসা-পদ্ধতি ঈষৎ কষ্টকর, কিন্তু আরোগ্য এমন আশ্চর্য যে তাকে জন্মান্তর বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই মহাচিকিৎসকের নাম যে মহাযুদ্ধ সে-কথা বোধহয় না-বললেও চলে। আজ যখন আমাদের সমস্ত সম্পদ কতগুলি বহুহস্তস্পৃষ্ট অপরিচ্ছন্ন কাগজে পর্যবসিত, এবং কোনো জিনিশই ইচ্ছে করলেই, এমনকি ইচ্ছে করলেও, আর পাওয়া যাচ্ছে না, তখন আমার মতো উদাসীনেরও প্রখররূপে বস্তুচেতন না-হ'য়ে উপায় কী। আজকের দিনে এই কথাটাই স্পষ্ট হ'য়ে ধরা পড়লো যে যাকে টাকা বলি, এবং যার জন্য সমগ্র সভ্য জগতের প্রচণ্ড লালসা, সেটা আসলে কিছুই নয়; যা না-হ'লে আমাদের

চলে না, যার অভাবে মুহূর্তে আমাদের জীবনস্রোত রুদ্ধ হ'য়ে যায়, তা হ'লো—জিনিশ। চাল চিনি, বসন বাসন, কয়লা কাগজ, ছোট্ট আলপিন থেকে মস্ত মোটরগাড়ি পর্যন্ত ;—আমাদের বেঁচে থাকা, আমাদের কাজকর্ম, আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির মূলে আছে কত যে অসংখ্য বিচিত্র জিনিশের নিঃশব্দ (কিংবা সশব্দ) আত্মনিবেদন, সেটা আজকের মতো তীব্রভাবে আর কবে উপলব্ধি করেছিলুম ? জিনিশ আমাদের জৈব অর্থে বাঁচায়, আমাদের আরামে রাখে, সুখী করে, মনীষার উচ্চতম চর্চাতেও কাগজ, কলম, কালি ইত্যাদি কিছু জিনিশ না-হ'লে আমাদের চলে না, অথচ আমাদের আকাঙ্ক্ষা শুধু ধনের দিকেই ধাবিত হয়, জিনিশগুলিকে সাধারণত উপেক্ষার চোখেই আমরা দেখি।

ধনবিজ্ঞানী বলবেন যে যাকে টাকা বলি তা হচ্ছে সেই শক্তি, যা সম্ভোগের সমস্ত উপকরণ ও উপায় মানুষের হাতের কাছে এনে দেয়, তাই সভ্য মানুষের ধনোপাসনা এমন প্রবল ও সর্বব্যাপী। কথাটা কাগজে-কলমে আমরা সবাই মানবো ; মুখে সবাই বলবো যে টাকার তো নিজস্ব কোনো মূল্য নেই, তার বিনিময়ে যা পাই তারই জন্য তা স্পৃহণীয় ; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে বিনিময়-শক্তির এই আধারটাকেই আমরা চরম মূল্য দিয়ে বসেছি, ক্রয়শক্তির লীলাকে উপেক্ষা ক'রে তার বাহনটিকেই দেবতার আসনে বসিয়ে পুজো করছি। বস্তুর আছে নিজস্ব মূল্য, তার সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ ব্যবহারের সম্বন্ধ ; কিন্তু সে-মূল্য সেই অর্থের উপরেই আরোপ করেছি আমরা, যা আমাদের এবং বস্তুর মধ্যে ক্ষণিকের

মধ্যস্থতা করে মাত্র। টাকা দিয়ে জিনিশ কিনতে পাই ব'লেই যে আমরা টাকা ভালোবাসি তা নয়; জিনিশটা টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে ব'লেই তার যত্ন করি। ধনদেবতা আমাদের মনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন ক'রে আছেন যে কেউ বিনামূল্যে কিছু দিতে চাইলে আমরা গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করি; তখনই সন্দেহ হয় যে জিনিশটা ক্ষতিকর কিংবা এর পিছনে দাতার কোনো কুটিল উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন আছে। যেমন কিনা অযাচিতভাবে যে-সব পুস্তিকা আসে সেগুলিকে আমরা কোনো-না-কোনো রকম বিজ্ঞাপন ভেবে অবহেলা করি, অথচ সেই একই জাতের আত্মপ্রচার যখন পরিপুষ্ট গ্রন্থরূপে আত্মপ্রকাশ করে, তখন পাঁচ টাকা মূল্যে কিনে এনে সগর্বে ড্রয়িংরুমে সাজিয়ে রাখি। যে-জিনিশ চাঁদনিতে চার আনায় ছায়াচ্ছন্ন হ'য়ে আছে, তার দিকে আমরা ফিরেও তাকাই না, কিন্তু ঠিক সেই জিনিশই যখন নিউ মার্কেটে এক টাকার মহিমায় জ্বলজ্বল করে, তার প্রতি আমাদের আকর্ষণ হয় প্রবল। জিনিশটা যে অল্প দামের সেটাই তাকে আমাদের চোখে অযোগ্য ক'রে তোলে; কোনো-কোনো ক্ষেত্রে জিনিশের দাম খামকা অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়াই তার সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপন।

এই বিশুদ্ধ ধনোপাসনা আধুনিক জীবনের মৌল ব্যাধি। ধনীর বস্তুসম্ভার তাঁর ধনের সাড়ম্বর ঘোষণামাত্র। অজস্র বস্তুপুঞ্জ সঞ্চিত হ'য়ে উঠছে, ব্যবহারের জন্য নয়, ভালোবাসার প্রেরণায় নয়, শুদ্ধু এই কারণে যে সেগুলি মহামূল্য, ধনী ছাড়া কেউ কিনতে পারে না, এবং না-কিনলে ধনীর মান

থাকে না। কত অর্থ ব্যয় করেছি এইটে শুধু ভাখো, এ থেকে কতটুকু সুখ পেয়েছি সে-কথা অবান্তর।

এই হচ্ছে বস্তুতন্ত্রের নিকৃষ্টতম রূপ। সম্ভোগবাসনা মনুষ্যধর্মের বহির্ভূত নয়; কিন্তু যখনই দেখা যায় ভোগ্যবস্তুর আকণ্ঠ আতিশয্য সমস্ত রস নিঃশেষে শোষণ ক'রে নিয়েছে, এবং সামগ্রীরাশি শুধুই বিত্তপ্রতিভূরূপে প্রদর্শিত, তখনই বুঝতে হয় এই জঘন্য জড়বাদকে উৎপাটন করতে কোনো-এক বিপ্লব আসন্ন। আজ সেই বিপ্লবের আভাস দিগন্ত কালো ক'রে দেখা দিয়েছে, স্বর্ণলঙ্কার ভিত্তি টলমল ক'রে উঠলো। ইন্দ্র পরম ভোগী, তাঁকে দেবতা ব'লে জ্ঞান করি; কিন্তু রাবণ তো ভোগী নয়, বিলাসী নয়, সে বিশুদ্ধ জড়বাদী, তার রাজ্যে সম্ভোগের উচ্ছলতা নেই, আছে শুধু সম্পত্তিচেতনার দর্পিত বিশুষ্কতা, তার বিপুল স্বর্ণপিণ্ডের অন্তঃপুরেই তার মৃত্যুবাণ প্রচ্ছন্ন আছে। আজকের দিনে যারা রাবণপন্থী তারাও নিশ্চয়ই মরবে।

আজ এই মহাযুদ্ধের ধাক্কায় আমাদের সকলেরই মন ধনভক্তির অবরোধ থেকে বস্তুপ্রীতির সুস্থ হাওয়ায় মুক্তি পেয়েছে। বোঝা যাচ্ছে যে নিজস্ব মূল্য জিনিশেরই আছে, টাকা একটা সামাজিক সংস্কার মাত্র। বর্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন যে আধুনিক ইকনমিক্স এমনি বিকৃত যে আমরা যখনই কোনো জিনিশ কিনি তখনই হস্তান্তরিত টাকাটার কথা ভেবে ঈষৎ মন-খারাপ হ'য়ে যায়; একজোড়া চকচকে নতুন জুতো কিনে কেউ মনে-মনে বলে না, 'বাঃ কতগুলো নোংরা বিশ্রী কাগজের বদলে কী

চমৎকার একজোড়া জুতো পেলুম!' আজ যখন কোনো দোকানে গিয়ে যে-কোনো জিনিশের দাম খুব ভয়ে-ভয়ে জিগেস করতে হয়, পাছে সংখ্যা শুনে সংজ্ঞা হারাই, যখন একজোড়া নতুন জুতো কেনবার মতো নোংরা কাগজ অনেকেই জোটাতে পারে না, তখন রাসেলের এই কথার দূর-প্রসারী ইঙ্গিত উপলব্ধি করা সহজ। এটা তো সহজবুদ্ধির কথা যে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রক্রিয়ায় উভয় পক্ষেরই সমান লাভ; একপক্ষ যেমন টাকা পেলো, অন্যপক্ষ পেলো জীবনের কোনো স্বাচ্ছন্দ্য। কিন্তু আমাদের দূষিত সমাজবিধানের ফলে আমাদের মনের ভাবটা এইরকম দাঁড়িয়েছে যেন লাভটা সম্পূর্ণই বিক্রেতার; যে-লোকটা কিনছে, নবাবের মতো মেজাজ ফলিয়ে খুঁতখুঁত করার অধিকার তার সব সময়ই আছে। আধুনিক সভ্য সমাজে ক্রেতাই অনুগ্রাহক, বিক্রেতা অনুগৃহীত। এতদিন, অন্তত, তা-ই ছিলো।

স্বপ্নের মতো মনে পড়ে দশ-বারো বছর আগেকার কথা, যখন বাজার-মন্দার কালো হাওয়ায় পৃথিবী অন্ধকার; যখন এক পয়সায় দুটো ক'রে দেশলাই দোকানে-দোকানে গিশগিশ করছে; যখন নানাবিধ দালালের আক্রমণে অবসর অস্থির; বিনামূল্যে নমুনা, আপাতবিনামূল্যে লোভনীয় উপহার, কিস্তিবন্দি ব্যবস্থা, প্রায়-অপরিমিত ধারে কেনার সুবিধা—নানা কৌশলে ক্রেতাদের মনোহরণের মরীয়া-চেষ্টায় চতুর্দিক যখন মুখর। তখন গরজটা সম্পূর্ণই ছিলো বিক্রেতার; আমি কিনবো, অতএব আমি রাজার হালে নাক উঁচু ক'রে ব'সে আছি, যে কাছে আসছে তাকেই গম্ভীরমুখে ব'লে

দিচ্ছি—না, এখন সুবিধে হবে না। সে-সব দিনের কথা ভেবে এখন অনুতাপে জ্ব'লে যাচ্ছি। হায় হায়, তখন কেন প্রাণপণে জিনিশ কিনিনি, কেন সবচেয়ে ভালো জিনিশ ব্যবহার করতে কুণ্ঠা করেছি—যখন সবচেয়ে ভালো ছিলো আজকালকার সবচেয়ে খারাপের তুলনায় অবিশ্বাস্য শস্তা? কিন্তু ঐ অতুলনীয় সুলভতার দিনেও আমরা কি খুব সুখে-সচ্ছলতায় ছিলুম? কই, মনে তো পড়ে না। আর আজ-যে দোকানে সাজানো জিনিশের দিকে দৃষ্টিপাত করলেও তার দামের গরমে চোখ ঝলসে যায়, আজও তো নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনস্রোত মোটামুটি সেইভাবেই চলছে। তখন ছিলো জিনিশের ছড়াছড়ি, কিন্তু লোকের হাতে পয়সা ছিলো না; আজ টাকা শস্তা হয়েছে, জিনিশ দুষ্প্রাপ্য। তখনও হাহাকার শুনেছি, এখনও শুনছি। ইকনমিক্সের দুর্বোধ্য রীতিনীতির জটিল গণিতের মোদ্দা ফলটা তাহ'লে একই আছে? এই যুদ্ধের পরে আবার কি আসবে বাজার-মন্দার ঢেউ, সেই দুরবস্থা দূর করার জন্য শুরু হবে সমরোপকরণ তৈরি করা, তারপর সেই উপকরণগুলি ব্যবহার করতে হবে ব'লেই আরো একবার পৃথিবীতে যুদ্ধ আসবে? মানবসমাজ কি তবে পাগলা-গারদ?

কী ক'রে এই দুঃসহ দুর্ব্যবস্থার অবসান হ'তে পারে, কী করলে ইকনমিক্সের এই উন্মত্ত আবর্তে অবিরাম নাকানিচুবনি না-খেয়ে মানুষ তার প্রয়োজনমতো ঠিক সময়ে ঠিক জিনিশটি পেতে পারবে, তাই নিয়ে আজ পৃথিবী ভ'রে পরিকল্পনার ভাবমণ্ডল গ'ড়ে উঠছে। সেই [illegible] থেকে

একদিন নবজীবনের তারা ইতিহাসের আকাশে দেখা দেবে, এই আশায় আমাদের দৃষ্টি আজ দিগন্তে নিবদ্ধ। আপাতত আমাদের প্রত্যক্ষ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এইটে খুব কৌতূহলের সঙ্গে নিরীক্ষণ করছি যে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে উল্টে গেছে। আজ বিক্রেতাই রাজা, ক্রেতা দাসানুদাস। কড়কড়ে নগদ টাকা পকেটে নিয়ে দোকানের এক প্রান্তে পাংশুমুখে চাকরির উমেদারের মতো দাঁড়িয়ে আছি, দোকানি মুখ তুলেও তাকাচ্ছে না। কাগজ কিনতে গেলে মনে হয় কোকেন কিনতে এসেছি, বাঁচবার জন্য ওষুধ কেনার চাইতে মরবার জন্য বিষ কেনা সম্ভবত সহজ। যেখানে দেখেছি দোকানে-দোকানে অজস্র বিচিত্র পণ্য নানা বর্ণসজ্জায় আমাদের দৃষ্টিকে উদ্‌ভ্রান্ত করছে, সেখানে আজকাল একটা কর্কশ নিষেধ দোকানের শূন্য আলমারিগুলির অন্তর থেকে উত্থিত হ'য়ে আমাদের সমস্ত প্রয়োজনকে ব্যঙ্গ করছে। যে যত বেশি কিনবে তারই তত সমাদর, এই ছিলো নিয়ম; এখন দেখছি বেশি পরিমাণে কেনবার ইচ্ছাটা প্রায় একটা অপরাধ ব'লে গণ্য। আমরা যাতে আরো বেশি ক'রে কিনি সেই উদ্দেশে কত সুললিত প্ররোচনায় এতদিন আমাদের মন ভুলিয়েছেন যে-সব পণ্যোৎপাদক, আজ তাঁদেরই মুখে যে কম কেনার উপদেশ শুনতে হচ্ছে, এত বড়ো বিপর্যয় আমরা কি কোনোদিন কল্পনাও করতে পেরেছি? ভ্রমণ করবেন না, শাড়ি সামলে চলুন, পুরোনো জুতোর আয়ুঃ বাড়ান—প্রতিদিন নানা দিক থেকে এই রকম ধমক খেতে-খেতে সন্দেহ হচ্ছে যে

আমাদের বেঁচে থাকাটাই বোধহয় কোনোরকমের বেআদবি। এই মনে ক'রেই নিজেদের কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি যে যুদ্ধ যত দীর্ঘই হোক চিরস্থায়ী হ'তে পারে না, সর্বভুক সৈন্যদল একদিন থাকবে না, কিন্তু আমরা থাকবো, এবং তখন আজকের এই অবজ্ঞাত আমরাই উৎপাদক ও বিক্রেতার পুনরুজ্জীবিত চাটুকারিতা ভোগ করতে পারবো।

আপাতত জীবনধারণ যতই কষ্টকর হোক, ক্রেতার গৌরব যতই ভূলুণ্ঠিত হোক না, এ-কথা মনে না-ক'রে পারি না যে এই অবস্থার একটা ভালো দিকও আছে। টাকার বদলে আমরা আজকাল জিনিশ ভালোবাসতে শিখছি। যারা আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহারের জিনিশ তৈরি করে ও হাতের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা আজ আর বই প'ড়ে শিখতে হচ্ছে না। স্বীকার করবো, পয়সা দিয়ে জিনিশ কেনার দেমাকে এতদিন তাদের অত্যন্ত অবজ্ঞা করেছি। আশা করেছি, আমার কাছে তারা হাতজোড় ক'রে থাকবে। এখন দেখা গেলো এমন দিনও আসে যখন গৃহসেবক রজক গোপালক থেকে শুরু ক'রে বড়ো-বড়ো মিলওয়ালা পর্যন্ত সকলের কাছেই জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজনগুলির জন্য আমাকেই হাত জোড় ক'রে থাকতে হয়। দেখা গেলো যে তাদের না-হ'লে আমার চলে না; সত্যি বলতে তারাই সংসার চালায়। এই উপলব্ধিটা, আর যা-ই হোক, স্বাস্থ্যকর।

জিনিশ যারা তৈরি করে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে-সঙ্গে দুর্ভিক্ষের দিনে জিনিশের প্রতি একটা মমত্ববোধও

স্বতই সঞ্চারিত হচ্ছে। যত নিশ্চেতন বস্তুর সঙ্গে প্রতিদিনের জীবনযাপনে আমাদের অন্তরঙ্গ সংযোগ, তাদের সঙ্গে যে আমাদের শুধুই অনাত্ম প্রয়োজনের সম্বন্ধ নয়, তাদের সংশ্রবেও যে আমাদের প্রাণে কিছু রং ধরে, রস লাগে, এ-কথাটা এমন ক'রে কখনো কি বুঝেছিলাম? তাদের শুধু ব্যবহারই করেছি, তাদের দিকে তাকিয়ে দেখিনি; আমাদের জীবনরচনার পূর্ণতা তাদের উপরেও যে কিছুটা নির্ভর করে এটা অনুভব করার কোনো উপলক্ষ্য কখনো ঘটেনি। আজ যুগান্তকারী ঝোড়ো হাওয়া জিনিশের মুখের উপরকার পরদা উড়িয়ে নিলো। এই-যে কলমটি দিয়ে লিখছি, এর সঙ্গে আমার কত দিনের মিতালি; এর সূক্ষ্ম-সোনালি মুখ দিয়ে আমার মনের কত কথা রাশি-রাশি কাগজের বুকে কালিমালেপন ক'রে দিয়েছে; কখনো ভাবনার সঙ্গে দ্রুত পাল্লা দিতে গিয়ে একে দৌড় করিয়েছি, আবার কখনো কথা যখন বিমুখ হয়েছে চুপ ক'রে ব'সে-ব'সে আঁচড় কেটেছি, যেন নাচের ফাঁকে-ফাঁকে নটীর লাস্যময় বিশ্রাম। আমার সকল সুখদুঃখের ভাগী, সকল কর্মের সঙ্গী এই ক্ষুদ্র সরল যন্ত্রটি আজ সত্য হ'য়ে আমার কাছে প্রকাশ পেয়েছে। যেদিন শুনেছি, এই কলমটির বাজার-দর বর্তমানে নব্বুই টাকা, যেদিন জেনেছি এটি খোওয়া গেলে ঠিক এইরকম আর-একটি আপাতত আমার অনধিগম্য, সেদিন থেকে এটি আমার কাছে নিছক একটা প্রয়োজনীয় জড় পদার্থ আর নেই, আমার মনের মধ্যে একে যেন জীবন্তরূপে উপলব্ধি করেছি।

## জিনিশ

ঐ তো—আবার সেই টাকার কথাই এসে গেলো। দাম বেড়েছে, সেই অনুপাতে আমাদের মনেও জিনিশের মূল্য বেড়েছে। কিন্তু এর পিছনে শুধুই আমাদের হিশেবি বুদ্ধি নেই, মনোভাবেরও একটা পরিবর্তন আছে। বস্তু আজ এই-যে মূল্যটা পাচ্ছে, সেটা আপাতদৃষ্টিতেই গাণিতিক, প্রকৃতপক্ষে মানসিক। যাকে বলি নর্ম্যাল কিংবা যথোচিত দিনকাল (আসলে যেটা এই দুর্দিনের মতোই ঔচিত্যহীন), সেটা যখন ফিরে আসবে, তখনও কি আজকের বহুদুঃখে অর্জিত এই শিক্ষা আমাদের মনে থাকবে না যে অর্থের সার্থকতা শুধু ব্যবহারে, সম্ভোগে—সঞ্চয়ে নয়, প্রদর্শনে নয়? চিরকাল আমরা দেখেছি যে টাকা খরচ ক'রে জিনিশ কিনে সত্যি-সত্যি খুশি হ'তে পেরেছে শুধু তারাই, বয়সে যারা ছেলেমানুষ, আর পেরেছে মক্ষিরানির মতো মেয়েরা। আমরা যারা বয়স্ক, যারা বিজ্ঞ, সুবুদ্ধিসম্পন্ন, আমরা কেবল ভয় করেছি বুঝি ঠ'কে গেলুম। অর্থের প্রতি যে-অন্ধ আসক্তির মোহাবরণে আমাদের চেতনা এতদিন আচ্ছন্ন ছিলো, আজ তা দূর হ'লো। আজ দেখতে পাচ্ছি যে আমরা বুদ্ধিমানেরা সত্যি বড়ো ঠ'কে গেছি। আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে জিনিশটাই লভ্যাংশ, টাকাটা আসলে ফাঁকি। মক্ষিরানির কথাই ঠিক—টাকা দিয়ে কী হয়, একটা জিনিশ কেনা যাক, তবু থাকবে।

১৯৪৩

# ব্ল্যাক-আউট

যাক, এতদিনে তবু কলকাতার আকাশে চাঁদ উঠলো। চাঁদ উঠলো, ফুটলো অন্ধকার, এতদিনে সম্ভব হ'লো একটি সত্যিকার অন্ধকার ঘরে ঘুমোনো। খাট যেমন ক'রেই ঘোরানো হোক, যেদিকে মাথা ক'রেই শোয়া যাক, কোনো-না-কোনো জানলার কোনো-না-কোনো ফাঁক দিয়ে পথের বিজলি-বাতি চোখে এসে আর লাগে না—সমুদ্রপারের এক ফুঁয়ে সব আলো নিবে গেছে রাস্তায়। ঘরের ঘোমটা-পরানো বিমর্ষ আলো যেই নেবালুম, জেগে উঠলো অন্ধকার। কালো, কালো।

বিশেষত এই বর্ষার মেঘে-চাপা রাতগুলিতে অন্ধকারের অতল লাবণ্যে চোখ দুটোকে স্নান করিয়ে নিচ্ছি। ফাঁকি নয়, মেকি নয়, একেবারে খাঁটি, নিছক, জমাট অন্ধকার—রাসবিহারী এভিনিউর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত জুড়ে ধ্বকধ্বক ক'রে জ্বলছে। অন্ধকার জ্বলছে শুনে পণ্ডিত মশাই মুখ বাঁকাবেন না ; প্রান্তরে কি নদীর উপরে, কিংবা রাত-চেরা রেলগাড়ির দু-ধারে, অন্ধকার সত্যি-সত্যি জ্বলে, যার চোখ আছে তারই চোখে পড়ে। শহরে আমরা অন্ধকারকে একেবারে ক্ষত-বিক্ষত নির্জীব ক'রে রাখি, পার্কে একটুখানি ছায়া-ঢাকা বেঞ্চির জন্য কত খোঁজাখুঁজি করতে হয়। কিন্তু প্রাণান্তকর জখম হ'য়েও অন্ধকার যে মরেনি, এবার

তার প্রমাণ হ'লো। যেই না সুযোগ পাওয়া, অন্ধকার জেগে উঠলো তার সমস্ত আদিম রূপযৌবন নিয়ে।

এই নিষ্প্রদীপকতার আদেশে যেন অন্ধকারের পুনরুজ্জীবনের উৎসব শুরু হ'লো। আজকাল সন্ধ্যা হবার সঙ্গে-সঙ্গেই আকাশ থেকে স্নিগ্ধচিক্কণ অবলুপ্তি নামে, নিজের বাড়ি হাৎড়ে খুঁজে ফিরি, আগন্তুক বাড়ি চিনতে না-পেরে ফিরে যান। বাড়িগুলি বেশির ভাগ গা-ঢাকা দিয়ে চুপ, ভিতরে মিটমিট ক'রে আলো জ্বলছে কি জ্বলছে না, অনেক লক্ষ্য করলে তবে তা বোঝা যায়। এরই মধ্যে হঠাৎ যদি দু-একটা জানলা জ্বলজ্বল করে, মনে হয় বুঝি স্বর্গের কোনো জানলা গেছে খুলে, আর কোনো ক্লান্ত অপ্সরী সেখানে মাথা হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর রাত বাড়ে—শুতে যাবার আগে একবার রাস্তার ধারের বারান্দায় এসে দাঁড়াই—এ কী অতল অকূলে চোখ হারায়, মন ডুবে যায়। রেলগাড়ি শেয়ালদা স্টেশনের আঙিনা পার হওয়ামাত্র হঠাৎ যে-অন্ধকার দৃষ্টির দিগন্তসীমা পর্যন্ত দখল করে, এও সেই। আশ্চর্য!

আর শুধু কি অন্ধকার! সেদিন স্পষ্ট দেখলুম শহরের শান-বাঁধানো পথ চাঁদের আলোয় হেসে উঠেছে। সন্ধ্যার পর বাস্ থেকে নেমে বাড়ির দিকে হাঁটছি—হঠাৎ দেখি, এ কী! এ যে জ্যোছনা! বিশ্বাস করা শক্ত, কিন্তু সত্যি তা-ই। সমস্ত পথটিতে একটি স্বচ্ছ নীল আভা ছড়ানো, যেন এইমাত্র ভোর হ'লো। গাছের পাতার ফাঁকে-ফাঁকে ঝিরিঝিরি হিরে-মুক্তোর ঝিকিমিকি দেখলুম, হেঁটে-যাওয়া মানুষদের পায়ের তলায় একটি ক'রে শান্ত চান্দ্র ছায়া,

আর মাথার উপর হালকা আকাশে মেঘ-আলো-করা টুকরো চাঁদের মুচকি হাসি। মন কেবলই বলতে লাগলো—এ কী? এ কী হ'লো? কলকাতা এ-সব পেলো কেমন ক'রে? মেঘ যখন কেটে যাবে, আকাশ ভ'রে তারাও ফুটবে, কলকাতার কতদিনের মরা আকাশ বিশ্বের আনন্দ-ছন্দে আবার কি বেঁচে উঠবে হঠাৎ!

এ-কথা মানতেই হয় যে ব্ল্যাক-আউট এসে আমাদের বরাত খুলে দিয়েছে। আমরা নগরবাসীরা বড়োই গরিবের মতো দিন কাটাই; আমাদের জীবনে জ্যোছনা নেই, অন্ধকার নেই, আকাশ নেই; বছরের পর বছর বর্ষা আসে, তার স্পর্শ পাই না, কখন বসন্ত এসে চ'লে যায়, সময় হয় না তার সঙ্গে চেনা করার। ঋতুর সমারোহ সব ব্যর্থ; আকাশের, বাতাসের, মেঘের, গাছপালা-ফুল-পাখির এত মন্ত্রণা সব মিথ্যা হ'য়ে যায়। খিদের সময় না-খেলে যেমন খিদে ম'রে যায়, তেমনি আমাদের চিরবঞ্চিত ইন্দ্রিয়গুলির অভাববোধই যায় নষ্ট হ'য়ে—দিনের পরে দিন কাটে, মনে হয় বেশ তো আছি, যা-কিছু দরকার সবই আছে। সবই আছে—তা ঠিক; ট্র্যাম আছে, বাস্ আছে, স্যানিটারি বাথরুম আছে, আছে টেলিফোন, রেডিও;—কিন্তু কী যে নেই, আর কতখানি যে নেই তা বুঝতে পারি কলকাতার বাইরে গেলেই। কলকাতার বাইরে, চোখ যখন আকুল হ'য়ে আকাশে ছোটে, আর মাটি আর জল, ঘাস আর ঘাসের গন্ধ যখন চারদিক থেকে বন্ধুর মতো জড়িয়ে ধরে, তখন বুঝতে পারি যে আমাদের

ইন্দ্রিয়-মনের এ-পিপাসা মরবার নয়, শহরের ইট-পাথর-লোকজনের চাপে তা নির্জীব হ'য়ে থাকে মাত্র, অনুকূল হাওয়া পেলেই তীব্র হ'য়ে ওঠে আবার। তৃষ্ণার তৃপ্তির যেখানে সুযোগ আছে, তৃষ্ণা সেখানেই প্রবল হ'তে থাকে; যেখানে তৃপ্তির কোনো আশাই নেই, সেখানে আমাদের অচেতন মন তৃষ্ণাটাকেই চাপা দিয়ে রাখে, এটা হয়তো জীবের আত্মরক্ষারই একটা উপায়। নয়তো এই কলকাতায় রাতের পর রাত জ্যোছনা না-দেখে, অন্ধকার না-দেখে, দিনের পর দিন আকাশের মুক্তি থেকে বঞ্চিত হ'য়ে, বছরের পর বছর ঋতুরঙ্গের অংশী না-হ'য়ে, কেমন ক'রে আমরা বাঁচতুম!

আমরা যারা কলকাতায় কয়েদি, আমাদের বরাত এতদিনে তাহ'লে খুললো। কথাটা নিঃসংশয়ে, সম্পূর্ণভাবে বলতে পারলে খুশি হতুম। কিন্তু এই নিষ্ঠুর নগর এক হাতে দিয়ে আর-এক হাতে কেড়ে নেয়। ঐশ্বর্য ছড়ানো আমাদের সামনে, কিন্তু উপভোগে কত যে বিঘ্ন! কথাটা যদি কেউ স্থূল অর্থে গ্রহণ করেন আপত্তি করবো না, আমাদের জৈব জীবনের ক্ষেত্রে মর্মান্তিকরূপেই সত্য এ-কথা। যে-সব শারীরিক এবং মানসিক সুখসম্ভোগ অর্থ দিয়ে কিনতে হয়, তাদের কথা ছেড়েই দিলুম; কলকাতায় ধনীর ঘরে ছাড়া চাঁদও আলো দেয় না, এ তো প্রত্যক্ষ সত্য। পার্ক স্ট্রীটের দক্ষিণে হেঁটে দেখেছি, গাছপালায় নির্জনতায় ধোঁয়াহীন খোলা হাওয়ায় পল্লীটিকে বেশ মনোরম ব'লেই বোধ হয়েছে, এমনকি উপরের দিকে তাকিয়ে আকাশের তারাও দেখতে পেয়েছি। এদিকে আমরা পাঁচজন

যে-সব পাড়ায় যে-সব বাড়িতে থাকি সেখানকার ব্যবস্থা একেবারেই অন্যরকম। এই ভেদনীতি এতদিন নীরবে সহ্য করছিলাম, কিন্তু এই সাম্যবাদী ব্ল্যাক-আউট আমাদের মনে দারুণ দুরাশা জাগিয়েছে। সত্যি বলবো, এই অকুণ্ঠিত জ্যোছনা আর নিবিড় অন্ধকার দেখে নিজেকে হঠাৎ ভারি বড়োলোক ঠাউরেছিলুম, কিন্তু এ নিয়ে মন খুলে যে উচ্ছ্বাস করবো তার উপায় নেই; আলো তো নিবলো, কিন্তু গোলমাল কে থামাবে। কলকাতা নিষ্প্রদীপ হ'য়ে পল্লী-প্রকৃতির অনুকরণ করছে, অথচ ট্র্যাফিকের কাংস্য কলরোল যেমন ছিলো তেমনি আছে—না, বরং আরো বেড়েছে যেন, অন্ধকারে পাছে কোনো পথিকের হঠাৎ শিঙা ফোঁকবার কারণ ঘটায়, সেই ভয়ে মোটরগুলো প্রাণপণে শিঙা ফুঁকতে-ফুঁকতে চলে, ট্র্যামের তীক্ষ্ণ গোঙানি থেকে-থেকে কানে বেঁধে—এই অদ্ভুত অসংগতি প্রায় অসহ্য মনে হয়। মনে করুন সন্ধ্যার পর রাস্তায় বেরিয়েছি, আকাশে অল্প জ্যোছনার আভাস, ইলেকট্রিসিটির হঠাৎ অন্তর্ধানে চিরপরিচিত পাড়া যেন রূপান্তরিত—কিন্তু এই জ্যোছনার প্রতি, জ্যোছনাপ্রসূত মধুর মনোভাবের প্রতি কিছুমাত্র মমতা না-ক'রে ট্র্যামগুলো বর্বর তারস্বরে ছুটোছুটি করে, ঘোলাটে অস্পষ্ট লালচে গোল-গোল চোখ মেলে মোটরগুলো প্রায় ঘাড়ে এসে পড়ে আরকি—শান্তি নেই। কিংবা রাত এগারোটায় রাস্তায় যখন ঘুটঘুটে অন্ধকার, পানের দোকানের সামনে ছুটি-পাওয়া চাকরদের বেলেল্লা হল্লা চলছে তখনো। শান্তি নেই। চাঁদ হোক,

অন্ধকার হোক, ঋতুর কোনো লীলা হোক, তাকে সম্পূর্ণ ভোগ করতে হ'লে একটি গভীর নীরবতা চাই—যে-নীরবতার ফাঁক প্রকৃতি তার নিজের ভাষায় ভরিয়ে তোলে, তার সমুদ্রকল্লোলে, বাতাসের নিঃস্বনে, ঝড়ের, জলের শব্দে, পাখির কাকলিতে। আকাশ ভ'রে জ্যোছনা ফুটেছে, কিংবা বিশাল অন্ধকারে পৃথিবী মুছে গেছে, অথচ তার সঙ্গে গভীর স্তব্ধতা নেই, এ যেন আমরা কল্পনাই করতে পারি না। চাঁদ বলতেই সঙ্গে-সঙ্গে স্তব্ধ কথাটি আমাদের মনে প'ড়ে যায়, রাত্রি স্বভাবতই নীরব। সেই স্বভাবকে অস্বীকার ক'রে—কিংবা জয় ক'রে—আমরা শহর গড়েছি; এক দিকে ফ্যাক্টরিতে কাজের জ্বর, অন্য দিকে প্রমোদভবনে বিলাসের উন্মত্ততা—রাতকে-দিন-করা বৈদ্যুতিক আলোয় এ যদি সারা রাত ধ'রে চলে তো চলুক, ভালো-লাগা মন্দ-লাগার কথা ছেড়ে দিয়ে স্বীকার করবো যে এরও একটা রূপ আছে। কিন্তু আলো নিবলো অথচ কোলাহল কমলো না, এ কী সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড! হয় রাতকে দিন ক'রে তোলো, নয় পুরোপুরি রাত হ'তে দাও। রাতের শান্ত চেহারা নিয়ে দিনের জোরালো ব্যবহার কেন? যদি এই সঙ্গে দিনযাপনের পদ্ধতিরও বদল হয়, যদি দিনের কাজ ভোর ছ-টায় আরম্ভ হ'য়ে বেলা দুটোর মধ্যে শেষ হয়, আর সন্ধে হ'তেই সবাই খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ে, ট্র্যাম-বাস্ থেমে যায়, তাহ'লে হয়তো অনেকখানি সার্থক হ'তে পারে এই ব্ল্যাক-আউট।

যা-ই হোক, রাত্রিকে একটু অন্তত ফিরে পেলুম কলকাতায় ব'সেই, এই খুশির কথাটা এখানে লিখে রাখি। আপনারা

যারা মফস্বলে থাকেন, একবার কলকাতার এই নতুন রূপটি দেখে যাবেন। পথ হারাবার আশঙ্কা রইলো, গাড়ি-চাপা পড়ার কথাটাও ওঠে—এবং এই শহরের বিখ্যাত দ্রষ্টব্য বস্তু অনেক কিছুই হয়তো দেখতে পাবেন না এখন। কিন্তু সেই সঙ্গে এমন-কিছু দেখে যাবেন যা সত্যি-সত্যি দেখবার মতো।

জুন, ১৯৪১

পুনশ্চ :

এখন আর আক্ষেপ করার কারণ নেই। অন্ধকার আরো গাঢ় হয়েছে, জ্যোছনা আরো উজ্জ্বল। আর সেই সঙ্গে কোলাহলের গলাও আর শোনা যাচ্ছে না। তেলের অতি সংকীর্ণ বরাদ্দে গাড়ি অচল, সন্ধ্যার অনতিপরে বাস্ নিখোঁজ, আর লোকজন—কোথায় তারা? কলকাতায়, বিশেষ ক'রে আমাদের এই দক্ষিণাঞ্চলে, জনসংখ্যা আজকাল এতই কম যে রাত্রি তার আদিম ঐশ্বর্য প্রায় ফিরে পেয়েছে। ঘুটঘুট্টি অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে কোনোরকম একটা শব্দের জন্য কান পেতে থাকতে হয়—গোঁয়ার ট্র্যামগুলো আগের মতোই গ্যাঁ-গোঁ আওয়াজ করতে-করতে যাওয়া-আসা করে, ঐ একটা মাত্র শব্দে বুঝতে পারি যে নাগরিক সভ্যতা এখনো অবলুপ্ত হয়নি। ভালোই—কিন্তু এত বেশি ভালো না-হ'লেও বোধহয় চলতো।

ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২
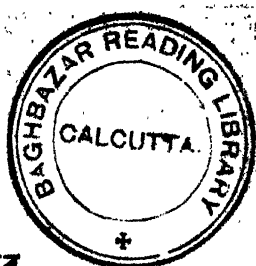
# প্রোফেসর

দেখলেই চেনা যায়। গোল-গোল চোখের দৃষ্টি মোটা চশমার চাপে বিহ্বল, যেন আশে-পাশে কিছুই দেখছেন না, যেন দেখবার কিছু নেই, এই দৃশ্যময় মস্ত জগৎটা যেন অস্পষ্ট বিবর্ণ কুয়াশায় মোড়া। মোটাসোটা নধর কান্তি, গোলগাল গম্ভীর মুখ, নিরীহ বিনীত নিরুপদ্রব অথচ ঘনবিন্যস্ত গোঁফের কোমল বঙ্কিমার নিচে ঠোঁট প্রায় ঢাকা, তবু যেটুকু চোখে পড়ে সেটুকুই পানের রঙে লাল। কাঁধের উপর ভাঁজ-করা চাদরটি পরিপাটি ঝোলানো, হাতে চামড়ার ব্যাগ, ভিতরকার মোটা-মোটা বইগুলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে ইটের মতো শক্ত রেখায়, পরনে শাদাশিধে ধুতি, পায়ে ফিতেওলা ইংরেজি জুতো। ট্র্যামে, বাস্-এ, বৈকালিক ফুটপাতে এঁকে আপনি দেখেছেন, এবং দেখেই সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিয়েছেন, কেননা (ব'লে দিতে হয় না) ইনি সাধারণ লোক নন, ইনি প্রোফেসর।

যে-সব ক্ষণজন্মা ছেলেদের দেখিয়ে হতভাগাদের মা-বাবারা ব'লে থাকেন, 'ওর মতো হ'তে পারিসনে?'—ছেলেবেলায় ইনি ছিলেন তা-ই। ইশকুলে আগাগোড়া প্রাইজ পেয়েছেন, ঘরে-বাইরে নম্রমধুর স্বভাবে বয়স্কদের প্রশংসা কেড়েছেন, দশ বছর বয়স থেকে চোখে চশমা এঁটে ছাপানো বইয়ের কালো-কালো অক্ষরগুলোর 'পরে দৃষ্টি ক্ষয় করেছেন

অবিরাম—তখন থেকেই বোঝা গেছে এ-ছেলে কিছু-একটা হবে। ইনি নভেল পড়েছেন ইংরেজি শিখবেন ব'লে, অ্যাডভেঞ্চারের গল্প পড়েছেন ভূগোল শিক্ষার উৎসাহে, বুক অব নলেজ চ'ষে ফিরেছেন সাধারণ জ্ঞানের পুঁজি বাড়াবার জন্য। ম্যাট্রিক পাশ না-করা পর্যন্ত সন্ধের পরে বাইরে থাকেননি, টেড়ি কাটেননি, পান খাননি। এক কথায়, ইনি ছিলেন সব দিক থেকেই গুরুজনরঞ্জন। অবশ্য সমবয়সীর বিভীষিকাও ছিলেন, কিন্তু তাতে কী এসে যায়?

বঙ্গীয় পুরুষের পক্ষে যেটা জীবনের চরম সার্থকতা, সেই আই. সি. এস্-এর স্বর্গলোকও এঁর অনধিগম্য ছিলো না। কিন্তু বিদ্যাচর্চাতেই এঁর জীবন উৎসর্গিত ব'লে—কিংবা হয়তো ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তির বাধা ছিলো ব'লে—ইনি ইম্পীরিয়ল কৈলাসের দিকে দৃষ্টিপাতমাত্র করলেন না। এই ত্যাগের কথা মনে রাখতে হবে। আজ আস্ত একটা জেলার দরিদ্রের মাতাপিতারূপে অধিষ্ঠিত হ'য়ে মাসে আড়াই হাজার টানতে পারতেন, তবু কত সহজেই বিদ্যাদানের বিনিময়ে পাঁচশোতেই তিনি খুশি। (কিংবা হয়তো আরো কম, এত কম যে সংখ্যাটা ভদ্রসমাজে উচ্চারণ করা যায় না। যা-ই হোক, ভদ্রগোছের উদাহরণই নেয়া যাক।) হয়তো অর্থাগমের আরো দু-একটি স্রোত বিশ্ববিদ্যাবিতরণের নিগূঢ় উৎস থেকে প্রবাহিত হচ্ছে তাঁর দিকে; হয়তো বালিগঞ্জে তাঁর বাড়ি তৈরি হচ্ছে কিংবা হবে; হয়তো দৃষ্টিকটু হবে ব'লে, কিংবা আবাল্য বিলাসিতাবিরোধী ব'লেই গাড়ি কেনেননি; হয়তো অপত্যসংখ্যার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর ব্যাঙ্ক-বইয়ের অঙ্কও বছর-বছর

বাড়ছে ;—সে যা-ই হোক, যিনি আই. সি. এস. হ'তে পারতেন অথচ হলেন না, তাঁর সেই ত্যাগের কতটুকুই বা ক্ষতিপূরণ বিদ্যাব্যবসার সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সম্ভব। ইনি যে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যবরণ ক'রে নিয়েছেন এ-কথা স্বীকার না-ক'রে উপায় কী।

সত্যি বলতে, জীবনের বসন্ত ঋতুতে নিজেকে যত নির্মম বঞ্চনা ক'রে আজ এই প্রোফেসরির ধূসর শিখরে তিনি সমারূঢ়, তার বিনিময়ে কতটুকুই বা তিনি পেয়েছেন। এঁর বালিগঞ্জের বাড়ি, এঁর লম্বাচওড়া জীবনবীমা, এঁর শাঁসালো শেয়ারগুচ্ছ—এ-সব কিছুই ঈর্ষা করা চলবে না; মেনে নিতে হবে, তাঁর ত্যাগের তুলনায় এ-পাওনা নিতান্তই সামান্য। কল্পনা করুন তাঁর কলেজ-জীবনের, অর্থাৎ প্রথম যৌবনের বছরগুলি। অধ্যয়নের সংকীর্ণ চক্রে আবদ্ধ হ'য়ে কেটেছে তাঁর দিন, লাল-নীল পেন্সিলের দুঃস্বপ্নে, ফুটনোটের বর্জইস অক্ষরের চোরাবালিতে, গ্রন্থ, গ্রন্থের ভাষ্য, সেই ভাষ্যের টীকা, পুনরায় সেই টীকার সমালোচনা—এরই জটিল আবর্তে ঘুরপাক খেতে-খেতে ক্ষয় করেছেন কত বর্ষার রাত্রি, কত বসন্তের দিন। এই-যে কঠোর অধ্যবসায়—এ কি অবহেলা করবার? অন্য ছেলেরা যখন হো-হো ক'রে আড্ডা দিয়েছে লিলি কেবিনে চায়ের পেয়ালা সামনে নিয়ে ব'সে, তিনি তখন প্রোফেসরদের পদানুসরণ করেছেন কলেজের করিডর থেকে ভবানীপুরের বাড়ি পর্যন্ত, তাঁদের মতামত মুখস্থ করেছেন, জেনে নিয়েছেন কে তাঁদের প্রিয় লেখক, কোন-কোন গাল-ভরা বুলি তাঁদের পছন্দ, তাঁদের মধ্যে

কে কোন বিষয়ের পরীক্ষক সেটা সর্বদা রেখেছেন মনোদর্পণে। অন্য ছেলেরা যখন প্রক্সি দিয়ে পলাতক, সিনেমায়, ফুটবলে কিংবা তরুণীচর্চায় গুলজার, তিনি তখন পয়লা বেঞ্চিতে ব'সে প্রোফেসরের পরীক্ষার্থীতারিণী বাণীর নোট নিচ্ছেন, নিজের স্বাভাবিক বুদ্ধিকে প্রাণপণে চাপা দিয়েছেন জগদ্বিখ্যাত, অথরিটিদের অনুশাসনের তলায়, নিজেকে এমন ক'রে তৈরি করেছেন যাতে পরীক্ষার খাতায় তাঁর রচনা প'ড়ে কারোরই মনে এমন সন্দেহ না জাগে যে স্বাধীন চিন্তার এতটুকু ক্ষমতাও তাঁর আছে। পরীক্ষার অনতিপূর্বে অন্য ছেলেরা যখন উৎকণ্ঠায়, অনিদ্রায়, অতিশ্রমে কাতর, তিনি তখন ঠিক দশটায় আলো নিবিয়ে শুতে গেছেন—পাছে শরীর খারাপ হয়, তারপর রাত থাকতে উঠে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছেন—ঘড়ি ধ'রে বাড়ি ফিরে নিবিষ্ট হয়েছেন অধ্যয়নে। এই একান্ত একাগ্রতা—এ কি তুচ্ছ করবার? উন্মীলমান দেহ-মনের সমস্ত পানাহার তিনি ছাপানো পুঁথি থেকে এবং প্রোফেসরের মুখামৃত থেকেই সংগ্রহ করেছেন—এদিক-ওদিক কোনোদিকেই তাকাননি—আষাঢ়ের মেঘের দিকে না, নিজের বেশভূষার দিকে না, এমনকি সহপাঠিনীর শাড়ির দিকে পর্যন্ত না, কিংবা এই শেষোক্ত অঞ্চলে যদি বা কখনো, আত্মবিস্মৃতির কোনো বিরল মুহূর্তে, কোনো আত্ম-অচেতন ক্ষণিক বিভ্রমে চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে থাকেন, ক্লাশের সব চাইতে বখা ছোকরাও তা টের পায়নি; সে-কথা জানেন শুধু তিনি আর তাঁর অন্তর্যামী। নিজেকে এমন ক'রে যিনি বঞ্চিত করতে

পারেন, তাঁকে মহত্ত্বের উপাধি থেকে বঞ্চিত করি, এমন সাধ্য কী আমাদের।

সার্থক হ'লো নিষ্ঠা, পুরস্কৃত হ'লো অধ্যবসায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পয়লানম্বরি ডিগ্রিবান হ'য়ে তিনি বেরিয়ে এলেন, প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে ভর্তি হ'লেন তাঁদের দলে, এতদিন যাঁদের পায়ে-পায়ে ফিরেছেন। জীবন-প্রবেশিকার দ্বিতীয়ার্ধ সম্পন্ন করতেও দেরি হ'লো না; পিতার আদেশে মাতার দাসী ঘরে আনলেন, এবং সেই জীবন্ত বস্তুটির সঙ্গে জড়পদার্থ যা ঘরে এলো তাতে মা-র মুখের মেঘ কেটে আলো ফুটলো। বছর খানেকের খাটুনির ফলে বৃত্তি জুটলো রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ। এক ধাপ উপরে উঠলেন। আরো তিন বছর পরে আরো একটু উঁচুদরের খাটুনির পুরস্কার পাওয়া গেলো জমকালো পি.-এইচ. ডি.। আরো এক ধাপ উপরে উঠলেন। তার পর থেকে এখন পর্যন্ত মসৃণভাবে উন্নতির ধাপে-ধাপে তিনি উঠছেন। চূড়া দেখা যায়-যায়। জীবনের অন্তিম পর্বে বিশ্ববিদ্যার একটি বিভাগীয় সিংহাসন অলংকৃত করতে পারবেন এমন আশা এখন আর দুরাশা নয়।

অবশ্য এই উপাধিগুলি অর্জন করতে যে-পরিশ্রম তাঁকে করতে হয়েছে তা যেমন কঠোর তেমনি নিষ্প্রাণ, কেননা এ-কাজ একরকমের মহিমান্বিত কেরানিগিরি, যার অন্য নাম রিসর্চ। সেইজন্যই একে আরো বেশি বাহবা দিতে হয়। যে-কাজে আনন্দ আছে, যে-কাজে কিছু-একটা বানাতে হয়, যেমন ছুতোর, কুমোর কি কবির কাজ, সে-কাজ তো নিজেই নিজের পুরস্কার, তা ঘর্মক্ষর হ'লেও ক্লান্তিহর,

তাতে সমস্ত অবসাদ দূর হ'য়ে একটি নির্মল প্রসন্নতায় শরীর-মন ভ'রে ওঠে। কিন্তু পাঁচশো বই ঘেঁটে সন-তারিখ-খুঁটিনাটি সংবলিত একটি তথ্যতালিকা তৈরি করা, কিংবা কোনো-এক বিষয়ে নানা দেশের পঁচিশ জন বিশেষজ্ঞের [illegible] চুম্বক মিশিয়ে একটি খিচুড়ি পাকানো—এ-কাজ একাধারে ঘর্মক্ষর এবং অবসাদময়, তা জীবনীশক্তির মূলে আঘাত করে—এবং এই নীরস নিরুত্তাপ নিরানন্দ কাজ যিনি ধৈর্য ধ'রে মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছর করতে পারেন, মস্ত মোটা ডিগ্রি দিয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করা আমাদের সামাজিক কর্তব্য। ধিক্ সেই সমাজকে, যেখানে এত ধৈর্যের, এত শ্রমশক্তির সমাদর নেই। মূল্যবানের মূল্য আমরা জানি; যিনি কাগজে-কলমে প্রমাণ ক'রে দিতে পারেন যে তিনি কোনো-একটি বিষয়ে পাঁচশো বই পড়েছেন কিংবা নেড়েছেন, চেখেছেন কিংবা দেখেছেন, তিনি যে যথার্থ পণ্ডিত তা আমরা সবিনয়ে ও সানন্দে স্বীকার করি।

অনেকে হয়তো মনে করতে পারেন যে এই সারসংগ্রহ কিংবা তালিকানির্মাণের কাজে প্রোফেসরও কোনো-এক রকম আনন্দ পান, নয়তো তিনি নিরন্তর তা ক'রে যেতে পারেন কেমন করে? এ-রকম কল্পনা করলে প্রোফেসরের মহত্ত্ব ক্ষুণ্ণ করা হয় মাত্র; আমি অন্তত এ-ধারণাকে প্রশ্রয় দিতে পারি না। যে-কাজে আনন্দ আছে, তা তো যে-কোনো সাধারণ লোক করতে পারে, কিন্তু যাতে আনন্দলাভের সুদূরতম সম্ভাবনাও নেই, সে-কাজে অবিচল আত্মনিয়োগ

করতে পারে কে?—একমাত্র প্রোফেসর। তিনি যে আনন্দ পান না, অথচ কর্তব্যের দাবি নিঃশেষে পূরণ করেন, সেখানেই তো তাঁর অসামান্যতা, তাঁর মহিমা। তাঁর আনন্দ কাজে নয়, কাজের লক্ষ্যস্থলে—ডিগ্রিলাভে, আনুষঙ্গিক পদোন্নতিতে। লক্ষ্যের দিকেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ, উপায়টা অনিবার্য, তাই অবশ্যস্বীকার্য। সেটা প্রিয় হ'তে হবে এমন কোনো ছেলেমানুষি আবদার তাঁর নেই। আত্মসুখে উদাসীনতাই তাঁর কৃতিত্বের মূল।

এই উদাসীনতা ক্রমে হয়তো জড়তায় পরিণত হয়, আনন্দ সম্বন্ধে চেতনাই আর থাকে না। পঠন-পাঠন থেকে যে উপাধিই শুধু নয়, কিছু আনন্দও আমাদের লভ্য আছে, তা তিনি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হন; বই যে শুধু লাল পেন্সিলের রক্তাক্ত রণক্ষেত্র নয়, ওটা যে একটা উপভোগ্য বস্তুও, তা ধারণা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। তাই তাঁর চোখের দৃষ্টি অমন শূন্য, অমন অসহায়; বাস্তব জগতে, যেখানে জীবনের লীলা বিচিত্র স্রোতে ব'য়ে চলেছে, সেখানে তিনি ভীত, বিমূঢ়, অক্ষম; জীবনের দুর্বোধ বন্যতা থেকে কাগজগন্ধী লাইব্রেরি-ঘরেই তাঁর নিশ্চিন্ত আশ্রয়। বই থেকে তিনি জীবনের পাঠ নেননি, শুধু তথ্য নিষ্কাষণ করেছেন, তাই বই তাঁর অনাক্রমণীয় দুর্গ। যদি বই তাঁর কাছে জীবন্ত হ'তো, জীবনের ভাষ্য হ'তো, তাহ'লে বইও তাঁকে চিন্তিত, অশান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলতো; কিন্তু বই তাঁর কাছে জীবনের নয়, অন্য বইয়েরই ভাষ্য—অথবা উপাদান; তা থেকে তিনি খুঁটে বের করেন শুধু থীসিসের দেয়াল গাঁথবার

আল-মশলা, তাই কোনো বই তাঁকে চঞ্চল করে না, সত্যি বলতে স্পর্শও করে না। বই তাঁর কাছে মৃত, তাই সম্পূর্ণ নিরাপদ। সারা জীবন ভ'রে তিনি পাঠচর্চাই করলেন, অথচ বইয়ের প্রাণশিখা তাঁর নিজের প্রাণে সংক্রমিত হ'লো না, অন্তরের দীপ জ্ব'লে ওঠবার যত অসুবিধে, যত দুঃখ—তা যে আজীবন এড়িয়ে যেতে পারলেন তিনি—এ-কীর্তি কি কম! যেন বসন্তরোগে ছেয়ে গেছে যে-দেশ তারই ভিতর দিয়ে অবাধভ্রমণ করছি, অথচ নিজের গায়ে একটিও গুটি বেরোলো না। এই অসাধ্যসাধন করতে পারে কে?—একমাত্র প্রোফেসর। কল্পনা, চিন্তা, অনুভূতি, সংশয়, বেদনাবোধ—এই সমস্ত দুঃখকর রোগ থেকে তিনি স্বভাবতই মুক্ত, চারদিকে বীজের ঝড় ব'য়ে গেলেও তাঁকে ছোঁয়াচ লাগে না, লাগতে পারে না। এ যদি মহত্ত্ব না হয়, মহত্ত্ব তবে কী?

আর-একবার দেখুন প্রোফেসরকে—গম্ভীর, শ্রদ্ধেয়, অনিন্দ্য; পরিপুষ্ট নধর কান্তি; বিহ্বল, অসহায় দৃষ্টি; কী নিশ্চিন্ত তাঁর জীবন, কী শান্তিময়, কী স্বচ্ছন্দ মসৃণ! তাঁর মতো অকৃত্রিম ভালোমানুষ আর কোথায়! এমন মৃদু, এমন শান্ত তাঁর স্বভাব! এমন নিশ্ছিদ্র সততা তাঁর ব্যবহারে! কন্যার পিতা প্রার্থনা করেন খোদ আই. সি. এস.-এর পরেই প্রোফেসর জামাতা, কারণ প্রোফেসরই একমাত্র মানুষ, যিনি দরিদ্র হ'লেও বিদ্বান, এবং বিদ্বান হ'য়েও চরিত্রবান। ঘোরতর সংশয়ী বাড়িওলাও প্রোফেসর শুনলেই এক কথায় বাড়ি ভাড়া দিয়ে দেন—কেননা প্রোফেসর বাড়ি ভাড়া দিতে অক্ষম

হবেন এটা যদি বা সম্ভব, বাড়ি ভাড়া তিনি দেবেন না এটা অভাবনীয়; পরের পাওনা চুকিয়ে দেবার ক্ষমতার অভাব ঘটলেও না-দেবার মতো সাহস যে তাঁর হ'তে পারে সেটা অবিশ্বাস্য। যেখানে টাকাকড়ির দেনা-পাওনার ব্যাপার সেখানে 'প্রোফেসর' কথাটি ম্যাজিকের মতো কাজ করে; বৈষয়িক ব্যক্তিরা নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানেন লোক-ঠকানো কাজটিতে কতখানি সাংসারিক তীক্ষ্ণতা প্রয়োজন, এবং সে-তীক্ষ্ণতা প্রোফেসরের প্রতি আরোপ ক'রে তাঁরা আপন বুদ্ধির অপমান করেন না। নৈতিক ক্ষেত্রে, তাই, ব্রুটসের স্ত্রীর মতোই ইনি সকল সংশয়ের ঊর্ধ্বে। বালিগঞ্জের দক্ষিণ-খোলা বাড়িতে, গ্রন্থ আর পুত্রকন্যায় পরিবেষ্টিত, অবসরবহুল আরামে আপ্লুত, তিনি পরিপূর্ণ মাত্রায় ভোগ করছেন বিষয়ীর বিশ্বাস, প্রতিবেশীর শ্রদ্ধা, পরীক্ষার্থীর স্তাবকতা। নিজের জীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে লেশমাত্র সংশয় তাঁর মনে নেই। তিনিই ধন্য, যিনি নিঃসংশয়।

আর তাঁর কর্মক্ষেত্র—সে তো তাঁর বৈকুণ্ঠধাম। বিদ্যামন্দিরের পূজনীয় পাণ্ডা তিনি, পরীক্ষাবৈতরণীর খেয়াঘাটের কাণ্ডারী। সারবান, ভারবান, সাবধানী, তাঁর বিদ্যাদান আনন্দভোগের প্রগল্‌ভতায় কখনো আবিল নয়। ইতর উৎসাহ তাঁর তথ্যের বিশুদ্ধতাকে কখনো কলুষিত করে না। টগবগে জ্যান্ত প্রাণ নিয়ে যে-সব তরুণ ছাত্র তাঁর কাছে আসে, তাঁর শৃঙ্খলার দীক্ষায় ক্রমে তাঁরা নিরুৎসুক নতমুখ হ'তে শেখে; পাঠ্য বিষয়কে প্রাণের স্পর্শ থেকে যথোচিতরূপে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখবার কঠিন সংযম আয়ত্ত হয়

তাদের; তারা বুঝতে শেখে যে যন্ত্রের নিপুণ নির্জীবতাই পরীক্ষাপ্রাঙ্গণে তাদের প্রধান সম্বল। তাঁরই আদর্শকে তারা সব সময় অন্তরে স্মরণ করে, যাঁর নির্ভুল পাণ্ডিত্য ব্যক্তিগত মতামতের হাওয়ায় কদাচ আন্দোলিত নয়, যাঁর বোঝবার এবং বোঝাবার পদ্ধতিতে ভালো লাগা কি মন্দ লাগার ক্ষণিকতম বিশৃঙ্খলাও নেই—প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে যিনি স্থির, অবিচল, অব্যর্থ। সত্যি যিনি প্রোফেসর, যিনি জাত-প্রোফেসর, তিনি তো এই রকমই। একান্ত নিঃস্পৃহ তিনি, তাঁর কোনো ব্যক্তিগত রুচি নেই, কোনো প্রিয় বিষয় নেই। তিনি-যে ইংরেজি সাহিত্য না-প'ড়ে অর্থশাস্ত্র, কিংবা দর্শন না-প'ড়ে ইংরেজি সাহিত্য পড়েছেন, তার বিশেষ-কোনো কারণ নেই; যে-কোনো বিষয়ে কৃতিত্ব তাঁর সমানই হ'তো। পাঠ্যবস্তু হিশেবে কীটস আর কাণ্ট-এ কোনো পার্থক্য নেই তাঁর কাছে। তিনি শেলি পড়েছেন গণিতের মতো ক'রে, শেক্সপিয়র পড়েছেন শবব্যবচ্ছেদের পদ্ধতিতে; যা-কিছু হাতে নিয়েছেন তা-ই বুঝেছেন;—বুঝেছেন—বুঝেছেন—নিঃশেষে, নিঃসংশয়ে না-বুঝে ছাড়েননি। তাই তাঁর বক্তৃতায়, তাঁর রচনায় তিনি শুধু বুঝিয়েই চলেন; যাতে বোঝাবার কিছু নেই তাও বোঝান, যাতে বোঝাবার মতো কিছু হয়তো আছে সেখানে তাঁর বিদ্যার বিরাট যন্ত্রটিকে চালিয়ে দেন এমনভাবে, যাতে সরলকে সরলতর এবং জটিলকে জটিলতর করতে-করতে তাঁর মুখের ও কলমের ফেনা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে। বহু বছরের অক্লান্ত অভ্যাসে এ-কাজটি একেবারে নিখুঁতরকম যান্ত্রিক হ'য়ে পড়ে;

তাতে কোনো দায়িত্ব থাকে না, নিত্য-নতুন মানসিক প্রতিক্রিয়ার সংঘাত, কিংবা সমস্যা-সমাধানের প্রয়োজন, তাঁকে-যে বিচলিত করবে সে-রকম সম্ভাবনাই লুপ্ত হয়। পাণ্ডিত্যের শক্ত খোলশ যে-কোনোরকম আক্রমণ সংক্রমণ থেকে তাঁকে রক্ষা করে—এমন আত্মস্থ, অব্যস্ত, নিরুপদ্রব জীবন আর কার! তাই দেখা যায়, সাম্প্রতিক সাহিত্যের তিনি ছায়াও মাড়ান না, বহুদিনের মৃত লেখকরাই তাঁর নিত্য সঙ্গী;—নিছক ব্যক্তিগত রুচির তাড়নায় পরিচালিত সাধারণ পাঠক তো তিনি নন—যে-লেখক সম্বন্ধে অন্তত পঞ্চাশখানা বই লেখা না হয়েছে, তার সম্বন্ধে কিছু বলতে যাবেন এমন দুর্মতি কি তাঁর হ'তে পারে? লোকটার কী জাত, কোন তরফের ইজম কী পরিমাণে ওর মধ্যে আছে, তা-ই এখনো জানা গেলো না, ওর বই হাতে নিয়ে তিনি কি তাঁর উচ্চ আসনের অসম্মান করবেন! কখনো না, কখনোই না। রুচি জিনিশটা বড়ো চপল, ওকে একটুও বিশ্বাস নেই, তাই তিনি প্রথমেই ওটাকে গলা টিপে মেরেছেন; তাঁর যেটা নির্ভর সেটা অতিশয় ভারি ওজনের, সেই তাঁর নীরন্ধ্র পাণ্ডিত্যের বর্মকে কোনো নামগোত্রহীন প্রভাব কি ভেদ করতে পারবে? না, না, না। তা যে কত অসম্ভব তাঁর প্রণীত গ্রন্থাদিই তার প্রমাণ। যে-কোনো বিষয়েই তিনি লিখেছেন—কাব্য, দর্শন, ইতিহাস—সে-বিষয়ে স্বভাবত যতই উত্তেজনা থাক না, তাঁর আশ্চর্য দক্ষতা তাকে পরিণত করেছে সেই জাতীয় বস্তুতে, কীটস যাকে বলেছেন 'dull list of common things'। আমাদের প্রগল্‌ভ উৎসাহ, আমাদের বর্বর

কৌতূহল মুহূর্তে নির্বাপিত হয়, লজ্জিত হ'য়ে উপলব্ধি করি এখানে আমরা ফুর্তি করতে আসিনি, শিক্ষিত হ'তে এসেছি; বুঝতে পারি যে যে-কোনো বিষয় শুষ্ক, নীরস, নিষ্প্রাণ তথ্যতালিকায় রূপান্তরিত হ'লে তবেই তা পাণ্ডিত্যের পবিত্র প্রাঙ্গণে প্রবেশের অধিকার পায়—আর ঐ রূপান্তর যিনি নিরশ্রু চক্ষে, অকম্পিত বক্ষে, নির্মম নিয়মনিষ্ঠায়, একান্তবিশ্বস্ত যান্ত্রিকতায় সম্পাদন করেন, তাঁর উদ্দেশে একটি-মাত্র বলবার কথা আমরা খুঁজে পাই—তুমি ধন্য, ধন্য হে।

১৯৪৩

# পড়া

লোকে নানা কারণে বই পড়ে : কেউ পরীক্ষা পাশ করতে, কেউ উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে অস্থায়ী চাকরি স্থায়ী করতে, কিংবা স্থায়ী চাকরিতে আর-এক ধাপ উপরে উঠতে।—কিন্তু এ-শ্রেণীর পাঠককে প্রথমেই বাদ দিয়ে রাখছি, কেননা সত্যিকার পাঠক এদের বলাই যায় না। এ ছাড়া কেউ পড়ে নেহাৎ সময় কাটাতে, কেউ বা খোঁজে আমোদ কিংবা উত্তেজনা, কেউ বা পড়ে বন্ধুবান্ধবকে এ-কথা ব'লে চমক লাগাতে যে অমুক-অমুক বই সে পড়েছে। কেউ বা বই পড়েন, কেউ বা পড়েন লেখক। কারো সঙ্গে দশ মিনিট আলাপ করলে আপনি ইংরেজ, জর্মন, রুশ, ফরাশি, আইরিশ, মার্কিন এত লেখকের নাম (আর কী অদ্ভুত সে-সব নামের উচ্চারণ!) শুনবেন যে আপনার মাথা ঘুরে যাবে; কেউ আবার এক হাজার খুন জখম গোয়েন্দাগিরির গল্প পড়েছেন, কিন্তু কোনো লেখকের নাম তাঁর মনে নেই, কাহিনীগুলিও প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই মুছে গেছে। এই দু-জনের মধ্যে কে বেশি অবাঞ্ছনীয়, তা বলা শক্ত; কেননা একদিকে যেমন বলা যায় যে গোগ্রাসে রাশি-রাশি অসার বই গেলা সারাদিন তাস খেলার মতোই একটা বদ নেশা, তেমনি এ-ও ঠিক যে বইয়ের উপভোগ্যতার চাইতে লেখকের সুনামের দিকে যাঁদের ঝোঁক বেশি, তাঁরা নিজের

আত্মশ্লাঘাকেই তৃপ্ত করেন, সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁদের কৌতূহল নামমাত্র। বাকি থাকেন তাঁরা, যাঁরা আনন্দের জন্য বই পড়েন, এবং পাঠক হিশেবে তাঁরাই সার্থকতম।

কিন্তু বিবিধ প্রলোভনের ফাঁদ তাঁরাও যে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলতে পারেন তা নয়। প্রধান ফাঁদ হ'লো লেখকদের খ্যাতি। উচ্চশিক্ষিতের মধ্যে এমন পাঠকের সংখ্যা নিশ্চয়ই খুব কম, যাঁরা নিঃসংশয়ে নিজের উপভোগের পরিমাণকেই বইয়ের উৎকর্ষের মাত্রা ব'লে মানবেন। তাঁদের এ-মনোভাব উন্নাসিকতা থেকে উদ্ভূত, না বিনয় থেকে, তা কে বলবে। জগদ্বিখ্যাত কোনো লেখকের বই নিয়ে ব'সে যখন আপনার সত্যি-সত্যি ভালো লাগে না, যখন দু-পাতা প'ড়ে হাই ওঠে, এবং বই রেখে দিয়ে ঘুমোতে ইচ্ছে করে, তখন—আপনি যদি অসাধারণ দাম্ভিক না হন—আপনি নিশ্চয়ই লেখকের খ্যাতি ভিত্তিহীন ব'লে সন্দেহ না-ক'রে নিজের বোধশক্তিকেই দুর্বল মনে করবেন। লেখক যখন নামজাদা, তখন বইখানা নিশ্চয়ই চমৎকার, এই রকম একটা মোহের বশবর্তী হ'য়ে নিজের কাছেও এ-ভান করা সম্ভব যে ও-বই পড়বার যে-বিরক্তি, আসলে সেটাই আনন্দ; কিন্তু তার চেয়ে অকপটে স্বীকার করাই ভালো যে বইখানা ভালো লাগলো না, যদিও লেখকের মহিমা কোথায় তা হয়তো বুঝতে পারছি, কিংবা তাও পারছি না, আশা করি কিছুদিন পরে, সাহিত্যবিষয়ে আরো বেশি শিক্ষিত হ'লে, পারবো। কিন্তু নিজের কাছে না হোক, পরের কাছে ও-কথা স্বীকার করার সততা ও সাহস আমাদের অনেকেরই হয় না। এবং

এই কারণে, পাঠক হিশেবে আমরা প্রায় সকলেই খানিকটা ভণ্ড ; বই থেকে পরিপূর্ণ উপভোগ আহরণ করতে অক্ষম।

ব্যাপারটি আরো একটু জটিল হয়েছে এই কারণে যে বিশ্বসাহিত্যের অনেক শ্রেষ্ঠ কীর্তিই আপাতত, শুধু আপাতত কেন, প্রকৃতপক্ষেই, একটু নীরস। এ-কথা কবিতা কি ছোটোগল্পের চাইতে উপন্যাস সম্বন্ধেই বেশি প্রযোজ্য ; কারণ যে-গল্প পড়তে পনেরো মিনিট থেকে আধ ঘণ্টা লাগে তা একটু নীরস হ'লেও লেখকের উপর রাগ হয় না ; এবং অন্য সমস্ত সাহিত্যরূপের তুলনায় কবিতার (অন্তত আধুনিক কবিতার) স্বাতন্ত্র্য এইখানে যে আকারে তা ক্ষুদ্রতম, খুব দীর্ঘ হ'লেও দু-শো চারশো লাইনের বেশি গড়ায় না, এবং আট দশ চোদ্দ লাইনের মধ্যেও অমর কবিতা সম্ভব। বার-বার পড়া, এমনকি কিছু খেটে-খুটে পড়া অসম্ভব নয় ব'লে, দুরূহ কিংবা আপাতনীরস হবার অধিকার কবিতার আছে, একবার সে-কবিতার মর্মে প্রবেশ করতে পারলে সেই স্বল্প শ্রমের অসামান্য পুরস্কার পাওয়া যায়। ভালো কবিতা যতবার পড়া যায়, ততবার নতুন লাগে, এবং তত বেশি ভালো লাগে ; কবিতা যাঁরা ভালোবাসেন, তাঁরা একই কবিতা অসংখ্যবার পড়েন, এটাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু উপন্যাস-উৎসাহীদের মধ্যে এমন লোক কম যিনি খুব প্রিয় নভেলটিও দু-বার পড়েছেন ; উপন্যাসের বৃহৎ আকারই এখানে মস্ত বাধা। তাছাড়া, কাহিনীটি একবার জানা হ'য়ে গেলে কৌতূহলের উত্তেজনাও ক'মে আসে,—বেশির ভাগ উপন্যাস সম্বন্ধেই এ-কথা সত্য ;

সুতরাং দ্বিতীয়বার পড়বার প্রেরণা সহজে আসে না। উপন্যাসেরই, তাই, অতি সহজে ও অবিলম্বে উপভোগ্য হওয়া দরকার, পাঁচশো পাতার বই, তাও যার মধ্যে হয়তো একশো পাতাই জোড়া দেবার কলকব্জায় ভরা, এমন বই 'খেটে-খুটে' পড়া পেশাদার পণ্ডিতের পক্ষেই সম্ভব, সাধারণ পাঠকের পক্ষে নয়।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে নীরসতা উপন্যাসেরই ব্যাধি—বিশেষত ইংরেজি উপন্যাসের। উনিশ শতকের বিখ্যাত ইংরেজি উপন্যাসগুলির মধ্যে এমন বই দু-চারখানার বেশি মনে করতে পারবেন না, যার প্রথম একশো পৃষ্ঠা পড়তে আপনাকে লগি ঠেলতে-ঠেলতে হাঁপিয়ে পড়তে হয়নি। প্রস্তাবনার মারপ্যাঁচ অতিক্রম ক'রে আসল গল্পটুকুর মধ্যে এসে পড়তে পারলে আর অবশ্য ভাবতে হয় না—কিন্তু অন্তরঙ্গতর পরিচয়ের অপেক্ষা না-রেখেই অনেক পাঠক যদি পলায়ন করেন, সেটা কি খুব অবাক হবার? ফরাশি উপন্যাস এ-বিষয়ে অনেকটা ভালো; আকারে অপেক্ষাকৃত ছোটো, এবং বর্ণনারও বাড়াবাড়ি নেই; সাধারণত এমন একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আরম্ভ হয় যে প্রথম লাইন পড়লেই আরো পড়তে ইচ্ছে করে। আধুনিক কালে ইংরেজি উপন্যাসেরও চেহারা ও চরিত্র কিছু বদলেছে—অনেকটা ফরাশিরই প্রভাবে।

এ-কথা অস্বীকার করতে চাওয়া বৃথা যে উপন্যাস পড়তে ব'সে আমরা সকলেই চাই যে গল্পটি তরতর ক'রে বলা হ'য়ে যাবে, লেখক আমাদের কানে ধ'রে তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে টেনে নিয়ে

যাবেন, থমকে দাঁড়াবার, প্রশ্ন করবার, সন্দেহ করবার সময় দেবেন না। ডিকেন্স ও হার্ডিতে গল্প-বলার এই দুর্বার আবেগে ছাড়া আর কোনোখানেই মিল নেই ; টুর্গেনিভ কি আনাতোল ফ্রাঁসের উপন্যাস অপেক্ষাকৃত ঢিমে লয়ে চলে, কিন্তু চলে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে এমন নিশ্চিত স্রোতে যে পাঠকের অন্যমনস্ক হবার উপায়ই থাকে না—এবং টলস্টয়, ঔপন্যাসিকের চূড়ামণি, বিবিধ মহামূল্য সম্পদে বোঝাই-করা জাহাজের অদ্বিতীয় নাবিক—তাঁর 'সংগ্রাম ও শান্তি'র সুদীর্ঘ পথে যাত্রা করবার সাহস যদি আপনার থাকে, তাহ'লে গল্পের অদম্য টানে ঢেউয়ের ঝাঁকুনি খেতে-খেতে দেশ-দেশান্তর অনায়াসে আপনি পার হ'য়ে যাবেন—আপনার পক্ষে এ যে কী বিরাট ও বিচিত্র ভ্রমণ, বইখানা শেষ ক'রে তবে তা উপলব্ধি করবেন। এ-ধরনের বই আরম্ভ করতেই শুধু সাহস দরকার, বাকি কাজ বইটিই করে। কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে পৃথিবীর সব বিখ্যাত উপন্যাসই এ-ধরনের নয়। যাঁদের নামে সবাই মাথা নিচু করে এমন অনেক লেখকেরই রচনাবলী পাঠকের ধৈর্যকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলে। কোনো দুঃসাহসিক হয়তো বলতে পারেন যে যে-বই স্বতঃই উপভোগ্য নয়, সে-বই মহৎ হ'তে পারে না, কেননা উপভোগ্যতাতেই বইয়ের সার্থকতা, কিন্তু এখানে পাঠকের যোগ্যতার তারতম্যের, এবং বিভিন্ন ব্যক্তিগত মেজাজের কথা ওঠে ; অর্থাৎ যার যেমন ধাত, মরজি ও শিক্ষা-দীক্ষা, সে-হিশেবে প্রত্যেক পাঠকই নিজের প্রিয় লেখক বেছে নেন। তাহ'লেও এটা ঠিক যে মহৎ লেখক যিনি,

তিনি প্রথমটায় না-হ'লেও শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ পাঠককেই প্রভাবগ্রস্ত করেন; আবার এমন লেখকও আছেন, যে-কোনো শ্রেণীর পাঠককেই যাঁদের বই চেষ্টা ক'রে, এমনকি কষ্ট ক'রে পড়তে হয়, যদিও জগৎ জুড়ে প্রতিষ্ঠা তাঁদের অসাধারণ। নিজের কথা বলতে পারি, প্রুস্ত যে একটু নীরস এ-ধারণা আমি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছি না; তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের মাত্র প্রথম খণ্ডটি তিন বারের চেষ্টায় শেষ করতে পেরেছিলুম, আর তারপর আর দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য ক্ষুধাবোধ করিনি।

আমার বিশ্বাস, আমার মতো আরো অনেক পাঠক আছেন যাঁরা প্রুস্ত-এর মহাকাব্যটি প'ড়ে ওঠার চেষ্টায় একাধিকবার ব্যর্থ হয়েছেন। অথচ এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে ঐ গ্রন্থের প্রভাব অতি গভীর। আমারই দোষ, সন্দেহ নেই। হয়তো আর পাঁচ কি দশ বছর পরে, এখন যে-বিরাট কীর্তির সিংহদ্বারে ঢুকেই থমকে দাঁড়াই, সরাসরি একেবারে তার অন্তঃপুরে ঢুকে যেতে পারবো। কিন্তু যতদিন সহজেই সে-ক্ষমতা না আসে—মহৎ কীর্তির সামনে ব'সে-ব'সে ঘর্মাক্ত হওয়া কি ভালো? না, সেটা ভালো না; কারণ যে-বই আমরা সত্যি-সত্যি উপভোগ করি না, তা থেকে কিছুই আমরা আহরণ করতে পারি না। বই প'ড়ে লাভবান হ'তে হ'লে ভালো লাগাটাই প্রথম ও প্রধান শর্ত। এমনকি, লেখার কলাকৌশল শিখতে হ'লেও আমরা শুধু সেই গ্রন্থেরই দ্বারস্থ হ'তে পারি, যেখানে আমাদের আনন্দ অবারিত।

পাঠক হিশেবে আমি এখন, তাই, সতর্ক। যে-বই ভালো লাগে না, সে-বই অসমাপ্ত ফেলে রাখতে যেমন দ্বিধা করি না, তেমনি নতুন-নতুন ক্ষেত্র থেকে আনন্দ আহরণের চেষ্টাতেও আমি পরাঙ্মুখ নই। অর্থাৎ, আমি এখন লেখক না-প'ড়ে লেখা পড়তে উৎসুক। ছেলেবেলায় বড়ো নামের মোহ মনের মধ্যে প্রবল ছিলো, তাই সব লেখকই, এবং সব লেখকের সব বই-ই সমান ভালো লাগতো। সে-ভালো-লাগা বোধহয় নবযৌবনের বিশ্বব্যাপী আনন্দেরই একটা মঞ্জরী; কারণ সত্যিই কি সব বই আমার ভালো লাগতো, না কি আমারই মনের অফুরন্ত আনন্দবোধ সমস্ত বইয়ে—শুধু বইয়ে কেন, সমস্ত জগতে—সংক্রমিত হ'তো, তা এখন বলতে পারবো না। তবে সব বই-ই শেষ পর্যন্ত পড়তুম, এবং শেষ ক'রে অনেকগুলো প্রশংসাত্মক বিশেষণ বন্ধুদের কাছে উচ্চারণ করতুম—মলাটের উপর নামটি বেশ বিখ্যাত গোছের হ'লেই আর কথা ছিলো না। বন্ধুরা যদি কেউ বলতেন যে গলজওআর্দি তাঁর ভালো লাগে না, কিংবা হামস্থনের অমুক বইটা বাজে, তাহ'লে আমি মনে এমন কষ্ট পেতুম যেন আমাকেই ওটা ব্যক্তিগত অপমান। বেশ মনে আছে, রীতিমতো কষ্ট হ'লেও অনেক দীর্ঘ উপন্যাস আগাগোড়া পড়েছি—পড়েছি শুধু এই কারণে যে শেষ না-করলে লেখকের মানহানি হয়। কত দীর্ঘ কাল ব'সে বইখানা তিনি লিখতে পারলেন, আর আমি এমন কী ব্যস্ত বড়োমানুষ যে শেষ পর্যন্ত পড়তেও পারবো না! কোনো বই আরম্ভ ক'রে শেষ না-করাটা আমার মতে ছিলো অসৌজন্য,

প্রায় নীতিগর্হিত—কেননা নিজেও রচনাচর্চায় লিপ্ত ছিলুম ব'লে সব লেখকের সঙ্গেই একটা ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন অনুভব করতুম, কোনো সুনামসম্পন্ন লেখকেরই এতটুকু অবহেলা আমাকে দিয়ে সম্ভব হ'তো না। সুদ্ধু এই জ্ঞাতিত্ববোধের তাগিদে এমন অনেক বই শেষ করেছি, যা থেকে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে, শেষ করবার আনন্দটুকু ছাড়া আর-কিছুই পাইনি।

এ-প্রসঙ্গে আরো একটা কথা ভাববার আছে। মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতি ও সুলভতা, এবং পাশ্চাত্ত্য জগতে শিক্ষার সার্বিক বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে বইয়ের সংখ্যা এত বেড়ে যাচ্ছে যে সেই সঙ্গে বই বাছাই করবার কাজটিও যত প্রয়োজনীয় ঠিক ততই দুরূহ হ'য়ে উঠেছে। অফুরন্ত ঐশ্বর্যের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা প্রায় হতবুদ্ধি হ'য়ে পড়ি। জগতের যাবতীয় বিদ্যাই এখন আমাদের অধিগম্য, এবং অতি-লোভী মন যদিও প্রায় সমস্ত বিষয়েরই স্বাদ গ্রহণ করতে উন্মুখ, তবুও মানবজীবনের হ্রস্বতা এবং নিজের বোধশক্তির সংকীর্ণতার কথা ভেবে দুটি একটি বিষয়েই মনকে আবদ্ধ করা ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু যে-কোনো একটি বিষয়েই কি বইয়ের সংখ্যা আজকাল কম! যে-কোনো একটি বিষয়ে সমস্ত বই যদি পড়তে হয়, তাহ'লেও বইয়ের জীবন্ত ক্যাটালগ হ'য়েই দিন কাটাতে হয়; এবং সেটা, অন্তত আমার মতে, খুব লোভনীয় রকমের অস্তিত্ব নয়। কথায়-কথায় অশ্রুতপূর্ব বইয়ের উল্লেখ ক'রে প্রতিপক্ষকে নিরুত্তর ক'রে দেবার প্রলোভন থেকে যাঁরা মুক্ত, তাঁরা নতুন বইয়ের স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে

চলবার প্রয়াসই করেন না; কারণ তাঁরা জানেন যে এ-দৌড়ে, আপ্রাণ চেষ্টা করলেও, অনতিপরেই তাঁরা অনেক পেছিয়ে পড়বেন—যদি-না তাঁদের থাকে পূর্বপুরুষের সঞ্চিত বিত্ত, এবং সেই বিত্তজাত অশেষ অবসর। কন্তু এখানে আমি তাঁদের কথাই বলছি, যাঁদের এ-জগতে 'খেটে খেতে' হয়, এবং পঠনপাঠনের সময় যাঁদের নিতান্তই পরিমিত। তাঁরা যদি কোনো বই ভালো না-লাগলে ছেড়ে দেন, কিংবা যেটুকু ভালো লাগে সেটুকুই বেছে-বেছে পড়েন, তাহ'লে নৈতিক কোনো অপরাধ তাঁদের হয় ব'লে আমি মনে করি না। বুদ্ধি থাকলে একটা বিষয়ের অল্প জেনেও বাকিটা অনুমান করা যায়; তাছাড়া, সকলেরই সব বিষয়ে জানবার দরকার করে না, এ-ও প্রায় স্বতঃসিদ্ধ কথা। আসলে, বই পড়া ব্যাপারটি স্বভাবতই এবং অবিমিশ্রভাবে বাঞ্ছনীয় কিনা, সে-বিষয়েও প্রশ্ন ওঠে, যখন দেখা যায় বই পড়তে-পড়তে কেউ-কেউ পাগল হ'য়ে যান, কেউ বা (এঁরা সংখ্যায় অনেক বেশি) নিজের স্বাভাবিক বুদ্ধি হারিয়ে সব-শেষে-পড়া লেখকের প্রতিধ্বনি হ'য়ে জীবন কাটান; কেউ আবার আঁদ্রে মোরোয়া বর্ণিত বালজাক-ভক্তের মতো কল্পনা-কাহিনীর সম্মোহনে বাস্তব জীবনের একেবারেই অযোগ্য হ'য়ে পড়েন। যত বেশি পড়তে পারবো ততই আমার জিৎ, এ-রকম যাঁরা ভাবেন, অমুক-অমুক বই পড়েছি এ-কথা লোককে বলতে পারার তৃপ্তি ছাড়া অন্য-কোনো তৃপ্তি তাঁরা পান কিনা সন্দেহ। বই যে আমাদের জীবনে এত বড়ো জায়গা জুড়ে আছে,

তার কারণই এই যে তা আমাদের আনন্দ দেয়, এবং সেই সঙ্গে জীবন সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিত করে, প্রতিদিনের জীবনকে সুন্দর করে, ভালো ক'রে বাঁচতে শেখায়। ভালো ক'রে বাঁচাটাই আমাদের উদ্দেশ্য, বই তার অন্যতম উপায় মাত্র। এবং এটাই স্বাভাবিক যে আমরা যে যার সুবিধেমতো উপায়ের ব্যবহার করবো, উপায়কে আমাদের ঘাড়ে চ'ড়ে ব'সে কর্তৃত্ব করতে দেবো না।

১৯৩৯

# কথা ও কথক

এ-ব্যাপারটা আমার ঠিক আসে না। অনেকের আসে। যাঁদের আসে, তাঁদের আমি মনে-মনে ভারি তারিফ করি। ঈর্ষাও করি একটু। তাঁদের তুলনায় নিজের বুদ্ধিকে শ্লথ ও জিহ্বাকে জড় মনে হয়। ছেলেবেলায় বিষম লাজুক ছিলুম, স্বভাব ছিলো কুনো, এ হয়তো তারই ফল। কিংবা জীবনের ভোজে বোধহয় ধাত বুঝেই পাত পড়ে। অনেকে আছেন স্বাভাবিক কথক। হাজার চেষ্টা করলেও আমি তাঁদের দলে ভিড়তে পারবো না, এতদিনে এটা বুঝেছি। তাঁরা চোখে-মুখে কথা বলেন, প্রতিপক্ষের মুখ থেকে কথাটি যেই খসলো, অমনি তাঁদের ঠোঁটের ধনুক থেকে জবাবের তীর শাঁ ক'রে বেরোয়। তাঁরা যখন তুচ্ছ কোনো গল্প বলেন, লোকে মন দিয়ে শোনে, বাধা দেয় না, হাই তোলে না, উশখুশ করে না। বলতে-বলতে গল্পের রং চড়ে, নতুন-নতুন মোড়, মোচড়, খোঁচা উদ্ভাবিত হয়; এবং গল্পটি তাঁরা যখন (ধরুন) এগারো বারের বার বলেন তখন ফলস্টাফের সেনানীর মতোই তার আকারের স্ফীতি দেখে অবাক হ'য়ে যাই। গল্পটিতে ততক্ষণে সত্যের শাঁস সামান্যই থাকে, কিন্তু তাতে কী এসে যায়? হ'লোই বা বানানো গল্প, তাই ব'লে কি এঁরা মিথ্যুক? পাগল! তাহ'লে তো গল্প-লিখিয়েরা সকলেই মিথ্যুক। এঁরা শিল্পী, শাদাশিধে, প্রাঞ্জল, নির্জলা

সত্যের এঁরা কী ধার ধারেন! আমার জীবনেও মাঝে-মাঝে মজার ঘটনা ঘটে, এবং কদাচ (হায়রে দুর্মতি!) এঁদের দেখাদেখি আমিও বন্ধুমহলে গল্প ফাঁদতে বসি। ফল হয় সর্বনেশে। বন্ধুরা যখন গল্পটির শেষে দয়া ক'রে দাঁত বের করেন, তাঁদেরই জন্য কষ্ট হয় আমার। অথচ, বিশ্বাস করুন, ঘটনাটি মজার। তবে? আসলে হয় কী, আমি ঠিক যেটুকু ঘটেছে সেটুকুই বলি, একচুল বানাই না, বাড়াই না, এতে কি আর গল্প হয়! শুধু সত্যই বলবো, সত্য ছাড়া বলবো না, আদালতে সাক্ষী দিতে গেলে এ-নীতি চমৎকার, কিন্তু আড্ডায় অচল। যে-সব জায়গায় জিভে লাগাম টানবার কোনো দরকার নেই, সেখানে শাদা সত্য বড়োই নীরস। কিন্তু আমার যেটুকু-বা বানাবার ক্ষমতা আছে (অল্পই আছে), তা বোধ করি লিখতেই খরচ হ'য়ে যায়; মুখে বলতে গেলে ইচ্ছে করলেও, চেষ্টা করলেও, নির্জলা নীরস সত্য ছাড়া আর-কিছু আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না। জমাট আড্ডায় আমার জায়গা, তাই, পিছনের বেঞ্চিতে; আমার অচিকিৎস্য সত্যবাদিতাই আমাকে পথে বসায়।

শুধু কি তাই! লাগসই একটা জবাবই কি ঠিক সময়ে আমার মনে আসে কোনোদিন! এ নিয়ে গোপনে-গোপনে আমি বড়োই কষ্ট পাই। কেউ, ধরুন, ঠাট্টার ছলে আমাকে একটু খোঁচা দিলেন; বেশ ধারালো খোঁচা, ঠিকমতো বেঁধে। তখন হয়তো ঈষৎ লাল হ'য়ে চুপ ক'রে গেলুম, কিন্তু খোঁচাটা ভুললুম না, মনের মধ্যে জ্বালা করতে লাগলো। বাড়ি ফিরে এসে হঠাৎ মনে হ'লো—আহা, এ-কথাটা

বললে তো হ'তো। এমন চমৎকার জবাব! যেমন ধারালো, তেমনি শাঁসালো। ভদ্রতায় নিখুঁত, অথচ আঘাতে নিষ্ঠুর। মনে-মনে আবার দৃশ্যটি সাজালাম; প্রতিপক্ষকে দিয়ে বলালুম কথাটা—সঙ্গে-সঙ্গে আমার জবাব, একটুও রাগের ভাবে নয়, সহাস্যে, খোশমেজাজে—আর তারপর? আহা, বেচারির মুখটি চুন হ'য়ে গেলো একেবারে। একবার নয়, দু-বার নয়—দশ বার, বারো বার এই দৃশ্যটি আমার মনের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করাই; শেষ পর্যন্ত আমার সেই অতুলনীয় জবাবেরও একটি জবাব বেরোয়, কিন্তু প্রতিপক্ষ কথাটি শেষ করতেও পারেন না, হঠাৎ যেন খাপ থেকে তলোয়ার উঠে এসে সে-কথাটিকে খানখান ক'রে কেটে দেয়। আমার সেই শেষের কথাটির পরে আর-কোনো কথাই চলে না; গায়ে প'ড়ে যিনি আমাকে খোঁচাতে এসেছিলেন তিনি এখন নিজের অবিমৃষ্যকারিতার অনুশোচনায় জ্ব'লে-পুড়ে মরছেন। তখন আমার দয়াই হয় তাঁর প্রতি, আমার কল্পনার কবল থেকে তাঁকে মুক্তি দিই।

আশ্চর্য, জুৎসই জবাব আমার মনে যে না আসে তা নয়, কিন্তু এত দেরি ক'রে আসে কেন? রাত্রে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে অক্ষম আক্রোশে ছটফট করি। গড়পড়তায় মাসে একবার এ-কষ্ট আছেই আমার কপালে। উত্তর-প্রত্যুত্তরগুলো মনে-মনে আওড়াতে-আওড়াতে মুখস্থ হ'য়ে যায়। আচ্ছা, আবার যেদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে—কিন্তু সোমবারে যে-কথা বলা হয়েছে তার জবাব কি শুক্রবারে দেয়া যায়? এক-কাজ করলে হয় না? আলাপের স্রোতটাকে এমনভাবে

যদি চালিয়ে নেয়া যায়, যাতে তিনি ঠিক সেই কথা (কি সেই রকমের কোনো কথা) ব'লে ফেলেন, তাহ'লেই তো পায়রার উপরে বাজপাখির মতো আমার জবাবটি ঠিক ঘাড়ে এসে পড়তে পারে। মৎলবটা মনের নোটবইয়ে টুকে রাখি; কিন্তু পরে যেদিন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়, তিনি নিতান্ত বন্ধুভাবেই সম্ভাষণ করেন; খোঁচাটা তিনি দিয়েই খালাশ, সুতরাং সে-কথা তিনি ভুলেও গেছেন; আমি হতভাগা, যার লেগেছে, আমিই মনে রেখে কষ্ট পাচ্ছি। কথার পিঠে কথা ওঠে, কিন্তু বাঞ্ছিত প্রসঙ্গের সীমানাও মাড়ায় না, গল্পে গুজবে সময় যায় কেটে; আমার সেই আশ্চর্য জবাবটা আমার মনের তিমিরেই হারিয়ে যায়।

এ-লাঞ্ছনা আমার ললাটলিপি, যত দিন বেঁচে আছি, সইতেই হবে। কিন্তু ভালো কথা যাঁরা বলেন, রসিক ব'লে যাঁরা খ্যাত, তাঁরা অন্য এক রকমের লাঞ্ছনায় বন্ধুদের নির্যাতিত করেন, সেটা সহ্য করা শক্ত। আসলে এঁরা সকলেই চমৎকার মানুষ, আড্ডা জমাতে ওস্তাদ, তবু সব সময় এঁদের সঙ্গে দেখা হ'লে মন খুশি হয় না। না, মশাই, ঈর্ষা থেকে এ-কথা বলছি না। এঁদের আমার ভালোই লাগে, বাবুর্চি নই ব'লে যে ভালো রান্না খেতেও জানি না, এত বড়ো দুর্ভাগা আমি নই। আমার আপত্তি এই যে এঁদের রান্নাটা বড়ো একঘেয়ে। (সকলের কথা জানি না; নিশ্চয়ই পৃথিবীতে কোথাও কোনো-একজন রসিক পুরুষ আছেন, যিনি একই গল্প একজনের কাছে দু-বার করেন না—কিন্তু আমি যে-ক'জনকে দেখেছি তার মধ্যে

এর ব্যতিক্রম বড়ো পাইনি।) ব্যাপারটা এই রকম হয়। কারো হয়তো রসিকতার দিকে, কি বেশ মজা ক'রে গল্প বলার দিকে স্বাভাবিক একটা ঝোঁক আছে। সে কথা ব'লে যায়, মাঝে-মাঝে তার কথা শুনে লোকেরা হাসে। কিছুদিন যায়; বন্ধু ও বান্ধবী, আত্মীয় ও আত্মীয়ার মহলে বাহবা পেয়ে-পেয়ে ভদ্রলোকটির ধারণা হ'য়ে যায় তিনি একজন মস্ত রসিক। এখানেই সর্বনাশের শুরু। রসিকতা করা, মজার গল্প বলা—এগুলো তখন তিনি কর্তব্য ব'লে ধ'রে নেন। খ্যাতি তাঁর মাথায় চ'ড়ে বসে; অতি সাধারণ কথাও মোচড় দিয়ে বলতে গিয়ে তিনি একটু ভিন্ন অর্থে লোক হাসান। 'আমার সর্দি হয়েছে', কি 'আজ সকালে বাস্-এ চ'ড়ে শ্যামবাজার গিয়েছিলুম'—এ-ধরনের কথাকেও তিনি পেঁচিয়ে বলতে গিয়ে নিজেই গলদ্‌ঘর্ম হন, আর-কোনো লাভ হয় না। যশের নেশায় একই গল্প একই লোকের কাছে দশ বার বলতে আর বাধে না তাঁর; এর কারণ হয় প্রগল্‌ভতা নয় দম্ভ; হয় তিনি এত ঘন-ঘন পুঁজি উজোড় করেন যে কোন গল্প কাকে বলেছেন তা মনে থাকে না, নয় তিনি মনে করেন তাঁর গল্পগুলো এতই উৎকৃষ্ট যে দশ বারেও পুরোনো হয় না। তাই অনেক সময়ই এমন হয় যে তাঁর চর্বিতচর্বণ কি কষ্টকল্পনা অনিচ্ছায় শুনতে-শুনতে হাসবার ভদ্র চেষ্টায় মুখমণ্ডলের পেশীগুলিকে অনর্থক পীড়িত করতে হয়। তিনি সেটা লক্ষ্য করেন না; বাহবায় তিনি এতই অভ্যস্ত যে নিশ্চিন্ত মনে ধ'রেই নেন যে শ্রোতারা মুগ্ধ হ'য়ে শুনছে; তাঁর আত্মশ্লাঘা এমন চরমে চড়ে যে আপনি কখনো কোনো অছিলায় উঠে

যেতে চাইলে তিনি আপনাকে জোর ক'রেই ধ'রে রাখবেন। 'আরে শুনুন, মশাই, এটা ভারি মজার,' ব'লে কথক চারদিকে তাকিয়ে এমন একটি সর্বগ্রাসী হাসি হাসবেন যে কেউ আর পালাতে পারবে না। গল্পটা কী, আপনি জানেন, কখন গলার স্বর চড়বে আর কখন চোখ কপালে উঠবে, প্রতিটি নাটকীয় খুঁটিনাটি আপনার মুখস্থ, তবু আপনাকে ঠায় ব'সে থাকতে হবে, যতক্ষণ না শেষ হয়। এ-ভাবে কিছুদিন চলবার পর আপনি রসিক পুরুষটির সংসর্গ এড়াবারই চেষ্টা করেন; wit আর bore-এ তখন তফাৎ থাকে না। যিনি ছিলেন রসিক, তিনি হ'য়ে পড়েন ভাঁড়; স্টাইল মুদ্রাদোষে অধঃপতিত হয়; যা ছিলো মেজাজের ফুলবাগান তা হ'য়ে পড়ে কর্তব্যের কাঁটাবন। খ্যাতি বজায় রাখবার কঠোর চেষ্টায় তিনি খ্যাতির কারণটিকেই খুইয়ে বসেন। আমি তো বরং একজন অতীব কাঠখোট্টা ইষ্টকব্যবসায়ীর সঙ্গে পুরো একটা ঘণ্টা কাটাবো, কিন্তু দোহাই আপনার, এই ধরনের কোনো রসিকের সঙ্গ দশ মিনিটও আমাকে ভোগ করতে বলবেন না।

অবশ্য শ্রোতাদেরও দোষ আছে। রসিকতার গলায় এঁরাই অনেক সময় অন্ধ উপাসনার দড়ি লটকিয়ে দেন। আমি এক ভদ্রলোককে জানতুম, যাঁর সত্যিই রসিকতা আসতো; কিন্তু তাঁর উপাসক—কিম্বা উপাসিকা-মণ্ডলীই তাঁকে নষ্ট করলো। চার-পাঁচটি তরুণীর মধ্যে তাঁকে একবার দেখেছিলুম, সে-দৃশ্য কখনো ভুলবো না। ভদ্রলোকটি বললেন, 'উঃ, কী গরম!' অমনি মেয়ের দল হাসতে-হাসতে

লুটিয়ে পড়লো। তিনি আবার বললেন, 'ওদিককার জানলাটা খুলে দাও না।' মেয়েরা পরস্পরের চোখের বেতারে কী-বাণী বিনিময় করলো তারাই জানে, কিন্তু আবার উঠলো হাসির হররা। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে ভদ্রলোকটি এতে একটুও অপ্রস্তুত হলেন না, বরং বেশ খুশিই হলেন। অতিদর্পেই যে স্বর্ণলঙ্কা পুড়েছিলো সে-বিষয়ে কি সন্দেহ আছে!

কথকতা শুধু কথকের উপরেই নির্ভর করে না, শ্রোতার উপরেও করে। শ্রোতারাই এক হিশেবে কথক তৈরি করেন। তাঁদের চাহিদা অনুসারেই কথক মাল জোগান। সব শ্রোতাই যদি বুদ্ধিমান ও সচেতন হ'তো, তাহ'লে কথকদের এ-অধঃপতন হ'তে পারতো না। বোকাদের কাছে অজস্র হাততালি পেয়ে-পেয়েই তাঁদের এতটা বাড় বাড়ে। দুঃখের কথা শুধু এই যে রসিকতা সম্বন্ধে বেশির ভাগ লোকই একটু বোকা—অবশ্য আপনাকে বাদ দিয়ে বলছি।

১৯৩৭
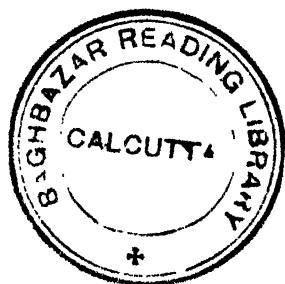
# মতান্তর ও মনান্তর

'Where gentlefolk meet, compliments are exchanged.'
'Servants talk about persons, their masters talk about things.'

আমি তার্কিক নই। আলাপ-আলোচনা আমি পছন্দ করি, গল্প-গুজব ভালোবাসি, অল্প-স্বল্প পরচর্চাও মন্দ লাগে না। যাকে আড্ডা বলে তাতে মশগুল হবার বিশেষ-একটু প্রতিভাই আমার আছে, কিন্তু আড্ডা যখন বিতর্ক-সভায় পরিণত হবার উপক্রম হয়, তখন আমার মন-খারাপ হ'য়ে যায়, মুখে যেন কথা সরে না। কোনো জবরদস্ত তর্কবাগীশের পাল্লায় পড়লে আমার বুদ্ধি উদ্দীপিত হয় না, স্নায়ু উৎপীড়িত হয়, প্রত্যুত্তরের ঝাঁজালো রসে জিভ শানিয়ে নেয়া দূরে থাক, জিহ্বার স্বাভাবিক চলৎশক্তিটুকুও যেন অসাড় হ'য়ে যায়। তর্কের ক্লাশে আমার স্থান একেবারে লাস্ট বেঞ্চিতে।

এর কারণ এ নয় যে আমি বিশ্বাস করি যে বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর। যেমন শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় করেন। শুনেছি, দিলীপকুমার তর্ক ভালোবাসেন না, যারা তর্ক করে তাদের সঙ্গ এড়িয়ে চলেন, কারণ তিনি যা বিশ্বাস করেন তার বিরুদ্ধে কোনো মন্তব্য তিনি শুনতেও নারাজ, বাদানুবাদের ব্যর্থতা সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ।

বিশ্বাস সত্যি যদি দৃঢ় হয় তাহ'লেই তো নির্ভয়ে বিরোধিতার মুখোমুখি দাঁড়ানো যায়, অতএব বিরোধিতা

সম্বন্ধে যিনি অসহিষ্ণু তাঁর বিশ্বাসই আসলে দুর্বল, এ-যুক্তি সহজেই মনে আসে। যুক্তিটি চমক-লাগানো, কিন্তু মনস্তত্ত্বের দিক থেকে ভুল। যাকে অত্যন্ত ভালোবাসি তার নিন্দা যে করে তার মুখ দেখতে ইচ্ছা না-করাটা নিন্দনীয় নয়। মনে-প্রাণে আমি যা বিশ্বাস করি তার যে বিরোধী, সে-ব্যক্তি সম্বন্ধে সহনশীলতা শুধু অমানুষিক নয়, দুর্মানুষিকও হ'তে পারে। সহনশীলতা সর্বত্রই গুণ নয়, উন্মাদনা অর্থাৎ ফ্যানাটিসিজম সর্বত্রই দূষ্য নয়। খানিকটা ফ্যানাটিক না-হ'লে কোনো কাজই এগোয় না, পথের মোড়ে-মোড়ে নানারকমের আপোশ করতে-করতেই দম ফুরিয়ে যায়। ধর্ম যখন জীবন্ত ছিলো, তখন ধর্মের গোঁড়ামি তাকে সংকীর্ণ যেটুকু করেছে, শক্তিমান করেছে তার ঢের বেশি। ধর্ম যখন থেকে মৃত, তখন থেকেই তার সংকীর্ণতা ভয়াবহ রূপ নিলো, কারণ তা হ'য়ে পড়লো শক্তিহীনের দন্তঘর্ষণ। এ-কথা অস্বীকার ক'রে লাভ নেই যে বিশ্বাসেই মানুষ বাঁচে, কিন্তু এও সত্য যে জ্যান্ত বিশ্বাসে যতটা বাঁচে, মৃত বিশ্বাসে ঠিক ততটাই মরে। কিন্তু কোনটা জ্যান্ত আর কোনটা মরা, এই তো আবার এক তর্কের সূচনা!

তর্কবিমুখতার আর-একটা কারণ থাকতে পারে, সেটা নেহাৎ ব্যক্তিগত। সেটা আর-কিছুই নয়, আত্মম্ভরিতা। অনেকে আছেন, কেউ কোনো কথার প্রতিবাদ করলেই চ'টে যান। অন্য সকলে ছোটো-বড়ো সমস্ত বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত হবেই, এটা তাঁরা অত্যধিক অহমিকাবশত ধ'রেই নেন; এ-ধারণায় এতটুকু আঘাত লাগলেও অসহ্য লাগে তাঁদের।

কৃতী ব্যবসায়ী, পণ্ডিত প্রোফেসর, অত্যন্ত আত্মসচেতন শিল্পী—এঁদের মধ্যে মাঝে-মাঝে এ-রকম মানুষ দেখা যায়।

আমিও কি ঐ দলের? আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, তা আমি নই। কোনো দু-জন মানুষ সমস্ত বিষয়ে একমত হ'তে পারে না, এ-কথা তো স্বতঃসিদ্ধ। কিছু-কিছু গরমিল থাকে ব'লেই তো মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলামেশায় আনন্দ। আমার সঙ্গী যদি হুবহু আমার মতোই হয়, তার চেয়ে ক্লান্তিকর আর কী হ'তে পারে? যে-মানুষ সব কথাতেই ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে যায়, তার সঙ্গে কতক্ষণ আলাপ চলে? যেখানে প্রতিটি মন স্বতন্ত্র, খানিক পরে-পরেই নতুন দিক থেকে নতুন আলো পড়ছে, সেখানেই তো কথাবার্তার সুখ। তবে তর্কে ভয় কিসের।

তর্কে আমার ভয়, কারণ সত্যি যা তর্ক তা প্রায়ই কুতর্ক। আর কুতর্কের ব্যর্থতা অব্যর্থ। সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দু-দল বা দু-জন কথা বলছে—একে অন্যকে নিজের দিকে টানবার আশায়—এই টগ-অব-ওঅর নিতান্তই স্নায়ুবিদারক। আর-কিছুই হয় না, তর্কের শেষে (আর তর্কের, সত্যি বলতে, কোনো শেষও নেই, কথায় কথা বাড়ে, গলা চড়ে, মেজাজ গরম হয়, তারপর নেহাৎই এক জায়গায় থামতে হবে ব'লে থামে)—তর্কের শেষে বিশ্রী একটা অবসাদে আচ্ছন্ন হয় মন, মুখে যেন ধুলোবালির স্বাদ লেগে থাকে। কথাবার্তা বলার যে-একটি উজ্জীবনী প্রভাব, যাতে মন সরস হয়, মগজে নানারকম নতুন ভাব খেলা করে, শরীরে ফূর্তি আসে, তা এতে পাওয়া যায় না। তা-যাতে

পাওয়া যায়, তাকে আমি বলবো আলোচনা, তাতেই আমি সুখ পাই। সমস্ত অনৈক্যের অন্তরালে সকলের মধ্যেই যখন গভীর মূলে মিল থাকে, তখনই আলোচনা সম্ভব। একই বিষয়কে বিভিন্ন ব্যক্তি যখন বিভিন্ন দিক থেকে দেখছেন, তখনই কথাবার্তার সুখ, কিন্তু সেই বিষয়টি যে আলোচনার যোগ্য এ-বিষয়ে অন্তত সকলের মিল থাকা চাই। অর্থাৎ মূল্যবোধ সকলেরই মোটামুটি একরকম হওয়া দরকার। সেটা যখন হয়, তখন প্রসঙ্গটা এক মুখ থেকে আর-এক মুখে ধাক্কা খেতে-খেতে সামনের দিকে এগোয়, মনে হয় কোথাও পৌঁছনো যাবে, কখনো-কখনো পৌঁছনোও যায়। এতে মনের রীতিমতো লাভ হয়, সার্থক হয় বাক্যব্যয় ও কালক্ষেপ। এইজন্যই মানুষ সর্বদাই স্বজাতি খোঁজে, স্বধর্মী খোঁজে; সকলের সঙ্গে সকলের বন্ধুতা হয় না, কিংবা ভিন্নমার্গী পরিণতি অনুসারে বন্ধুতায় ভাঙন ধরে। দু-জন মানুষ পরস্পরের গুণাবলী সম্বন্ধে সচেতন হ'য়েও যে সব সময় বন্ধুতায় আবদ্ধ হয় না, তারও বোধহয় এই কারণ। মূলগত ঐক্য যেখানে নেই, যেখানে মূল্যবোধই স্বতন্ত্র, শুধু সেখানেই তর্কের সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ কথাবার্তায় কোনো অগ্রগামী বেগ থাকে না, সব কথা ঘুরে-ঘুরে একই জায়গায় ফিরে এসে এক বিষাক্ত বৃত্তের সৃষ্টি করে। এই তর্ক আমার আতঙ্ক। এর মতো ক্লান্তিকর, এর মতো নিষ্ফল আর-কিছু নেই।

এ-কথা খুব স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলুম কিছুদিন আগে যখন এক ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীকে নিয়ে আমাদের বাড়ি বেড়াতে এসেছিলেন। স্বামীটি স্বভাবরসিক সহৃদয় চমৎকার

মানুষ, স্ত্রীও বুদ্ধিমতী হাসিখুশি বাক্‌নিপুণা। এঁদের সঙ্গে দেখাশোনা কম হয়, কিন্তু দেখা হ'লেই ভালো লাগে। এঁদের আবির্ভাবে তাই মন অত্যন্ত খুশি হ'য়ে উঠেছিলো, কিন্তু এমনি দুর্দৈব যে সেদিন দু-এক কথার পরেই হঠাৎ এমন এক প্রসঙ্গ উঠলো যে-বিষয়ে তাঁদের ও আমাদের সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি। বিশেষ-কোনো ব্যক্তিকে তাঁরা মনে করেন অতিমানুষ, আমরা মনে করি বুজরুকি; বিশেষ-কোনো আদর্শকে তাঁরা যত প্রবলভাবে মহান ব'লে মানেন আমরা ততই তীব্রভাবে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর ব'লে বিশ্বাস করি। এ-প্রসঙ্গ যদি দৈবক্রমে না উঠতো তাহ'লে সন্ধ্যাটি চমৎকার হাস্যালাপে আনন্দে কাটতো, কিন্তু দু-এক মিনিটের মধ্যেই বিশ্রী একটা তর্কের সৃষ্টি হ'লো, তাঁরা যতক্ষণ থাকলেন অন্য-কোনো কথা হ'লো না, যদিও প্রথম থেকেই বোঝা যাচ্ছিলো যে কোনো পক্ষই বিপক্ষের কথা শুনে মত বদলাবে না। তাঁরা যখন বিদায় নিলেন, নিজের উপরেই খুব রাগ হ'লো; কেননা—বলা বাহুল্য—প্রথম দু-চার কথার পরেই হাবভাব বুঝে নিয়ে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করাই হ'তো বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু ততখানি আত্মসংযম খুব কম লোকেরই থাকে। জানি, এতে কোনো লাভ নেই; জানি, কথায়-কথায় অসংখ্য বাজে কথাই শুধু জন্মাবে—তবু নিজের মতটা যথাসম্ভব সাজিয়ে-গুছিয়ে জাহির করার লোভও সামলাতে পারি না—এ-দুর্বলতা থেকে মুক্ত হ'তে পারেন ক-জন?

পক্ষান্তরে, আমার এক দার্শনিক বন্ধু আছেন, তাঁর সঙ্গে

কথাবার্তায় আমি গভীর আনন্দ পাই। তাঁর কথাবার্তা কখনো-কখনো তর্কের রূপ নিলেও আসলে তা তর্ক নয়, অন্তত আমার মতে নয়। প্রথমে তিনি একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন, সকলের মুখে-মুখে তা যতক্ষণ আলোড়িত হ'য়ে ফেরে তিনি বাঁকা চোখে প্রত্যেক বক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে মন দিয়ে শোনেন, তারপর এমন-কিছু বলেন যা সম্পূর্ণ ন্যায়সম্মত, যার উপর, তখনকার মতো, আর-কিছু বলবার থাকে না। একটু অপেক্ষা ক'রে তিনি অন্য-কোনো কথা পাড়েন এবং সেটিও ঐভাবেই শেষ হয়। তাঁর আলাপে শুধু যে শালীনতা এবং চিন্তাশীলতাই আমার মন টানে তা নয়, তার নির্বাহুল্য ও মুগ্ধ করে আমাকে, যখন দেখি এক কথা তিনি দু-বার বলেন না, এবং আপাতত কোনো মীমাংসা হ'লেই সে-প্রসঙ্গ তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করেন। এ-পদ্ধতি আমার পছন্দ এইজন্য যে এতে কথোপকথন বিচিত্র ও গতিশীল হয়, উপস্থিত সকলেই কিছু-না-কিছু বলবার সুযোগ পায়, হাতে যেটুকু সময় আছে তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার শুধু এতেই সম্ভব।

তাহ'লে এখন এই প্রশ্ন বাকি থাকে যে যাদের দৃষ্টিভঙ্গি আমার সম্পূর্ণ বিপরীত তাদের সম্বন্ধে কোন মনোভাব যুক্তিসংগত? তাদের সঙ্গ এড়িয়ে চলাটা এক হিশেবে বুদ্ধিমানের কাজ, কিন্তু এ-ব্যবস্থায় খানিকটা স্বার্থপরতা—কিংবা অত্যাধুনিক চলতি বুলিতে 'পলাতক মনোবৃত্তি'—ধরা পড়ে। এ ছাড়া অবশ্য আর একটিমাত্র উপায় আছে: বিপরীত দলের সম্মুখীন হ'য়ে যুক্তির সাহায্যে তাদের মনে পরিবর্তন আনার চেষ্টা, অর্থাৎ, নিজের বিশ্বাসের পক্ষে

প্রাণান্ত প্রপাগাণ্ডা করা। এ-ব্যবস্থার অসুবিধে এই যে এতে বিপরীত দলও আত্মপ্রতিষ্ঠায় উত্তেজিত হ'য়ে উঠবে; প্রশ্নে, উত্তরে ও প্রত্যুত্তরে, জটিল ও অন্তহীন বিতর্কে দু-পক্ষের প্রপাগাণ্ডাই চরমে এসে ঠেকবে, অথচ কালক্ষয় ও শ্রমক্ষয়ের অনুপাতে কোনো পক্ষেরই লাভ হবে না। তাই মনে হয় যেখানে দৃষ্টিভঙ্গির মূলগত অনৈক্য, সেখানে বিরোধিতাই শুধু সম্ভব, এবং বোধহয় বিরোধিতাই স্বাস্থ্যকর। ব্যক্তিগত জীবনে এ-বিরোধিতার উগ্র প্রকাশের প্রয়োজন নেই, পরস্পরকে এড়িয়ে চললেই ভদ্রতা রক্ষা হয়। কিন্তু এ-বিরোধ যখন সমগ্র সমাজ-জীবনে সংক্রমিত হয়, তখন নানাদিক থেকে তা চাপা দেবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও একদিন তার বিস্ফোরণ দারুণ হ'য়ে জ্ব'লে ওঠে—তখনই যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, বিপ্লব, প্রতিবিপ্লব ও প্রতি-প্রতিবিপ্লবের আবর্তে মন্থিত হ'তে-হ'তে নতুন সমাজ জন্ম নেয়, হয়তো কিছুদিনের জন্য মানুষের সুখ স্বাস্থ্য শান্তি ফিরে আসে। আপনার আমার মতদ্বৈধে কিছুই এসে যায় না, এ-কথাটাই সহজে মনে হয়, কিন্তু আসলে হয়তো ঠিক তা নয়। এমনি সব ছোটো-ছোটো মতভেদ জমা হ'তে-হ'তে একদিন বিরাট আকার ধারণ করে, তার চাপে সমগ্র সমাজ ভেঙে পড়ে। অবশ্য যদি সে-সব মতের পিছনে জীবন্ত বিশ্বাস থাকে, যদি তা শৌখিন বুলি মাত্র না হয়।

এখানে আর একটি কথা মনে পড়লো, এটিও শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের। তিনি তাঁর একটি নতুন বইয়ে আক্ষেপ ক'রে বলেছেন যে মতান্তর সর্বদাই মনান্তরে

পরিণত হয়—আমাদের দেশে। মতান্তর সম্বন্ধে নিজে অত্যন্ত স্পর্শকাতর হ'লে অন্যের উপরেও সেই কাতরতা আরোপ করবার ঝোঁক হয়—কিন্তু সে যা-ই হোক, দিলীপকুমারের এ-কথায় আমি আক্ষেপ করবার মতো কিছু দেখতে পাই না, কিংবা এই ঘটনা এমনও কিছু নয় যা আমাদের দেশেই শুধু দেখা যায়। মতান্তর থেকে মনান্তর হবেই—সব দেশেই হয়—আমাদের দেশেও যে হয় তা শুনে খুশি হলাম, কারণ এতে বোঝা গেলো যে আমাদের মৃতদেহে কিছুটা অন্তত প্রাণসঞ্চার হয়েছে। স্বদেশের বিষয়ে আমার বরং আপত্তি এই যে আমাদের মতামতগুলো অতিশয় হালকা; অর্থাৎ মুখে আমরা যা বলি তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করতে হ'লে প্রায়ই আমরা পেছিয়ে পড়ি। নিজেদের মূল্য খুব সহজেই বিকিয়ে দিই আমরা, অন্যের মূল্য সম্বন্ধেও তাই আমরা অচেতন। একটা দৃষ্টান্ত দিই। মনে করুন আমি লেখক। আমি যা লিখি তা অনেকেরই পছন্দ হয় না, হয়তো কারো-কারো পছন্দ হয়। এখন, পছন্দ যাঁদের হয় না তাঁরা আমার জীবন দুর্বিষহ ক'রে তুলতে যতখানি ও যত রকমের ষড়যন্ত্র করতে পারেন, কার্যত তার অত্যল্প অংশই ক'রে থাকেন; আবার আমার লেখার যাঁরা অনুরক্ত ব'লে পরিচয় দেন তাঁদের কাছেও ফলপ্রসূ সমর্থন কিছুই প্রায় পাওয়া যায় না। উভয় পক্ষই মোটের উপর নিষ্ক্রিয়, মোটের উপর উদাসীন। যারা জ্যান্ত জাত, তাদের বিদ্বেষ যত নিষ্ঠুর অনুরাগও ততই গভীর ও সক্রিয়। আমাদের দেশে শত্রুতাও প্রবল নয়, বন্ধুতাও দুর্বল;

মতামতগুলো আমাদের পোশাকি কাপড়, সভায় প'রে যাই, বাড়ি এসে বাক্সে তুলে রাখি। এরই মধ্যে আমাদের দেশেও যদি আজকাল মতান্তর থেকে মনান্তর ঘটবার উদাহরণ পাওয়া যায়, সে তো আশার কথাই।

মতান্তর অবশ্য নানারকমের আছে। শুঁটকি মাছের গন্ধ আমার অসহ্য, কিন্তু আমার কোনো-কোনো বন্ধুর অতি প্রিয় খাদ্য শুঁটকি। আমার এক বন্ধু, যিনি একজন প্রসিদ্ধ কবিও, এবং যাঁর সাহিত্যবিচারের উপর আমার গভীর শ্রদ্ধা, তিনি তাসখেলায় আসক্ত, অথচ কয়েকজন লোক ব'সে তাস খেলছে এ-দৃশ্য চোখে দেখলেও আমি অসুস্থ বোধ করি। বলা বাহুল্য, এ-সব কারণে বন্ধুতায় চিড় ধরে না। এমনকি, বাংলা ফিল্ম দেখতে ভালোবাসেন এমন লোকের সঙ্গেও আমার সদ্ভাব অসম্ভব মনে হয় না, যদি অন্যান্য ক্ষেত্রে মেলবার মতো প্রশস্ত জায়গা থাকে। খাওয়া-পরা, আমোদ-প্রমোদের রুচিবৈষম্যে মারাত্মক কিছু এসে যায় না, এ আমরা সকলেই জানি। কিন্তু এ ছাড়াও জীবনের এমন ক্ষেত্র আছে যেখানে বৈষম্য প্রায় বিরোধে পরিণত হয়। ধরুন, এমন কেউ যদি থাকেন যিনি মনে করেন রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের সর্বনাশ করেছেন, এটা নিশ্চিত যে তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুতা কখনো হবে না। কেননা রবীন্দ্রনাথকে যিনি অবজ্ঞা করেন, তিনি আমার অস্তিত্বসুদ্ধু অস্বীকার করেন, যেহেতু রবীন্দ্রনাথের ভিত্তির উপরেই আমি দাঁড়িয়ে আছি। এ-ধরনের প্রভেদ এতই দুস্তর যে উভয়পক্ষের প্রচুর সদিচ্ছা সত্ত্বেও পরস্পারের মধ্যে যোগাযোগ অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। মৌল দৃষ্টিভঙ্গির

অনৈক্য থাকলে ব্যক্তিগত বিচ্ছেদও অনিবার্য বললেই চলে। দু-জন মানুষের সম্বন্ধ যদি এমন হয় যেখানে একের সাধনা অন্যের উপহাসের বিষয়, এবং একের অবিশ্বাস অন্যের জীবনসম্বল, সেখানে যে কী ক'রে মিলন সম্ভব আমি তো ভেবে পাই না—যদি না মাতা-পুত্র কিংবা স্বামী-স্ত্রীর মতো গভীর স্বার্থজড়িত কোনো সম্বন্ধ থাকে। এমনকি, দাম্পত্যের মতো অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার ক্ষেত্রেও এ-রকম বৈষম্য গভীর ব্যবধানের সৃষ্টি করে, তাতে সন্দেহ নেই। পঞ্চাশ বছর আগেকার মদ্যপ, গোমাংসাশী বিলেতফেরৎ ব্যারিস্টর স্বামী আর পুরুৎ-পুজো-করা, ছোঁয়াছুঁয়ি-নিয়ে-চিরশঙ্কিত অন্তঃপুরিকা হিন্দু স্ত্রীর ঘরকন্নার ছবিটা একবার মনে-মনে ভাবলেই এ-কথা বোঝা যাবে। এ-ক্ষেত্রে ভাগ্য নেহাৎ ভালো হ'লে স্ত্রী স্বামীকে ও স্বামী স্ত্রীকে জীবন ভ'রে সহ্য ক'রে গেছেন মাত্র, দু-জনের মধ্যে প্রকৃত কোনো মানবিক সম্বন্ধ কখনো স্থাপিত হ'তে পারেনি। কিন্তু নিজের স্বামী কিংবা স্ত্রীর ক্ষেত্রে লোকে যা ভালোমানুষি থেকে, কি সামাজিক বিশৃঙ্খলার ভয়ে, কিংবা নেহাৎই উপায় নেই ব'লে সহ্য করে, বহির্জীবনের মুক্ত প্রাঙ্গণে তা চোখে দেখলেই জ্ব'লে উঠবে। ভদ্রতাজনিত আপোশ অনেক দূর পর্যন্ত চলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চলে না ; যখন এমন মতের দেখা পাওয়া যায়, যার সামনে আমার অস্তিত্বই বিপন্ন, যা-কিছু নিয়ে আমার সত্তা, তা একেবারে উড়িয়ে না-দিয়ে যা টিঁকতেই পারে না, তখন মতান্তর থেকে মনান্তরে উপনীত হ'তেই হয়। তা ছাড়া উপায় নেই।

১৯৪০

# মাত্রাজ্ঞান ও অতিরঞ্জন

'বন্দে মাতরং' বা ঐ ধরনের কোনো 'জাতীয়' সংগীত দিয়ে সভার বা অন্য যে-কোনো অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করা আজকাল বাংলাদেশে প্রায় একটা নিয়ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ইওরোপের অনুকরণে, ঐ গান যখন এবং যতক্ষণ গাওয়া হয়, উপস্থিত সকলেই দাঁড়িয়ে থাকবেন, এ-প্রথা প্রবর্তন করতেও আমাদের দেরি হয়নি। অথচ ইওরোপের সম্পূর্ণ অনুকরণ করতে বোধহয় আমাদের আত্মসম্মানে বাধে, তাই আমরা যন্ত্রসংগীতের বদলে কণ্ঠসংগীতের ব্যবস্থা করি, এবং গানের প্রথম দু-এক কলির বদলে সম্পূর্ণ দীর্ঘ গানটি গাওয়া না-হ'লেও আমাদের তৃপ্তি হয় না—তাও একবার নয়, ফিরে-ফিরে দু-বার! ফলে উপস্থিত সকলকেই পনেরো মিনিট থেকে আধ ঘণ্টা পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, এবং সভার কাজ আরম্ভ হ'তেও অকারণে দেরি হ'য়ে যায়। যদি কেউ বলেন, স্বদেশের জন্য সামান্য একটু দাঁড়িয়ে থাকা এমন আর কষ্ট কী?—আমি বলবো, নিশ্চয়ই, যদি সাধ্যে কুলোয় এর চেয়ে অনেক বড়ো কষ্টই করবো, তবে এটাও ভেবে দেখবো যে সে-কষ্ট সত্যি কি স্বদেশের জন্যই করছি?—কিংবা তাতে মাতৃভূমির সত্যি কোনো হিতসাধন হচ্ছে কিনা। কিন্তু কোনো বিষয়ে ভেবে দেখা বাঙালির চরিত্রে নেই; আমরা ভাবপ্রবণ, বুদ্ধির চেয়ে আমাদের হৃদয় বড়ো, অশ্রুগদ্‌গদ স্বরে উদ্দাম উচ্ছ্বাস-

উদ্‌গীরণে আমরা ওস্তাদ। সেইজন্য ভয়ে-ভয়ে বলতে হয় যে স্বদেশকে সম্মান দেখানোই যদি উদ্দেশ্য, তাহলে আধ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকারও যে-মূল্য, আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকারও তা-ই; উপরন্তু প্রথম প্রস্তাবে অনেক সময় বাঁচে, কাজের সুবিধে হয়, পদদ্বয়ও টনটন করে না। কারণ সত্যিই যে-গান ন্যাশনাল অ্যান্থেমের মর্যাদা পেয়েছে তার মূল্য সংগীত হিশেবে নয় ( অধিকাংশ দেশেরই ন্যাশনাল অ্যান্থেম সংগীত হিশেবে অতি নিচু স্তরের ), কোটি-কোটি লোকের স্বাভাবিক দেশপ্রেম ও অস্বাভাবিক বিদেশ-বিদ্বেষ তার সঙ্গে জড়িত, এইটুকুই তার মহিমা। অর্থাৎ 'জাতীয় সংগীত' কোনো সংগীতই নয়, একটি প্রতীক মাত্র। প্রতীক ইঙ্গিতময় ও সেই কারণে অতীব সংক্ষিপ্ত, সময়ের ওজনে তার দাম বাড়ে না। মন্ত্রের মতো, তার শক্তি প্রকৃত নয়, সংস্কারগত; স্বদেশের শ্রেষ্ঠতায় ও বিদেশের হেয়তায় আমাদের বিশ্বাসের উপরেই তার প্রতিষ্ঠা। এই কারণে, শান্তির সময়ে ন্যাশনাল অ্যান্থেমের যা শক্তি, যুদ্ধের সময়ে তার দশগুণ; স্বাধীন ও শক্তিশালী জাতি তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে ভয় পায় না, কিন্তু দুর্বল, পরাধীন, আত্মবিশ্বাসহীন জাতির পক্ষে তা অত্যন্তই পবিত্র ও পূজনীয়।

তবু এ-কথা সত্য যে এ-সংগীত প্রতীক ছাড়া কিছু নয়, এবং প্রসাদ যেমন কণিকামাত্র গ্রহণ করাই বিধেয়, তেমনি এ-সংগীতের পক্ষেও তিরিশ সেকেণ্ড সময়ই যথেষ্ট। কিন্তু এই অতি সহজ কথাটা এ-পর্যন্ত কোনো সভার উদ্যোগীদেরই মনে হয়েছে ব'লে আমার জানা নেই। গানটি না-গেয়ে সুরটি বাজালেও চলে, আর যদি কণ্ঠসংগীতই আমরা চাই,

রেকর্ড বাজালে তিন মিনিটেই সমস্যার সমাধান হ'য়ে যায়। দাঁড়িয়ে থাকার পক্ষে তিন মিনিট যদি অত্যন্ত বেশি সময় ব'লে মনে হয়, তাহ'লে রেকর্ডটিও আংশিকরূপে বাজানো সম্ভব। আসলে ওটা একটা সংস্কার মাত্র, এবং সংস্কারপালনে ন্যূনতম কালক্ষেপই যুক্তিসংগত। সেটা যথাসম্ভব সংক্ষেপে সেরে সভার আসল কাজ আরম্ভ ক'রে দিলেই হয়, কেননা মানুষের সময় অল্প ও কাজ অনেক।

অবশ্য আমাদের এই মাত্রাজ্ঞানহীনতা শুধু এ-ব্যাপারেই নয়, আমাদের সমস্ত অনুষ্ঠানে ও ব্যবহারেই পরিস্ফুট। যে-কোনো জিনিশ যতদূর সম্ভব দীর্ঘ ক'রে তোলবার দিকেই আমাদের দুর্দমনীয় ঝোঁক। একবার একটি তামিল ফিল্মের বর্ণনা দিতে গিয়ে এক ভদ্রলোক লিখেছিলেন, যে-মুহূর্তে ঘড়িটি বাজতে আরম্ভ করলো সে-মুহূর্তে বুঝলাম যে বারোটার কম বাজবে না। যে-কোনো জিনিশকে যতদূর সম্ভব বেশি পরিমাণে ব্যবহার করাই, সমালোচকের মতে, তামিল ফিল্মের ধর্ম, তা সে ঘড়িই হোক, আর সূর্যাস্তই হোক, আর নায়িকার বিরহব্যথাই হোক। কিন্তু এই কথা আরো কত বেশি সত্য আমাদের বাংলা ফিল্মের ক্ষেত্রে! ঘড়িটা যখন বাজছেই, তখন বারোটার কম বাজবে কেন, এই মনোভাব যে-কোনো বাংলা ছবির যে-কোনো দৃশ্যে পরিস্ফুট। অতিরঞ্জনের এমন অত্যধিক আতিশয্য এ-জগতে আর বোধহয় কোথাও নেই। ইঙ্গিতে বাঙালি ফিল্ম-ওলারা একেবারেই আস্থাহীন। একটুখানি দেখিয়ে বাকিটা দর্শকের কল্পনায় ছেড়ে দিলেই যে সবচেয়ে ভালো হয় সে-জ্ঞান

তাঁদের এখনো যখন হয়নি, তখন শিগগির যে হবে এমনও ভরসা করা যায় না। তাঁদের ধারণা এই যে সবই দেখানো চাই, পাছে আমরা না বুঝি। বাংলা ফিল্মে, তাই, মোটরগাড়ি পাঁচ মিনিট ধ'রে চলে, অভিনেতারা অত্যন্ত স্পষ্ট ক'রে অত্যন্ত চেঁচিয়ে অসহ্য নাটুকে ধরনে অত্যন্ত বেশি কথা বলেন, যে-কোনো সময়ে রেডিওর সুইচ টিপলেই একটি বাংলা গান প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বেজে ওঠে, তিনশো টাকা মাইনের প্রোফেসরের বাড়িতে যে চা-পার্টি হয় তা স্বয়ং ভাইসরয়-এর অনুপযুক্ত ব'লে মনে হয় না—স্যুট, ড্রেসিংগাউন, শাড়ি আর বাড়ি-ঘরের জাঁক-জমকের কথা কিছু না-ই বললাম। লোকে ভুল ক'রেও কখনো-কখনো ভালো কাজ করে, কিন্তু আশ্চর্য এই যে আমাদের ছবিওলারা দৈবক্রমেও মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় দেন না—বাংলা ছবিতে কারখানায় ধর্মঘটের দৃশ্য দেখলে মনে হয় মজুররা টিফিনের সময় একত্র হ'য়ে নির্দোষ আমোদ করছে, আর ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার খবর পেয়ে ব্যস্ত হ'য়ে যারা টাকা তুলতে যাচ্ছে তাদের ভাবখানা এই যেন সেজে-গুজে ধীরে-সুস্থে চলেছে শ্বশুরবাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে।

আর্টে অতিরঞ্জনের স্থান নেই এমন নয়। হাস্যরসের উৎসই অতিরঞ্জন। যে-কোনো লোকের চরিত্রেই কিছু-না-কিছু দুর্বলতা থাকে ; সেটুকু বেছে নিয়ে খুব বড়ো ক'রে আঁকলেই কমিক শিল্পের সৃষ্টি হয়। ফিল্মে হাস্যরস ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারেও অতিরঞ্জন ব্যবহার করা যায় ; যেমন চ্যাপলিনের ছবিতে বুভুক্ষার তীব্রতা বোঝাবার জন্য বন্ধুকে রূপান্তরিত

করা হ'লো অতিকায় একটা কুক্কুটে। এ-অতিরঞ্জন সার্থক, কারণ এর পরিচালক হ'লো মাত্রাজ্ঞান, শিল্পীর মজ্জাগত রসবোধ। আসলে অতিরঞ্জন আর বাড়াবাড়িতেও তফাৎ আছে; বাড়াবাড়ি বাংলা ফিল্মের সর্বস্ব, বিশেষ-কোনো উদ্দেশ্যের তাগিদে অতিরঞ্জনের ব্যবহার সেখানে নেই। মনে হয় এ-সব ছবি যাঁরা তৈরি করেন, তাঁদের ধারণায় পরিমাণই উৎকর্ষের পরিমাপ। দিশি ছবির অসাধারণ দীর্ঘতা সকলেই লক্ষ্য করেছেন; ফেনিয়ে-ফেনিয়ে অকারণে বাড়িয়ে আর যখন কিছুতেই টানা যায় না, তখন নেহাৎই যেন অনিচ্ছায় ছবিটি অগত্যা শেষ হয়। সেই যে এক গল্পবিলাসী রাজা একবার এমন-এক গল্প শুনতে চেয়েছিলেন যা কখনো শেষ হবে না, তাঁর সভায় বাংলা ফিল্মের কোনো কর্তা আহূত হ'লে অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা অনায়াসেই জয় করতে পারতেন। কারণ বাংলা ফিল্মে কিছুই শেষ হ'তে চায় না—না নাচ, না গান, না চা খাওয়া, না মোটরদৌড়—এবং একই ছবির মধ্যে নৃত্য থেকে ধর্মঘট, কলকাতার 'ফ্যাশনেবল' পার্টি থেকে গ্রামের পথে গাজন গান, অবাধ প্রণয়লীলা থেকে 'স্বদেশী' প্রপাগাণ্ডা—মোটের উপর এত রকমারি জিনিশ নির্বিচারে একত্রিত হ'য়ে থাকে যে দেখলে স্তম্ভিত হ'তে হয়। কিছুই বাদ যাবে না, যে যা চায় তা-ই সে পাবে, সেই সঙ্গে পাবে এমন অনেক-কিছু, পরিচালকের মস্তিষ্কে ছাড়া আর কোনোখানেই যার অস্তিত্ব নেই—যাতে কিনা সাড়ে-চার আনা কিংবা ন-আনা খরচ ক'রে আপনি মনে-মনে বলতে পারেন—হ্যাঁ, পয়সা উশুল হ'লো বটে!

শুধু ফিল্মে কেন, বাঙালির ক্রিয়াকলাপের কোনোখানেই মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় নেই—বাড়াবাড়িতেই আমাদের খাঁটি, নির্ভেজাল, বাঙালিত্ব। আমাদের সামাজিক ভোজে অকারণে অসংখ্যের নিমন্ত্রণ; কে এলো কি না এলো কেউ লক্ষ্য করে না, অথচ অনুপস্থিতি নিন্দনীয়, উপরন্তু ভোজ্য বস্তুর এমন অপচয়পূর্ণ আতিশয্য সভ্য কি অসভ্য জগতের আর কোনোখানেই বোধহয় দেখা যায় না। প্রচণ্ড চীৎকার ক'রে একই কথা (এবং অত্যন্ত স্থূল কথা) বার-বার বলবার নামই বক্তৃতা, কতগুলি উচ্ছ্বাসের অনিপুণ প্রকাশই প্রবন্ধ। ঠাণ্ডা মেজাজে, ধীরে-সুস্থে, সাধারণ আলাপের ধরনে যা বলা কিংবা লেখা হয়, বাঙালির তা সহজে প্রিয় হয় না। আজ পর্যন্তও আমাদের অভিনয়ে টেনে-টেনে, অত্যন্ত আজগুবি একটা ন্যাকামির সুরে কথা বলাই নিয়ম; এমনকি বাংলাদেশের রেডিওতেও স্বাভাবিক উচ্চারণ খুব বেশি শোনা যায় না। বাস্তব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করতে পারলে তবে আমরা মনে করি যে পদার্থটা দশ জনের পাতে দেবার যোগ্য হ'লো।

আমরা বাঙালিরা যে কত বড়ো ন্যাকামিনিপুণ তা আমাদের বিজ্ঞাপনগুলো পড়লেও স্পষ্ট বোঝা যায়। বিজ্ঞাপন লেখা রীতিমতো একটা শক্ত কাজ, কারণ সেখানে আবোল-তাবোল যা খুশি বকলেই চলে না, ইঞ্চি মেপে জায়গার দাম দিতে হয়। আর-কোনো কারণে না হোক, সুদ্ধু এই কারণে বিজ্ঞাপনে নিষ্ঠুরভাবে বাড়াবাড়ি বর্জন করতে হয়—যদিও আপাতত মনে হ'তে পারে যে বিজ্ঞাপনের

কাজই বাড়িয়ে বলা। আমি তো দেখছি আমাদের মন থেকে এখনো এ-ধারণা দূর হয়নি যে মস্ত কতগুলো গাল-ভরা বিশেষণ বসাতে পারলেই বিজ্ঞাপনলেখকের কর্তব্য শেষ হ'লো। অমুক সাবান 'জগদ্বিখ্যাত' কিংবা অমুক চুলের তেল 'গুণে গন্ধে অতুলনীয়' এ-কথা ব'লে তার নিচে দু-একটি বিখ্যাত ব্যক্তির প্রশংসাপত্র জুড়ে দিতে পারলেই আমরা মনে করি যথেষ্ট হ'লো। বাঙালি ব্যবসায়ী খুব কমই আছেন যাঁরা ভেবে-চিন্তে বিজ্ঞাপনের 'কপি' তৈরি করেন (কি করান); যে-দেশে কোনো পুস্তক-প্রকাশক 'রণদামামা আবার বাজিল', কিংবা 'সৎসাহিত্যের চূড়ামণিযোগ' এই ধরনের ভাষায় বিজ্ঞাপন দিয়েও, কিংবা দেবার জন্যই, বাজার লুঠ করতে পারেন, সে-দেশের ভবিষ্যৎ কোথায়? বিরাট বিশেষণের, খেতাবের, উপাধির মোহ আমাদের মনে এতই দুর্মর যে তথাকথিত সমালোচনাও সাধারণত এমন ভাষায় লেখা হয় যাতে কোনটা বিজ্ঞাপন আর কোনটা সমালোচনা তা চট ক'রে ঠাহর করা যায় না। বিজ্ঞাপনদাতাদের ভাষায় রবীন্দ্রনাথের নামের আগে 'বিশ্বকবি' কথাটি সর্বদাই দেখা যায়, যেন ঐ বিশেষণটি জুড়লে রবীন্দ্রনাথের মহিমা কিছু বৃদ্ধি পাবে! তাছাড়া সাহিত্যসম্রাট! এ-উপদ্রব তো লেগেই আছে। কেউ সমগ্র সাহিত্যের, কেউ বা শুধু কথাসাহিত্যের— চিরপ্রসিদ্ধ রিপাব্লিক অব লেটর্সের উচ্ছেদ ক'রে বুড়ো রাজা, মেজো রাজা এবং বাচ্চা রাজাকে গদিতে বসাবার কী দুরন্ত আগ্রহ আমাদের! আরো শুনতে পাই, শেক্সপিয়র থেকে

শুরু ক'রে মোপাসাঁ পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের দিক্‌পালগণ প্রায় সকলেই বঙ্গদেশে পুনর্জন্ম লাভ করেছেন—একজন লেখককে বাংলার ডিকেন্স কি বাংলার শেলি বলতে পারলে তবে আমরা মনে করি যে হ্যাঁ, লোকটার জন্যে কিছু করা হ'লো! শেষটায় যখন দেখলুম যে প্রকৃতই প্রতিভাবান লেখক শৈলজানন্দর নামের আগে 'অপরাজেয়' বিশেষণটি অবাধে চ'লে যাচ্ছে, তখন শুধু মনে হ'লো যে এ-দেশে লেখক হ'য়ে জন্মালে যে-সব অত্যাচার সহ্য করতে হয় তার মধ্যে দারিদ্র্যটাই সবচেয়ে দুঃখের নয়।

আমাদের দেশে সমালোচনা ব'লে যে-এক ধরনের লেখা সাধারণত প্রচলিত, তাতে অবশ্য মাত্রাজ্ঞান আশা করাই অন্যায়, কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য, হয় বিজ্ঞাপন নয় নিছক নিন্দা। বিজ্ঞাপন হিশেবে প্রায়ই সেগুলো ব্যর্থ হয়—কে না জানে বিজ্ঞাপনের আরো অনেক সংযত ও চতুর হওয়া দরকার; তবে বিদ্বেষপ্রসূত হ'লে তা কিছু ক্ষতি করতে পারে; কেননা নিন্দার চাইতে সহজ এবং সহজেই বিশ্বাসযোগ্য আর-কিছুই নয়। আমরা সকলেই পরনিন্দা শুনতে উৎসুক ব'লে নিন্দুকের কথা কখনো যাচাই ক'রে দেখি না, সে যা বলে তা-ই বিশ্বাস করি—যেহেতু বিশ্বাস করতে আমাদের ভালো লাগে। অমুক লোকটা খারাপ, এই জ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে নিজের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে এমন একটি প্রীতিকর ধারণা জন্মায় যে তখনকার মতো ভারি আরাম লাগে। এ-আরাম শুধু পাঠক নয়, 'সমালোচক' নিজেও পান; এমন একজন লেখক, যাঁর

বেশ একটু নাম-ডাক আছে, তাঁর নতুন বই সম্বন্ধে আমি যদি বলতে পারি—হ্যাঁ, বইখানা নেহাৎ মন্দ হয়নি, মোটের উপর সন্দীপবাবু লেখেন ভালো, তাহ'লে কী মজা হয় ভাবুন তো ; সঙ্গে-সঙ্গেই এ-কথা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে আমি নেহাৎই লিখি না ব'লে—নয় তো সন্দীপ চাটুয্যের কখনো কেউ নাম শুনতো ! অন্যপক্ষে, বন্ধুর ( বা পরোক্ষভাবে নিজের ) বইয়ের প্রশস্তি করবার যখন ডাক আসে, তখন বিশেষণ কুড়োতে অভিধান ফুরোয়, উৎসাহের ঝোঁকে এত বেশি ব'লে ফেলি যে অতি সরলচিত্ত পাঠকও প'ড়ে অবিশ্বাস করে, কারণ নিন্দা গলাধঃকরণের ক্ষমতা পাঠকদের অসীম হ'লেও প্রশংসা সম্বন্ধে তাদের ক্ষুধাবোধ অত তীব্র নয়। মনে-মনে সবাই আমরা পুতুল-পূজারি ; বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ( হালে শরৎচন্দ্র ) প্রভৃতি যে-ক'টি পুতুল আমাদের সামনে সাজানো আছে, তাদের পায়ে প্রাণপণে ফুল দেবো, ঘি ঢালবো, তাদের কাছাকাছি আর-কেউ আসবার স্পর্ধা প্রকাশ করেছে শুনলে তেড়ে মারতে উঠবো সেই লোকটাকে। সেইজন্য নতুন কারো প্রশংসায় আমাদের রুচি নেই। কিন্তু একবার যদি কেউ আমাদের নিষেধ লঙ্ঘন ক'রে মন্দিরপ্রাঙ্গণে ঢুকে পড়তে পারেন, তাহ'লে তাঁকেও আমরা একটি পুতুল বানিয়ে নমো-নমো করবো—তখন দেখবো কার এমন বুকের পাটা যে তাঁর বিরুদ্ধে একটি কথা উচ্চারণ করে !

বাংলা ভাষায় প্রায় প্রত্যেক বছরই এমন একখানা বই বেরোয় যা নিয়ে কোনো বা কয়েকটি পত্রিকা কিছুদিন খুব হৈ-চৈ ক'রে এটাই প্রমাণ করতে চান যে এমন বই বাংলায়

আর দেখা যায়নি। তার কারণ অবশ্য সম্পূর্ণই ব্যক্তিগত; লেখক হয়তো নিজেই কোনো সম্পাদক, বা নামজাদা অধ্যাপক, বা রাজনৈতিক কর্মী, আত্মপ্রভাবেই দিকে-দিকে বিজয়কেতন ওড়ে। বাঙালি-সম্পাদিত পত্রিকাতে যেমন প্রতিদিন প্রতি পৃষ্ঠাতেই প্রকাণ্ড বড়ো-বড়ো হেডলাইন, তেমনি একখানা বইয়ের চার-পাঁচ কলম কি পুরো পৃষ্ঠাব্যাপী স্তাবকতা ছাপাতেও তার কার্পণ্য নেই। অবশ্য কিছুদিন পরেই বইখানা যখন বিস্মৃতিপাতালে তলিয়ে যায় তখনও আমরা কেউ অবাক হই না, কারণ আমরা জানি যে বাংলাদেশের এই প্রথা। মাত্রাজ্ঞান যদি সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে না পারলেন তবে আর আপনি বাঙালি কিসের!

১৯৩৯
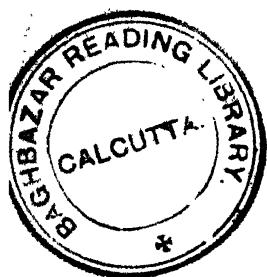
# এ-যুগের কবিতা

কীটস যে একবার বলেছিলেন, পৃথিবীতে কবিতার শেষ নেই, তাঁর এ-মন্তব্যের ভিত্তি ছিলো শীতের কূজনহীন কাননে ছুটি পোকার গুঞ্জন। কিন্তু কথাটির প্রয়োগ আরো বেশি ব্যাপক ব'লে মনে হয়। ১৮২১-এ মারা না-গিয়ে কীটসই যদি কায়াকল্প বা অন্য-কোনো জাদুবলে ১৯২১ পর্যন্ত বেঁচে থাকতেন, তাহ'লে পৃথিবীতে অজস্র নতুন কাব্যময় বস্তু আবিষ্কার ক'রে তিনি চমৎকৃত হ'তেন। উনিশ শতকের প্রথম দিকেও এ-পৃথিবী ছিলো কবির চিরকালের লীলাভূমি—অর্থাৎ সেখানে ফুল ফুটতো, পাখি ডাকতো, চাঁদ উঠতো আকাশে। কিন্তু এ-যুগে, ভারতবর্ষের মতো অনগ্রসর দেশেও, প্রকৃতির যে-ঐশ্বর্য বিনামূল্যে বিতরিত তা থেকে আমরা প্রায় সকলেই বঞ্চিত। আমরা যারা কলকাতায় থাকি, আমাদের পক্ষে চাঁদের অস্তিত্ব নেই, ফুল আছে নিউ মার্কেটের স্টলে, চড়া দামে বিকোয়, আর পাখির গান যে রূপকথা নয়, সে-বিষয়ে সচেতন হবার কারণ আমাদের জীবনে বড়ো ঘটে না। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির অফুরন্ত লীলার মধ্যে বাসা নিলেন শান্তিনিকেতনে, সেখানে গড়লেন আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার সঙ্গে চিরন্তনী প্রকৃতির অপূর্ব সমন্বয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো সর্বাঙ্গীণ সৌভাগ্য সকলের হয় না ; জ্যোছনা কি অন্ধকার

দেখতে, পাখির গান কি পোকার ডাক শুনতে আমাদের যেতে হয় রেলগাড়ি চেপে দু-শো, তিনশো, পাঁচশো মাইল দূরে, যদি অবশ্য মাশুল জোটে।

কিন্তু তাই ব'লে কি আমাদের জীবনে কবিতার সব উৎসই রুদ্ধ হ'য়ে গেছে? না, কীটস ঠিকই বলেছেন, পৃথিবীতে কবিতা মৃত্যুহীন। বিভিন্ন ঋতুর উপঢৌকন যদি আমরা অংশত হারিয়ে থাকি, যন্ত্র এনে দিয়েছে বিবিধ নতুন উপহার। কবিতাকে ধ্বংস করা দূরে থাক, যন্ত্র নিজেই কবিতার সেবায় লেগে গেছে। আমি বলতে চাই যে কোনো-কোনো যন্ত্র আমাদের মনকে ঠিক সেই অবস্থাতেই নিয়ে যায়, পাখির গানে কি পোকার গুঞ্জনে কীটস-এর মনের যে-অবস্থা হ'তো। কীটস-এর মন্তব্যটি যখন ধ্বনি-সংক্রান্ত, তখন আমাদের যে-সব অভিজ্ঞতার প্রবেশ-পথ কর্ণেন্দ্রিয়, তাদের কথাই প্রথমে ধরা যাক। আধুনিক যুগে যে-সব কবিত্বময় শব্দ আমরা উপভোগ করছি, প্রাক্-বৈজ্ঞানিক যুগে তাদের অস্তিত্ব ছিলো না। অবশ্য কিছু ক্ষতিও আমাদের হয়েছে—যেমন ঘোড়ার পায়ের কি ঢেঁকির ওঠা-পড়ার শব্দ আজকাল আর সাধারণত আমাদের শোনবার উপায় নেই; কিন্তু এ-বিষয়ে ব্যালান্স-শীট তৈরি করলে হয়তো দেখা যাবে লোকশানের চেয়ে লাভের অঙ্কই কিছু মোটা।

নিচে আমি শব্দের যে-তালিকাটি পেশ করছি, প্রত্যেক পাঠকই তা নিজের রুচি ও অভিজ্ঞতা অনুসারে বাড়িয়ে নিতে পারবেন। তবে আমার বিশ্বাস আমার উল্লিখিত

আওয়াজগুলোর কবিত্বাবাহী গুণ সম্বন্ধে কোনো মতদ্বৈধ হবে না।

২

অনেক রাত্রে, এই অশান্ত শহরও যখন নিঃশব্দ হ'য়ে আসে, তখন ডায়মণ্ড হার্বরের লাইন দিয়ে দু-একটি রেলগাড়ি যাওয়া-আসা করে। বিছানায় শুয়ে, ঘুমের আগে আমি একটি মন্থর, একটানা, চাপা শব্দ শুনি। সুখের বিষয়, আমার বাসা রেললাইনের একেবারে ধারে নয়, তাই শব্দের কর্কশতা আমার শ্রুতিগম্য হয় না; কানে যা আসে তা যেন বিরল কোনো বিলাসিতা, এতই সস্নেহ ও কোমল যে স্পর্শনীয় হ'লে একে মখমলের সঙ্গে তুলনা করতুম। বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতার দিক থেকে, বেশি রাত্রে দূরের রেলগাড়ির শব্দ ঝিঁ-ঝি পোকার ডাকের চাইতে কম মূল্যবান নয়। এ-শব্দ শুনতে-শুনতে মনের অনেক রুদ্ধ ঘরের দরজা খুলে যায়, কল্পনা জেগে ওঠে; এবং এক্ষুনি, এই একটু পরেই, এর ক্ষীণতম রেশটুকু পর্যন্ত দূরের হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে, এ-কথা জানি ব'লেই ক্ষণিকের উপভোগ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়।

রেলগাড়ির দুটো ভাষা আছে। এই একটা, যা আমি শুনি মাঝরাতে বিছানায় শুয়ে, আর-একটা শোনে যাত্রীরা রেলগাড়ি যখন ঘণ্টায় পঞ্চাশ কি ষাট মাইল বেগে তেপান্তর পার হ'য়ে চলেছে। তখনো রেলগাড়ি কর্কশ নয়; তার ঘুরন্ত চাকার শব্দে নির্ভুল একটি ছন্দ জেগে ওঠে। বর্ধমান থেকে আসানসোল যেতে-যেতে সে-ছন্দ আপনার কান থেকে

মগজে, মগজ থেকে রক্তে সঞ্চারিত হয়; অর্থাৎ, আপনার নেশা ধ'রে যায়। তখন—আপনি যদি কবি হন—এ-কথা আপনার নিশ্চয়ই মনে হবে, আহা, এই ছন্দ যদি মানুষের ভাষায় চালান করা যেতো! আপনি যদি বাজে কবি হন, তাহ'লে বাড়ি পৌঁছিয়ে হয়তো একটি পদ্য লিখেও ফেলবেন, তার দু-চার লাইন আমিই না-হয় আপনাকে শোনাচ্ছি—

খটাখট খটাখট,
ঐ গেলো চুঁচড়ো,
রিশড়া, শ্যাওড়াপুলি
ওরা সব খুচরো—
পাইকেড়ি কারবারি—
হুশ হুশ গুম গুম,
কাল রাতে দিল্লিতে—
একটুও নেই ঘুম।

কিন্তু আপনি যদি ভালো কবি হন, তাহ'লে আপনি জানবেন যে গানের মধ্যে যেমন কুহু-কুহু ব'লে চেঁচিয়ে উঠলেই কোকিলের গান শোনানো হয় না, কবিতাতেও তেমনি খটাখট হুশহুশ বললেই রেলগাড়ির ছন্দকে ধরা যায় না। আক্ষরিক অনুকরণে বস্তুর স্বরূপ ফোটে না। স্বরানুকৃতির ঠকমকিতে শিশুর কান ভোলে, বয়স্ক মন তৃপ্ত হয় না। না, রেলগাড়ির ছন্দ কবিতায় চালান করা সহজ নয়। এ-কাজ সচেতন মনের নয়, অচেতনের। যন্ত্র সদ্যোজাত; যে-অচেতন আমাদের কবিতার উৎস, সেখানে তার প্রভাব এখনো পড়েনি, আরো কত কালে পড়বে সে-বিষয়ে দার্শনিক

বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা করতে থাকুন, আমি ততক্ষণে আরো দু-একটা কবিত্ববহ আধুনিক শব্দের সন্ধান করি।

৩

এবার পুজোর ছুটিতে যেখানে গিয়েছিলুম, সেই শহরের ইলেকট্রিক পাওঅর-হাউসের ঠিক পাশেই ছিলো আমাদের বাসা। প্রথমটায় খারাপ লেগেছিলো, কিন্তু দু-দিন যেতেই বুঝলুম, ডাইন্যামোর শব্দটা বিশুদ্ধ উৎপাত নয়। দিনের বেলায় অবশ্য লক্ষ্য করতুম না, কিন্তু অবাক হলুম, যখন রাত্রে ঘুমের আগে সেই ক্লান্তিহীন, একঘেয়ে শব্দ আমার আগতপ্রায় স্বপ্নরাশির সঙ্গী হ'য়ে উঠলো। আমার যদি কীটসের প্রতিভা থাকতো, তাহ'লে হয়তো এ-বিষয়ে একটি সনেট রচনা করতুম। রাত্রির হৃদয়ের মধ্যে অন্য-একটি হৃৎপিণ্ড অবিরাম ধ্বনিত হচ্ছে। সেই শব্দ শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়া ভারি মধুর। দূরের রেলগাড়ির শব্দ এখনই মিলিয়ে যাবে এই চেতনা যেমন আমাদের ক্ষণিক উপভোগকে ধারালো করে, তেমনি ডাইন্যামোর শব্দ কখনো থামবে না জানি ব'লেই সমস্ত শরীর-মন গভীর আরামে যেন গ'লে যায়। যে-শব্দের পুনরুক্তি আছে, অথচ সেই পুনরুক্তি অনিয়মিত, তা আমাদের স্নায়ুর বিকার ঘটায়; যেমন কিনা, রাস্তায় যদি এক দল লোক হল্লা করতে থাকে, তাহ'লে ঠিক কোন সময়ে আবার অট্টহাসি শোনা যাবে, সেই চিন্তাই আমাদের ঘুম কেড়ে নেয়। সে-ক্ষেত্রে মানসিক উৎকণ্ঠা শারীরিক অস্বস্তিকে ছাপিয়ে ওঠে। যন্ত্র অনেক সময় অসহ্যরকমের

কর্কশতার সৃষ্টি করে তা যেমন সত্য, তেমনি এ-ও সত্য যে প্রায় সব যন্ত্রেরই সাধারণ গতি একটি সুস্পষ্ট ছন্দে বাঁধা, অপরিচয়ের প্রথম ধাক্কা কেটে গেলেই সে-ছন্দ আমাদের মনের ঘুমোনো কল্পনাকে জাগিয়ে তোলে। এ-বিষয়ে ফর্স্ট প্রাইজ নিঃসংশয়ে প্রাপ্য স্টিমারের শিঙার, যদি যথেষ্ট দূর থেকে শোনা যায়। রেলের ভেঁপু বড়ো চপল, কারখানার বাঁশির আওয়াজে হুকুমের ভাবটা ভোলা যায় না, কিন্তু স্টিমারের শিঙা এমনি গম্ভীর, উদার ও রহস্যময় যে মুহূর্তে সে আমাদের মনকে ঘরছাড়া করে। মনে হয় লেপের তলা থেকে উঠে এখনই বেরিয়ে পড়ি—স্বতঃপ্রভ সমুদ্র পেরিয়ে কোনো এলাচগন্ধী দ্বীপপুঞ্জের দিকে; মুহূর্তে মগজের মধ্যে পৃথিবীর নীল মানচিত্র বোঁ ক'রে ঘুরে ওঠে।

সত্যি, পৃথিবীতে কবিতার শেষ নেই।

## ৪

এই তো গেলো শুধু শব্দের কথা। এ ছাড়া দৃশ্যবস্তুর কথা যদি বলেন, তাহ'লেও দেখা যাবে, গত দু-শো বছরের মধ্যে আমাদের কাব্যচেতনায় অনেক নতুন ও অদ্ভুত জিনিশের আমদানি হয়েছে। প্রকৃতির মুখের উপর মানুষের কারিগরি আজ এমনি ব্যাপক যে তা থেকে মুখ ফেরানো প্রায় অসম্ভব। এর ফল, নিছক সৌন্দর্যের দিক থেকে, কেবলই খারাপ হয়নি। গঙ্গার দু-দিকে যখন কেবলই ধোঁয়া-উগরোনো চিমনির সারি দেখা যায়, তখন অবশ্য এই সভ্যতাকে হৃদয়হীন ব'লে ধিক্কার না-দিয়ে পারি না, কিন্তু

কলকাতার গঙ্গার ঘাট, যেখানে দেশ-বিদেশের জাহাজ এসে থামে, তার একটি সৌন্দর্য নিশ্চয়ই আছে, কবির চোখ যার আছে সে-ই তা দেখতে পায়। 'ছিন্নপত্রে' বর্ণিত নদী থেকে তার জাতই আলাদা, কিন্তু সে-ও সুন্দর। যন্ত্রের স্পর্শে কুশ্রীতাই শুধু জন্মে না, নতুন ধরনের সৌন্দর্যও দেখা দেয়। আর কুশ্রীতা যেটুকু, তার জন্যেও দায়ী বিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ। কারখানা-অঞ্চলে সবচেয়ে নয়নপীড়ন জিনিশ মজুরদের বস্তি, এবং এ-কুশ্রীতা উৎপাটনের শক্তি বিজ্ঞানই দিতে পারে। তবু, এমন দু-একটা জিনিশের কথা মনে পড়ে যা কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না—যেমন চিমনি। ঐ বস্তুটার মতো প্রাকৃত শ্রীর এত বড়ো শত্রু আর বোধহয় উদ্ভাবিত হয়নি। ফাঁকা মাঠের মধ্যে আকাশের দিকে উদ্ধত ওর চেহারাটা চোখে পড়লেই মনে হয় বহুদিন ধ'রে বহুযত্নে রচিত একটি সৌন্দর্যের প্রাসাদ একেবারে হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়লো। অথচ চিমনি বাদ দেয়া যায় না, অন্তত কয়লার ব্যবহার যতদিন প্রচলিত আছে। একমাত্র আশা কয়লার বদলে বিদ্যুৎশক্তির সর্বব্যাপী প্রয়োগ।

চিমনিটা অসহ্য, ঠিকই ; কিন্তু রাত্রে কলকাতার গঙ্গার ঘাটে ব'সে কে না স্বীকার করবে যে যন্ত্র এ-জগতে নতুন ধরনের একটি সৌন্দর্য এনেছে? তারা-ভরা রাত্রি দেখে হপকিন্স-এর যে-উচ্ছ্বাস, আলোর বিচিত্র উল্কি-পরানো কালো জল দেখে সে-উচ্ছ্বাসই আধুনিক কবির পক্ষে অসংগত হবে না। আর কী গম্ভীর, বলশালী একটি শ্রী নিয়ে, জাহাজগুলি দাঁড়িয়ে! শক্তির বিশ্রামও কত সুন্দর,

নোঙর-বাঁধা জাহাজগুলি দেখেই তা বোঝা যায়। তারপর ধরুন, একখানা বেশ বড়ো আকারের জবরদস্ত রেলের এঞ্জিন দেখে কি রীতিমতো রোমাঞ্চ হয় না? এমন পরিচ্ছন্ন, বাহুল্যবর্জিত কঠোর পুরুষালি সৌন্দর্য আর কোথায় আপনি পাবেন? ও যে মানুষের এত বড়ো কাজে লাগে, সেইটেই যেন ওর রূপ। কার্যকারিতা আর সৌন্দর্যের বিরোধ আসলে একটা কুসংস্কার। পুরাকাল থেকে মানুষ চেষ্টা করেছে কাজের জিনিশকে সুন্দর করতে—মোহেঞ্জোদারোর ঘটি-বাটিতেও তার প্রমাণ জাজ্বল্যমান—কিন্তু তার সঙ্গে আধুনিক রেল-এঞ্জিনের অনেকখানি তফাৎ। রঙিন ছবি-আঁকা বাসন আর নেহাৎ শাদাশিধে বাসনের মূল্য কার্যকারিতার দিক থেকে একই; ছবিটা সেখানে বাহুল্য, বিলাসিতা, মানুষের সৌন্দর্যবোধের অবাধ্য ফুল। কিন্তু এঞ্জিনের কারিগর জিনিশটাকে সুন্দর করার জন্য কিছু করেনি, সবই করেছে উচ্চতম কার্যকারিতার দিকে লক্ষ্য রেখে; কিন্তু আশ্চর্য এই যে চরমরূপে কার্যকারী হ'তে গিয়েই সেটি হ'য়ে পড়েছে সুন্দর। এমন ঘটনা যন্ত্রযুগের আগে সম্ভব ছিলো না। এ-রকম অনেক যন্ত্রই আজকাল আমরা প্রতিদিনের জীবনে দেখছি ও ব্যবহার করছি। যেখানে বিবিধ যন্ত্র পারস্পরিক নিখুঁত সহযোগিতায় অভ্রান্ত কাজ ক'রে যাচ্ছে, সেখানকার দৃশ্যে শরীর রোমাঞ্চিত ও মন অভিভূত যার না হয়, সমুদ্র কি তুষারশ্রেণীও তাকে হয়তো নাড়া দেবে না। বিরাট একটি কারখানার মধ্যে ঢুকলে মনে কি হয় না যে মহিমার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালাম? কিন্তু সে-মহিমাকে ছন্দে বন্দনা করবে

যে-কবি, সে-কবি আমি নই, হয়তো তার জন্মও এখনো হয়নি।

এ-কথা বলছি এইজন্য যে যন্ত্র যদিও পৃথিবীর চেহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে আশ্চর্যরকম বদলে দিয়েছে ও দিচ্ছে, তবু কবিতাকে সে এখনো বিশেষ বদলাতে পারেনি। তার প্রমাণ এই যে উপরি-উক্ত বিষয়গুলো নিয়ে মহৎ কবিতা এখন পর্যন্ত কেউ লেখেনি। কবিতার সঙ্গে এখনো বিশ্বপ্রকৃতির সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ, মনে হয় বিশ্বপ্রকৃতি কবিতার চিরন্তন উপজীব্য। প্রকৃতির প্রতি কবিদের অসক্তির একটা গূঢ় কারণ হয়তো মানুষের আদিম কৃষিনির্ভরতা। মানুষ হিশেবে আমাদের জীবনে যে-সব জিনিশের প্রাধান্য বেশি, কবিতায় সেগুলোই বেশি ক'রে স্থান পাবে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। কৃষিযুগে প্রকৃতি ছিলো আমাদের সর্বস্ব; ঋতুরঙ্গ, রোদ-বৃষ্টি, মেঘ-বিদ্যুৎ সবই ছিলো গভীর অর্থময়, আদিযুগ থেকে কবির বন্দনা-গান এদেরই লক্ষ্য করেছে। আজ আমরা প্রকৃতিকে জয় করেছি, আমাদের অন্নজল ঋতুর খামখেয়ালের উপর আর নির্ভর করে না, কিন্তু আমাদের কবিতা কৃষিযুগের ঐতিহাসিক স্মৃতি এখনো বহন করছে। কেননা সমাজে পরিবর্তন যত দ্রুত হয়, কাব্যে তা হওয়া অসম্ভব; সামাজিক জীবনে বিপ্লব ঘটে, কিন্তু শিল্পকলা চলে বিবর্তনের মন্থর পথ ধ'রেই।

আধুনিক কবিতা, তাই, যথেষ্টরকম আধুনিক নয়। ঐতিহাসিক বিচারে তা অনেকখানি পেছিয়ে আছে, তা-ই থাকবে চিরকাল। যন্ত্রযুগে ব'সে কৃষিযুগের বেসাতি নিয়েই

তার কারবার। বলতে হয়, যন্ত্রে এখনো আমরা সত্যি-সত্যি অভ্যস্ত হইনি। উনিশ শতকের কবিরা তো তারস্বরে প্রতিবাদই করেছেন, এ-যুগে আমরা অগত্যা মেনে নিয়েছি, কিন্তু ভালোবাসতে এখনো শিখিনি। আরো দু-চার শতাব্দী কাটলে হয়তো আমরা সেই আবেগময় মনোভাব নিয়ে যন্ত্রকে দেখতে পারবো, যে-মনোভাব নিয়ে আজ আকাশ কি পাহাড় কি আষাঢ়ের কালো মেঘ দেখি। কবিতার রক্তমাংস এ দিয়ে গঠিত হবে তখনই, তার আগে নয়। আপাতত যেটুকু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, তা নিতান্তই বহিরঙ্গের। কোনো কবিতায় রেলগাড়ি কি টেলিফোনের উল্লেখ পেলে রাগ করবারও কিছু নেই, বাহবা দেবারও কিছু নেই। পুরোনো কবিতায় যেমন ঘোড়া, নৌকো কিংবা ধনুকের অজস্র উল্লেখ পাওয়া যায়, এ-যুগের কবিতাতেও তেমনি টর্পেডো কি ট্যাঙ্ক কি এরোপ্লেন এসে ঢুকবেই। ধনুকের সঙ্গে একদিন ভুরুর উপমা হ'তো, তেমনি আজ যদি ট্যাক্সির মিটরের শব্দের সঙ্গে প্রেমিকের হৃৎস্পন্দনের তুলনা হয়, তাহ'লে একে নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনা ব'লেই ধরতে হবে। জীবনের নিত্যপরিচিত জিনিশগুলো চিরকালই কাব্যের উপাদান; তাই একদিকে প্রাচীনপন্থীদের গতানুগতিকতা, যার কাছে প্রিয়ার মুখের সঙ্গে চাঁদ ভিন্ন অন্য উপমা অসহ্য লাগে, এ যেমন অশ্রদ্ধেয়, তেমনি নবীনত্বের দম্ভ, যার বিচারে স্কাইস্ক্রেপার নিয়ে কবিতা লেখাটা একটা বিরাট বাহাদুরি, সেটাও হাস্যকর। আসলে, কবিতায় বিষয়বস্তু উপলক্ষ্য মাত্র; সেটাকে

অবলম্বন ক'রে কবি একটি বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছন, যার সঙ্গে বিষয়ের সম্বন্ধ অনেক সময় সুদূর। সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারলেই কবিতাকে আমরা 'ভালো' বলি, আর লক্ষ্যভ্রষ্ট কি লক্ষ্যহীন হ'লেই কবিতা হয় অন্ত্যজ, তার বিষয় 'চিরন্তন'ই হোক আর 'আধুনিক'ই হোক। বিজ্ঞান এখনো আমাদের গা-সহা হয়নি ব'লেই কোনো কবিতায় রিফ্লেক্স কি ডাইন্যামো কি ইলেকট্রনের উল্লেখ পেলে আমাদের চমক লাগে; কারো-কারো মনে এ যেমন অশ্রদ্ধার উদ্রেক করে, তেমনি এ-ও দেখা যায় যে, আর-কোনো কারণে নয়, নিতান্তই শেল্ কি সবমেরিন নিয়ে দু-একটা কথা আছে ব'লেই একটি রচনা সদম্ভে কবিতার দরবারে এসে হাজির। বিজ্ঞানে যখন আমরা অভ্যস্ত হবো, তখন এ-মনোভাব আর থাকবে না; সমসাময়িক বিষয়গুলিকে আমরা সহজভাবেই গ্রহণ করবো, কাব্যিক গুণ (কি গুণের অভাব) দিয়েই হবে কবিতার বিচার।

১৯৩৯

# মহুয়ার দেশে

বিকেলবেলা পৌঁছলুম। নগণ্য স্টেশন, কুলি নেই, নিজেরাই প্রচণ্ড তাড়াহুড়ো ক'রে মালপত্র নামিয়ে ফেললুম। আশা করেছিলুম আমরা নিরাপদে নামবার সঙ্গে-সঙ্গেই ট্রেনটি ফোঁশফোঁশ শব্দে ফের রওনা হবে; কিন্তু, যেন আমাদের বিদ্রূপ করবার জন্যই, সে আরো পাঁচ-সাত মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। ইতিমধ্যে আমরা হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি ক'রে জন সাতেক প্রকৃতির শিশুকে সংগ্রহ ক'রে ফেলেছি; একজন তার সত্যই শিশু, দশের বেশি বয়েস হবে না। যা-ই হোক, আমাদের রশদের ঝুড়িটা তো সে বইতে পারবে। এই নেহাৎ-বাচ্চাটির মাথায় মোট চাপিয়ে নিজেরা দিব্যি হাওয়া খেতে-খেতে যাবো, এটা প্রথমটায় একটু বিসদৃশ লাগলো, এবং বিবেকের ক্ষণিক পীড়নে ওর হাত থেকে ঝুড়িটা আমি নিয়েও নিলুম। কিন্তু দশ কি বারো পদক্ষেপের পরেই লজ্জিত হ'য়ে হার মানতে হ'লো। মাল বইতে গায়ের জোর ততটা দরকার নয়, যতটা দরকার অভ্যেস; ছোটো হ'লেও ওর কষ্ট সত্যি কিছু হচ্ছে না, উপরন্তু চারটে পয়সা ওর পক্ষে ফ্যালনা নয়, ইত্যাদি ইত্যাদি চিন্তা দ্বারা নিজের বিবেক এবং আহত অভিমান প্রশমিত ক'রে মোটটি ফিরিয়ে দিলুম যথাস্থানে।

বাংলোয় কিছুরই অভাব নেই। অনেকগুলো ঘর,

বড়ো-বড়ো বারান্দা, আসবাবপত্র প্রচুর, ভৃত্যেরা নিপুণ ও ভদ্র, আর আমাদের কপালগুণে গৃহস্বামী স্বয়ং উপস্থিত। তাছাড়া আছে দেয়ালে ঘেরা মস্ত জমি (কলকাতায় অত বড়ো কম্পাউণ্ড পেতে হ'লে বিরলা কি বর্ধমান কি গবর্নর হ'তে হয়), যার এক প্রান্ত ঘেঁষে গেছে রেল-লাইন, আর সেই জমিতে আছে অনেক গাছ, একঝাঁক পায়রা, দু-জোড়া হাঁস, এক জোড়া গিনি-ফাউল, বাচ্চাকাচ্চা সমেত অনেকগুলো মুরগি, একটি গোরু এবং তৎসহ একটি নাবালক ষাঁড়। এই শেষেরটির মাথায় টেড়ি-কাটা কালো চুল, পেট ভ'রে সে খায়, আর ফুলবাবুর মতো ঘুরে বেড়ায়; সে শোভাও নয়, তাকে দিয়ে কোনো কাজও হয় না, তবু সে আছে। কিছুদিন পরেই তাকে দিয়ে ইঁদারা থেকে জল টানাবার মৎলব যে তার প্রভু মনে-মনে আঁটছেন, তা সে জানেও না; ভাবছে এমনি গায়ে ফুঁ দিয়েই বুঝি দিন যাবে। আর তা নয় তো অগত্যা একটা গাড়িই ক'রে ফেলা হবে, কারণ অত বড়ো একটা জোয়ান পুরুষ ব'সে-ব'সে খাবে এ কিছুতেই সহ্য হয় না। আমার মনে হয় গাড়ি টানার কাজটি তার অপছন্দ হবে না, কারণ এ-কাজে তাকে যারা লাগিয়েছে তাদের উপর প্রতিশোধ নেয়া তো তার হাতেই আছে। পায়েই আছে বললে ঠিক হয়, কারণ ইচ্ছে করলেই আরোহীসুদ্ধ্‌ গাড়ি উলটিয়ে ফেলতে কতক্ষণ!

এখানে সবই আছে, আমাদের সৌন্দর্যবোধ যা-কিছু চাইতে পারে। তিনটি জিনিশের শুধু অভাব—একটি হরিণ, একটি ময়ূর, আর গাছের ডালে ঝোলানো দড়ির দোলনা

একটি। আপনি হয়তো বলতেন যে ইউক্যালিপ্টস গাছের তলায় একটি বসবার বেঞ্চি থাকলেও ভালো হ'তো, কিন্তু তা থেকে যে-তৃপ্তি পাওয়া যেতো সেটা বাস্তব নয়, মানসিক। অর্থাৎ, বেঞ্চি একটি আছে এ-কথা ভাবতেই যা সুখ; নয়তো যেখানে এত ফাঁকা ও ঢাকা জায়গা, মনোহর একটি শান-বাঁধানো গোল চাতাল, ছাদে ওঠার লোভনীয় কাঠের সিঁড়ি, সেখানে ইউক্যালিপ্টস গাছের তলায় বেঞ্চিতে বসবার সময় ও সুযোগ আপনার খুব বেশি হবে না। দোলনার কথা আলাদা—আলস্যবিলাসের ওটি একটি অতুলনীয় উপকরণ। আর যদি বলেন একটি গ্রীনহাউস থাকলে ছবিটি সম্পূর্ণ নয়, তাও আছে, পাথর-সাজানো, বেঞ্চি-পাতা, যদিও বাইরের চেহারাটা ভাঙাচোরা। তবে ওর ভিতরে গিয়ে বসবার প্রলোভন সংবরণ করাই ভালো, কারণ এখানে পোষ-না-মানা, অনিমন্ত্রিত, এমনকি অনাকাঙ্ক্ষিত জীবের অভাব নেই।

কয়েকমাস আগে একবার এ-বাড়িতে এসে ঘণ্টাচারেক কাটিয়েছিলুম। তখন এখানে এগজিবিট নম্বর ওআন ছিলেন একটি বৃশ্চিক, কাচের শিশিতে পোরা, তেরোদিনের উপবাসী, তবু অক্ষুণ্ণবিক্রম। তার কারাগারের ভিতর থেকেই সে ফোঁশফোঁশ করছিলো সাপের মতো, আর তার কামড়ও শুনলুম সর্পাঘাতের মতোই, হত্যাকারী না-হ'লেও যন্ত্রণায় সমান। এই বাড়িতে ও বাগানে বুকে-হাঁটা জীবের অভাব থাকলেই অবাক হতুম, বিস্তৃত জমির মধ্যে দু-চারটি সর্পপরিবার কোন না বাসা বেঁধে আছে। গল্প শুনলুম,

পুরাকালে যখন এ-বাড়ি মেরামত হয়, তখন ভাঙা দেয়াল ও ফাটা মেঝে থেকে রোজই দু-একটি সাপ বিরক্ত হ'য়ে মাথা বের করতো, এবং—বলাই বাহুল্য—সে-মাথা তাদের আর আস্ত থাকতো না। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও কয়েকটি বিরাট ও বিষাক্ত সাপ অনহিংস মানুষের হাতে মারা পড়েছে। এখন শীতের শেষে তাদের এক-আধজনের দেখা অনায়াসেই পাওয়া যেতে পারে—সন্ধের পরে টর্চ না-জ্বেলে পা ফেলি না, এবং টর্চ ফেলতেই একটি ফণা-তোলা মূর্তির ক্লোজ-অপ ছবি ফুটে উঠবে, এমন আশঙ্কায় বুক দুরদুর করে।

এখানে ব'লে রাখি যে সর্পজাতীয় জীব সম্বন্ধে আমি দারুণ ভিতু। কথাটা উল্লেখযোগ্য এই জন্যে যে সকলেই ভিতু নন, কেউ-কেউ আছেন যাঁরা ওকে আমলেই আনেন না, বাংলাদেশের পল্লীতে কত বাড়িতেই তো মানুষ আর কেউটে পাশাপাশি বাস করে—কেউ কাউকে ঘাঁটায় না। আবার এমন লোকও দেখেছি সর্পবধ যাঁর জীবনের প্রধান প্রমোদ, যেমন প্রসিদ্ধ সাংগীতিক হে—বাবু। শান্তিনিকেতনে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। অতিথিশালার একতলার ঘরে ব'সে তাঁর সঙ্গে গল্প করছি, হঠাৎ তিনি বললেন, 'একটা সাপ যাচ্ছে।' ব'লেই উঠে গিয়ে একটা ঢিল ছুঁড়লেন, তারপর ফের ব'সে দিব্যি ঠাণ্ডা মেজাজে আবার গল্প শুরু করলেন, যেন কিছুই হয়নি। আমি বললুম, 'সাপ?' 'ও ম'রেই গেছে—কিছু না, একটা হেলে,' ব'লে হে—বাবু হাসলেন। হ'লোই বা হেলে, অন্য-কিছুও তো হ'তে পারতো! অন্য-কিছু হ'লে তিনি খুশিই হতেন, অনেকদিন

কেউটে মারেন না, হাত নিশপিশ করে। ভাগলপুরে থাকতে এ-বিষয়ে খুব সুখে ছিলেন তিনি। আর লখনৌয়ে একবার—

এখন আমার স্বভাব এইরকম যে জীবিত কি অর্ধমৃত, মৃত কি থ্যাঁতলানো, নির্বিষ কি নির্জীব যে-কোনো একটা সাপ দেখলেই আমার বুক টিপটিপ করে, গলা শুকিয়ে যায়, হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে, শরীর অত্যন্ত দুর্বল বোধ করি। অতএব হে—বাবুর সর্পমেধ যজ্ঞের বিবরণ শুনে দারুণ রোমাঞ্চিত হয়েছিলুম, এবং সর্পহননে তাঁর প্রশান্ত নৈপুণ্য আমার মনে যে-বিস্মিত শ্রদ্ধার উদ্রেক করেছিলো তা সত্যিই অগাধ। এখানে এসে, তাই, আমি-যে সতর্কতায় কোনো ত্রুটি রাখলুম না, তা বোধহয় না-বললেও চলে, আর প্রথম দিন দুয়েকের মধ্যে যখন একটা টিকটিকির ন্যাজও দেখা গেলো না, তখন আমার সাহস এতটা বেড়ে গেলো যে আমি বন্ধুদের কাছে ফলাও ক'রে বলতে লাগলুম, 'আঃ, একটা সাপ দেখতে পেলেও হ'তো!'

আশ্চর্য এই যে আমার এ-ইচ্ছা একেবারে অপূর্ণ রইলো না। সন্ধ্যার ঠিক পরে আমরা গ্রামের পথে বেরিয়ে ফিরছি, উত্তরপূর্ণিমার ঈষৎ-ম্লান জ্যোছনা উঠেছে, বাড়ির কম্পাউণ্ডে ঢুকেই শুনি আমাদের বাবুর্চি জোয়াতালির চ্যাঁচামেচি। লাঠি লণ্ঠন নিয়ে একটা বড়ো মহুয়া গাছের তলায় সে কী দেখেছে। কী আর, নকল জিনিশ কিছু নয়, একেবারে খাঁটি মাল, সাপ। প্রথমে লাঠি, তারপর বন্দুকের সাহায্যে অবিলম্বেই তার ভবলীলা সাঙ্গ করা

হ'লো। বললুম, 'করা হ'লো'—তাই ব'লে এমন যেন কেউ সন্দেহ না করেন যে এই জীবহত্যার পাপকর্মে আমারও কোনো অংশ ছিলো। না মশাই, আমি কিছুই করিনি, ও-সব গোলমালের মধ্যে ছিলুমই না, আমি শুধু একবার টর্চ হাতে ক'রে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলুম ; তাও, সত্যি বলতে, আমি পৌঁছবার অনেক আগেই অন্যেরা মিলে নাগনন্দনের দফা রফা করেছিলেন। তারপর তার মুখের ভিতর দিয়ে একটা কাঠি চালিয়ে তাকে বারান্দায় এনে শোয়ানো হ'লো, সেখানে একাধিক লণ্ঠনের আলোয় আমরা সকলে মিলে মুগ্ধ চোখে তাকে দেখলুম। বিষাক্ত জাত, চিতি বলে এ-দেশে। কিন্তু নেহাৎ নাবালক। আঙুলের মতো সরু, লম্বায় এক হাতেরও কম হবে, হলদে ডোরা-কাটা শরীর। আমাদের অনিষ্ট করবার ক্ষমতা তার আর নেই এটা যখন জানলুম, তখন তার রঙের বাহার নিয়ে নিশ্চিন্তে একটু কবিত্ব করা গেলো। বেচারা ছেলেমানুষ, এই নতুন দক্ষিণে হাওয়ার আমন্ত্রণে বাড়ির বাইরে এসে অকালে মারা পড়লো।

কিন্তু তখনো সে একেবারে মরেনি। গায়ে তার দুটো ছররা লেগেছে, লাঠির বাড়িও কম খায়নি, তবু লেজের দিকটা একটু নড়ছে মাঝে-মাঝে। হয়তো ওটা রিফ্লেক্স অ্যাকশন, তবু আমরা প্রস্তাব করলুম যে ওকে একেবারেই ঠাণ্ডা ক'রে দেয়া হোক। গৃহস্বামী বললেন, 'আহা থাক না—এক্ষুনি ম'রে যাবে,' ব'লে তিনি সাপটির গায়ে আস্তে-আস্তে হাত বুলোতে লাগলেন। 'আহা, কী সুন্দর!' লেজ থেকে মাথা

পর্যন্ত তিনি টিপে-টিপে দেখতে লাগলেন, তাঁকে দেখে আমার শিশু কন্যাও সাপকে স্পর্শ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলো—এমন একটা নতুন ধরনের খেলনা থেকে তাকে বঞ্চিত করা হ'লো ব'লে বয়স্ক লোকদের উপর তখনকার মতো তার ঘেন্না ধ'রে গিয়েছিলো এটা সহজেই অনুমান করতে পারি। বন্ধুটিকে সাপের গায়ে অমন নির্বিকার চিত্তে হাত বুলোতে দেখে সাপ সম্বন্ধে আমারও ভয় যেন হঠাৎ অনেকখানি ক'মে গেলো। আসলে এ-ভয়ের সঙ্গে তীব্র একটা ঘৃণাও মেশানো থাকে, তার ঐ লিকলিকে, কিলবিলে, ঠাণ্ডা-গা, বুকে-হাঁটা চেহারাটা ভাবলেই আমাদের গা-কেমন করে, সাপকে আর পাঁচটা জানোয়ারের মতো স্বাভাবিক একটা জীব ব'লে ভাবতে পারলেই ঘৃণাটা আর থাকে না, তাই ভয়ও ক'মে যায়।

যা-ই হোক, পাছে শ্রীমান চিতি আবার চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে, তাই তার গা কেটে পার্মঙ্গেনেট অব পটাশ রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হ'লো, তারপর মহা সমারোহে অন্য একটি গাছের তলায় শুকনো পাতা আর কাঠ জড়ো ক'রে তাকে আমরা পোড়ালাম। আধ ঘণ্টার মধ্যে তার চেহারা হ'য়ে গেলো গাছের একটা শুকনো ঝরা ডালের মতো। মোটের উপর, সন্ধ্যাটি আমাদের জমলো বেশ।

বন্ধুরা পরের দিন বিদায় নিলেন। ভাবছিলুম, স্বর্গীয় চিতির কোনো ভাই কি বোন জ্ঞাতির খোঁজ নিতে আসবে হয়তো, এবং সবন্দুক বন্ধুর অনুপস্থিতিতে তার আবির্ভাব খুব সুখের হবে না। কিন্তু সে-রকম কেউ এলো না, শুধু একদিন

একটা গিরগিটি জাতীয় জীব আমাদের ওভরকোটের পকেট তল্লাশ করতে এসে বেঘোরে প্রাণ হারালো। আসলে, এত গাছপালা সত্ত্বেও পোষ-না-মানা জীবের সংখ্যা এখানে খুব বেশি নয়, অতিপরিচিত বক বাদ দিলে দু-তিন রকমের বেশি পাখি চোখে পড়েনি, ক্বচিৎ দু-একটা কাঠবেড়ালি, আর সারা দুপুর ভ'রে একটা কাঠঠোকরার অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ঠুকঠুক শব্দ। আশ্চর্যের বিষয়, যদিও বসন্তকাল, একটা কোকিলের ডাক কানে আসেনি। কিন্তু কোকিল যেমন নেই, বিরক্তিকর কাকও নেই, রাত্রে নেই ইঁদুরের রহস্যময় ক্রিয়াকলাপ, তবে এক-এক রাত্রে কোথাকার একটা লক্ষ্মীছাড়া বেড়াল এসে বেজায় হল্লা বাধাতো—আর আমাদের সতর্ক কুকুর প্রহরীর সে কী দারুণ চীৎকার!

বেড়াল আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না। মধ্যরাত্রের ঐ চোরস্বভাব আগন্তুককে চোখে যে কখনো দেখতে হয়নি তাতেই আমি খুশি। এখানে পথে-ঘাটে বে-ওয়ারিশ নোংরা কুকুর আর পালিত গোরু, ছাগল, শুয়োর চোখে পড়ে, কিন্তু বেড়াল একটাও না। বোধহয় সমস্ত গ্রামে ওটাই একমাত্র বেড়াল। প্রার্থনা করি, ওটাই শেষ হোক। ওর ভাগ্যে জীবনসঙ্গিনী যেন না জোটে। আর জুটলেও, ওদের বিবাহ যেন নিঃসন্তান হয়। কাক আর বেড়াল যেখানে নেই, সে-জায়গাই সত্যি-সত্যি মানুষের যোগ্য।

অন্তত, এ-জায়গাটি আমাদের মনের মতো। এর প্রধান মাধুর্য এই যে এখানে কোনো মস্ত নামডাক-ওলা জমকালো দৃশ্য আমাদের মন দখল ক'রে থাকে না। তুষার কি সমুদ্রের

সামনে এলে আমাদের মন এত অভিভূত হ'য়ে পড়ে যে দিন ও রাত্রির বিভিন্ন সময়ে ঐ দেবতাকে আমাদের মুগ্ধ দৃষ্টির অর্ঘ্য জানানো প্রায় একটি কর্তব্য হ'য়ে দাঁড়ায়। নীল, সবুজ, বেগনি, বাদামি সমুদ্র থেকে চোখ আমাদের ফেরে না ; পাছে এই অফুরন্ত-লীলাময়ের কোনো একটি ক্ষণিক, অপরূপ ভঙ্গি অসাবধানে দেখতে না পাই, মন সব সময় উদ্বিগ্ন থাকে সেইজন্য। পাহাড়েও তা-ই। এত দেখবার, এত বেড়াবার, নতুন পরিচয় করবার এতও আছে! সৌন্দর্যের এমন বেহিশেবি বাজে খরচের সঙ্গে শরীর পাল্লা দিয়ে উঠতে পারে না ; একই সময়ে চারদিক থেকে এত নিমন্ত্রণ আসে যে সমস্তটা ভোগ করবার আশা প্রথম থেকেই ছাড়তে হয়, আর প্রাণপণ পরিশ্রমে সকলের নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রেও যাবার দিনে এ-অনুশোচনা মনে থেকেই যায়—আহা, ঐ ছায়া-ঢাকা পথটিতে একদিনও যাওয়া হ'লো না। কিন্তু এখানে ও-সব টানা-হেঁচড়া হুড়োহুড়ি নেই। জায়গাটি প্রায় সমতল ; নিতান্ত সাধারণ ব'লেই সুন্দর, আর-কোনো কারণে না। তীর্থের পাণ্ডাদের মতো ব্যগ্র সৌন্দর্যগুলি অতিথিকে নিয়ে টানাটানি ক'রে বলে না—আমাকে! আমাকে ছাখো! আমাকে নাও! কাছাকাছি একটা পাহাড় কি ঝরনাও নেই যে দেখতে যাবো—দক্ষিণ দিগন্ত জুড়ে আছে পরেশনাথ, তাকে ছাড়িয়ে আর-একটা পাহাড়শ্রেণী, কিন্তু তা এতই দূরে, এতই অস্পষ্ট ও বিনম্র যে তাকে লক্ষ্য না-করলে অপরাধ হয় না। তাছাড়া পশ্চিম কোণে খণ্ডৌলি, যেদিকেই বেড়াতে বেরোই, আমাদের চোখে পড়ে। আর? আর আছে

রেল-ইস্টিশান, দু-একটি মুদি দোকান, শালের সারি, মহুয়া-বন, মাঠ, নিড়োনো খেত, আবার মাঠ, ভরা কলসি মাথায় মৃদুগামিনী তরুণী, আর অর্ধনগ্ন, নোংরা, ক্ষুধাতুর শিশুর দল।

আর আছে পুকুর একটি। বেশ বড়ো পুকুর, রেল কোম্পানির, সেখানে কাপড় কাচা স্নান করা নিষেধ এই মর্মে একটি নুটিশ লটকানো আছে। বোধহয় সেইজন্যই ওটি সমস্ত গ্রামের একাধারে স্নানাগার এবং রজকালয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও জল এত পরিষ্কার যে দেখলেই নাইতে ইচ্ছে করে। তেল সাবান বাথরুমের মায়া কাটিয়ে গেলুম একদিন পুকুরে নাইতে। এক পাড়ে গাঁয়ের মেয়েদের জটলা, মাটি দিয়ে তারা নিজেদের ও শিশুদের গা ধুচ্ছে, আমার অপরিচিত অন্য কোনো বস্তু দিয়ে সাফ করছে তাদের রুক্ষ, লালচে চুল; পরিচ্ছন্নতা-বিরোধী শিশুদের চ্যাঁচানিতে আর বয়স্কাদের সহর্ষ কলরবে দুপুরবেলাটি মুখর। আমার পাশে একটা উলঙ্গ ছেলে উল্টো ডিগবাজি খেয়ে জলে পড়লো, তারপর সাবলীল গতিতে সাঁৎরাতে-সাঁৎরাতে ট্যারচা চোখে আমাকে পাশ কাটিয়ে চ'লে গেলো। 'কেমন—পারো এ-রকম?' ভাবখানা এই। না, পারি না। তবু—জলে ভাসতে-ভাসতে উপরের অগাধ নীল আকাশ আর চঞ্চল, উজ্জ্বল বাতাস নিজের শরীরে অনুভব করা—এ-সুখ থেকে আমিও বঞ্চিত নই।

ভিজে তোয়ালে মাথায় চাপিয়ে বাংলোয় ফেরা—এখন খাওয়া। জোয়াতালি কী রেঁধেছে? ডাল, তরকারি, মাছ কিংবা ডিম—মুরগি রাত্রের বরাদ্দ। ডালে সে কখনো নুন দেয় না, তরকারি কিংবা মাছ রাঁধতেই সে জানে না—

সত্যি বলতে, এক মুরগির ঝোলটাই তার হাতে খোলে। তবু খিদের গুণে, এবং স্থানীয় খাদ্যের স্বাভাবিক স্বাদুতার ফলে, যে-পরিমাণ ভাত অন্তর্হিত হয় তাতে নিজেদেরই অবাক লাগে। খাওয়ার পরে যে-সময়টা, সেটাই এখানকার বিশেষত্ব, এই শালবন-খচিত গেরুয়া প্রান্তরের নিজস্ব সৃষ্টি। কলকাতায় দুপুরবেলার অস্তিত্ব নেই, হয় কাজের নয় আলস্যের চাপে তা নিশ্চিহ্ন। গ্রীষ্মের অমন যে লম্বা দিনগুলি, তাদেরও আমরা বাধ্য হ'য়েই বাইরে ঠেকিয়ে রাখি জানলা-দরজা বন্ধ ক'রে, অন্ধকার-করা ঘরে পাখা চালিয়ে একমনে কাজ করতে পারলেই শান্তি—তারপর কোনোরকমে ঘড়ির কাঁটায় বৈকালী চায়ের ঘণ্টা বাজলেই হাঁফ ছেড়ে বলি, 'বাঁচলুম।' আজকের মতো যে দুপুরের আয়ু ফুরোলো তাতেই আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু এখানে দুপুরবেলার বিশেষ একটি রস আছে, যা ঈষৎ মদির। অনেকখানি সময়—এমন নয় যে-কোনোরকমে কাটাতে পারলে বাঁচি—বরং এ-সময়টাকে মনে হয় কোনো প্রিয় কবির নতুন বইয়ের মতো, আস্তে-আস্তে, একটু-একটু ক'রে নিবিড়ভাবে উপভোগ্য। বিচিত্র কবিতাগুচ্ছের মতোই এখানকার দুপুরগুলি এক-একটি এক-এক সুরে বাঁধা। কোনোদিন আকাশে পাৎলা মেঘ, জোরে হাওয়া দেয়, ঝরঝর ক'রে শুকনো পাতা ঝ'রে পড়ে—বাগানে আমরা ঘুরে বেড়াই; দেখি, কোন গাছ থেকে ঝুরি নেমেছে রাজনৈতিকের মগজের মতো প্যাঁচালো, মহুয়ার লাল-লাল ফুল ধরেছে, আর চিক্কণ সবুজ আমের বোল—একটা নীল রঙের পাখি

হঠাৎ এক গাছ থেকে আর-এক গাছে লাফিয়ে উড়ে গেলো। কিংবা বাড়ির বাইরেও যাওয়া যায়, পুকুর-পাড়ের উঁচু ঢিপিটার উপর, মেঘের-ছায়া-পড়া কালো জল হাওয়ায় ছলছল করছে, দিগন্ত-ছোঁয়া প্রান্তরে একা দাঁড়িয়ে খণ্ডৌলি, রেল-লাইন ধ'রে কে একজন যাচ্ছে মাথায় পুতুলের ঝুড়ি নিয়ে, ডাকো তাকে। অন্য কোনোদিন আকাশ নির্মল নীল, রোদ চড়া, দক্ষিণের বারান্দা তেতে ওঠে, উত্তরের ঠাণ্ডা বারান্দায় চেয়ার টেনে ব'সে বই পড়ো। নয়তো চুপচাপ ঘরে ব'সে উপন্যাসের একটা পরিচ্ছেদ কি দুটো কবিতার বইয়ের সমালোচনা লেখা যায়—মহিলারা বারান্দায় ব'সে গ্রামোফোনে একই রেকর্ড বার-বার বাজাচ্ছেন, কারণ সেটি আমার কন্যার প্রিয়—তারপর এক সময় হাঁস আর মুরগির তুমুল কলরব কানে আসে, জোয়াতালি ওদের খাওয়াচ্ছে, বিকেল হ'লো। দুপুরবেলাটি এমন-একটি সহজ, সুন্দর ছন্দে বিকেলের কোলে ঢ'লে পড়ে যে ভারি ভালো লাগে ; দু-জনে কোনো বিরোধ নেই এখানে, রাত্রির প্রতীক্ষায় শেলির দীর্ঘশ্বাস এখানে অনর্থক। মোট কথা, এমন দীর্ঘ অথচ মধুর দুপুর আর-কোথাও আমি পাইনি। কাজ করতে চাইলে প্রচুর করা যায়, আবার ঘুরে বেড়িয়ে, কিছু না-ক'রে, অথচ না-ঘুমিয়ে কাটাতে হ'লে তারও উপকরণের অভাব নেই। একদিকে সময়ের যেমন অগাধ সচ্ছলতা, তেমনি আবার সময় 'বধ' করবারও প্রয়োজন নেই।

সন্ধ্যাও হ'লো, এখানকার জীবনও থামলো। কখনো

আকাশে একলা চাঁদের রাজত্ব, কখনো ঘুটঘুটে অন্ধকারে তীক্ষ্ণ তারার ঝাঁক। আমাদের চোখে জ্যোছনার চাইতে এই অন্ধকারই বেশি আশ্চর্য। মিশমিশে কালো, জমাট অন্ধকারে আমরা এতই অনভ্যস্ত যে সন্ধ্যা হবার একটু পরেই যখন কালো কাপড়ের ঠাশবুনোন সমস্ত পৃথিবীর মুখে নেমে আসে, অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। গাছের মাথায়-মাথায় জোনাকি জ্বলে, আমাদের টর্চের আলো বাইরের দেয়ালের কাছে এক-পায়ে-দাঁড়ানো তালগাছটির মাথায় গোল হ'য়ে পড়ে, আর আকাশ যেন তারার ভারে মাটির আরো কাছে নেমে আসে। মাথার উপর বিশাল কালপুরুষ জ্বলজ্বল করে, আর উত্তরে সপ্তর্ষি তার ধ্যানের শান্তি বিছিয়ে দেয়। কিন্তু বেশিক্ষণ তারা দেখা হয় না, খাবার ডাক পড়ে, আর খাওয়ার পরে শুয়ে পড়া ছাড়া আর-কিছুই করবার নেই এখানে।

কোথাও-যে বেরোতে হয় না, বাংলোর বারান্দায় ব'সেই যে দু-চোখ দিয়ে জায়গাটিকে নিঃশেষে ভোগ করা যায়, আমাদের কাছে এটাই এর প্রধান আকর্ষণ। আরো সুবিধে এই যে বেরোতে ইচ্ছে হ'লে যখন খুশি এবং যেদিকে খুশি বেরিয়ে পড়লেই হ'লো, ইচ্ছা ও কাজের মধ্যে সাজগোজের ব্যবধান নেই। এখানে যা খুশি প'রে থাকো, যেমন-আছো-তেমনি বেরিয়ে পড়ো, আর তার উপর গরম প'ড়ে আসছে ব'লে অল্প দু-একটা কাপড়েই চ'লে যায়। বেরোবার আগে যে রীতিমতো ভদ্র বেশ ধারণ করতে হয় না, এ-স্বাধীনতা অত্যন্তই উপভোগ্য, তাছাড়া দুর্লভ,

কেননা বেড়াতে গিয়েও পোশাকের দাসত্ব থেকে আমরা মুক্ত হই না—বরং অনেকে বহুলায়তন বিচিত্ররূপী বেশভূষার সুযোগ পাবেন ব'লেই পাহাড়ে যান। মনে হ'লো আর বেরিয়ে পড়লুম, এ-সৌভাগ্য বিখ্যাত জায়গাগুলির কোনোটিতেই ঠিক ঘটে না ; বেরোতে হ'লেই তোড়জোড় মাজাঘষা কোথায় রে চিরুনি কোথায় জুতোর বুরুশ—সব মিলে হুলুস্থুল বেধে যায়। এখানে স্বাধীনতা অবাধ। এমনকি, কাপড় ঈষৎ ময়লা হ'লেও যে তক্ষুনি বাক্স থেকে সাফ কাপড় বার করার তাড়া নেই, এ যে কী আরাম তা আর বলবার নয়।

পুরোপুরি আটপৌরে হবার একটি অনির্বচনীয় সুখ আছে, যা শরীরকে বিশ্রাম দেয়, মনে শান্তি আনে। এখানে সে-সুখে কোনো সামাজিকতার কণ্টক উঁচিয়ে নেই। প্রকৃতিও এখানে আটপৌরে, নিতান্ত ঘরোয়া ও আপন লোকের মতো, তার সঙ্গে মনের ভাষায় কথা কওয়া যায়। প্রকৃতির এ-রূপটি কলকাতায় আমাদের চোখে পড়ে ক্বচিৎ কখনো আভাসে ইঙ্গিতে, এখানে চারদিকেই সে অরফুন্ত হ'য়ে ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে অসহ্য কোনো সৌন্দর্য নেই, অসম্ভব সমারোহে সে আমাদের নিশ্বাস কাড়ে না, সেইজন্য তাকে লক্ষ্য না-করলেও চলে, অথচ সে সর্বদাই উপস্থিত। প্রকৃতি যেখানে নামজাদারকম সুন্দর, সেখানে সে আমাদের কাছ থেকে বড়ো বেশি খাজনা আদায় করে, আমাদের মুগ্ধ হৃদয়ের উপঢৌকন নিঃশেষে কেড়ে নিয়ে তবু সে আরো চায়। কিন্তু এই গেরুয়া মাটির প্রান্তর, ছবির মতো শালবন, আর দূরের

পাহাড়ের রেখা—এরা আমাদের উপর কোনো দাবি করে না, এরা দিন-রাত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে—আমরা ইচ্ছেমতো পড়ি, গল্প করি, কি চুপ ক'রে ব'সে থাকি, কি সারাদিন ঘরে বন্ধ হ'য়ে উপন্যাসের পরিচ্ছেদ লিখি, কালির আঁচড়ে মগ্ন চোখ কোনো অপূর্ব দৃশ্য থেকে বঞ্চিত হ'লো, এ-চিন্তায় থেকে-থেকে মন বিচলিত হয় না;—এদিকে হাওয়া ওঠে, ঝরা পাতার ঝরোঝরো শব্দের ফাঁকে-ফাঁকে পায়রাদের ক্ষীণ গোঙানি শোনা যায়—বাইরে এসে দেখি, আকাশে হাতি-রঙের মেঘ করেছে, বৃষ্টি হবে বোধহয়। সন্ধ্যাবেলা বৃষ্টি নামে, ভিজে মাটির গন্ধে মগজে নেশা লাগে, আর পরের দিন শিশিরে ঝলমল সবুজ ভোরটিকে ইচ্ছে করে বাক্সে ভ'রে কলকাতায় নিয়ে যাই। চারদিক এমন নিরিবিলি, এমন চুপচাপ, লোক এত কম আর সময় এত প্রচুর যে এই অনাড়ম্বর প্রকৃতির প্রতিটি ছোটো-ছোটো ভঙ্গি আমাদের দিনগুলির মধ্যে বোনা হ'য়ে যায়। মন দিয়ে দেখতে হয় না, চোখ মেলে তাকালেই চোখে পড়ে।

১৯৪০
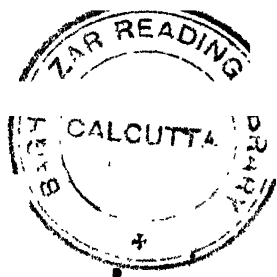
# ডাকঘর

ছেলেবেলায় ডাকঘর ছিলো আমার মনের একটি রহস্য-নিকেতন। থাকতুম মফস্বলের ছোটো শহরে, সেখানে নিত্য-নতুন উত্তেজনা উন্মাদনা ছিলো না, সিনেমা তখন পর্যন্ত সেখানে পৌঁছয়নি—বাংলার সেই অনগ্রসর সীমান্ত-জেলায় এই বহু-তারকায়িত আলো-ছায়ার যুগেও পৌঁচেছে কিনা জানি না। নদীর ধারে, মাঠে-ঘাটে বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া ইশকুলে-না-পড়া বালকের কিছুই করবার ছিলো না। ছোট্ট শহরটির এমন-কোনো পথই ছিলো না যেখান দিয়ে বার-বার যাওয়া-আসা না করেছি—আর সবসুদ্ধু রাস্তাই বা ক-টা! যেতে-আসতে যখনই ডাকঘরের কাছে এসেছি, থমকে দাঁড়িয়েছি একটু, শিক-আঁটা জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে দেখেছি ভিতরকার ব্যস্ততা, দুমদুম শব্দে টিকিটে ছাপ পড়ছে, নানা রঙের টিকিট-মারা ছোটো-বড়ো কত পার্সেল, মস্ত-মস্ত থলি উপুড় ক'রে মেঝেয় ঢালা হচ্ছে রাশি-রাশি চিঠিপত্র—সে এক বিচিত্র ব্যাপার। বাড়ির লোকের ডাকঘরে কোনো কাজ থাকলে আমিই যেতুম দৌড়িয়ে, কী ভালোই লাগতো চিঠি ডাকে দিতে, টিকিট কিনতে! (স্বপ্নের মতো মনে পড়ে সেই এক পয়সার পোস্টকার্ড আর দু-পয়সার খামের স্বর্ণযুগ।) খুব ছোটো যখন ছিলুম, দাইয়ের কোলে চ'ড়ে

ডাকবাক্সয় চিঠি ফেলতুম—কী মস্ত মনে হ'তো সেই হাঁ-টা, ভয় হ'তো আমিই বুঝি টুপ ক'রে ওর মধ্যে প'ড়ে যাবো, তারপর মাটির তলার সুরঙ্গ দিয়ে কোথায় ঢাকা কোথায় কলকাতা কোথায় ডিব্রুগড়—কোন সুদূর অজ্ঞাত বিদেশে গিয়ে যে উঠবো কে জানে। ভাবতে মাথা ঘুরতো। চিঠি যে কত তার অন্ত নেই, আর যেখানে-যেখানে তারা যাবে, সে-সব শহর বন্দর গঞ্জ গ্রাম—তারই কি শেষ আছে! এমনকি, বিলেতেও তো চিঠি যায়! মাটির, নদীর, সমুদ্রের তলা দিয়ে এত সুরঙ্গ কে বানালো, আর কেমন ক'রেই বা বানালো! সে যে হাজার-হাজার—না, তারও বেশি—লাখ-লাখ—না, লাখেও কুলোয় না, কোটি-কোটি সুরঙ্গ। এর পরে ভাবনা যেতো থেমে, অবাক হ'য়ে চেয়ে দেখতুম ডাকঘরের বাড়িটির দিকে—এরই মধ্যে এত সব কাণ্ড, অথচ বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না;—টুকটুকে লাল টিনের উপর শাদা অক্ষরে লেখা রকমারি নুটিশগুলো আমার মনে হ'তো যেন দৈব ভাষায় লেখা কোনো আশ্চর্য মন্ত্র। বিশেষ ক'রে যেখানে লেখা—'No Admission'—'ভিতরে আসিও না'—সেই দরজার দিকে লুব্ধহৃদয়ে মুগ্ধদৃষ্টিতে কতদিন তাকিয়ে থেকেছি—এমন সৌভাগ্য আমার জীবনে কি কখনো হবে যে ঐ দরজা দিয়ে ঐ নিষিদ্ধ স্বর্গোপম ঘরটিতে ঢুকতে পাবো!

একদিন স্বপ্ন হ'লো সত্য। গুরুজনের সঙ্গে ঢুকে গেলুম সেই নুটিশ-লটকানো ঘরে, যেখানে সাধারণ মর্ত্য মানবের প্রবেশ নিষেধ। গিয়ে একটু হতাশই হলুম। এরাও আর

[illegible] মতোই মানুষ, চেয়ারে ব'সে টেবিলে কাজ করে, এদেরও দোয়াতের কালি ফুরিয়ে যায়, এদেরও কানের কাছে মাছি ভ্যানভ্যান করে। আমার দাদামশাই টাকা দিয়ে একটা বইয়ের প্যাকেট নিলেন। বইটা আমারই জন্য। নতুন বই পেয়ে যত না খুশি হলুম, তার চেয়েও অবাক হলুম ডাকঘরের নতুন একটি আকর্ষণ আবিষ্কার ক'রে—এখানে শুধু টিকিট-পোস্টকার্ডই নয়, বইও কিনতে পাওয়া যায়, অথচ কোনোখানেই তো বই সাজিয়ে রাখতে দেখি না। কী আশ্চর্য! এরা কি মন্ত্র জানে? যখন যা চাই তা-ই দিতে পারে? এর পরে যখনই কোনো নতুন বইয়ের ইচ্ছে হ'তো, বাড়ির লোকদের বলতুম পোস্টাপিশ থেকে আনিয়ে দিতে। আমার ধারণা হয়েছিলো যে এই বই আনার রহস্য বড়োরাই শুধু জানেন, আমি গিয়ে বই চাইলে আমাকে ওরা ফিরিয়ে দেবে।

আমি কিছু অকালপক্ক ছিলুম, তাই একটু বড়ো হ'তে-হ'তেই ডাকঘরের সঙ্গে আমার নিজস্ব যোগাযোগ স্থাপিত হ'লো। অনেক মাসিক-সাপ্তাহিকপত্র আসতো আমার নামে, চিঠিপত্রও আসতো—কারণ আত্মীয়রা অনেকেই আমার প্রতি স্নেহবশত আমার নামেই চিঠি লিখতেন, তাছাড়া আমার স্বকীয় কিছু-কিছু রচনাও দিগ্বিদিকে পাঠাতে শুরু করেছিলাম—এবং তাদের অবিরল প্রত্যাগমনের ফলে আমার ডাকের বহর উল্লেখযোগ্যই ছিলো। প্রায়ই সকালবেলায় আমি ডাকঘরের জানলায় গিয়ে দাঁড়াতুম চিঠি আনতে। জজ ম্যাজিস্টর ইত্যাদির চাপরাশিদের

ভিড়ের মধ্যে কম্পিতবক্ষে আমিও অপেক্ষা করতুম এক কোণে, এবং—বলতে খুশি হচ্ছি—শূন্য হাতে একদিনও ফিরতুম না। ওরা থলি ভ'রে নিয়ে যেতো On His Majesty's Service লেখা লম্বা-চওড়া খাকি রঙের খাম—আমার দু-একটি চিঠি কিংবা পত্রিকা—তাও কম নয়। কোনো-কোনোদিন অনেকটা আগেই যেতুম—গিয়ে দেখতুম সর্টিং চলেছে। একটি গোল টেবিল ঘিরে ডাকওলারা বসেছে, আর মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটি বাবু চেঁচিয়ে এক-একটি চিঠির মালিকের নাম পড়ছেন আর আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় সেটি ছুঁড়ে দিচ্ছেন যে-ডাকওলার ভাগে সেটি পড়বে ঠিক তার হাতের কাছে। চিঠিপত্রের সেই বিরাট বিচিত্র মিছিলের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে রুদ্ধশ্বাসে ভাবতুম, এর মধ্যে কোনটি আমার। যে-মুহূর্তে আমার কোনো চিঠি বেরোতো, সর্টারবাবু তক্ষুনি সেটি গরম-গরম চালিয়ে দিতেন আমার হাতে;—কোনো-কোনোদিন ডাক বেশ ভারি হ'তো—তার মধ্যে আবার বেশির ভাগই আমার—সে যে কী আনন্দ। চিঠির খামে, মাসিকপত্রের মোড়কে, সমস্ত ডাকঘরটিতে কী-যেন এক আশ্চর্য অনির্বচনীয় সৌরভের সম্ভাষণ। সে কি কাগজপত্রের, না তুঁত-মেশানো ময়দার আঠার, না কি শিশিরে আলোতে স্নিগ্ধ উজ্জ্বল সকালবেলার, না কি আমারই উন্মীলমান বালকহৃদয়ের, তা বলতে পারবো না। একটির পর একটি চিঠি পড়তে-পড়তে যখন বাড়ির রাস্তা ধ'রে আস্তে-আস্তে হাঁটতুম তখন আমার মনে যে-সব ভাব খেলা করতো তার কি কোনো ভাষা আছে? আবার

কোনো-কোনোদিন দেরি হ'য়ে যেতো, গিয়ে দেখতুম ডাকওলারা বেরিয়ে গেছে। আমাদের পাড়ার এক বুড়ো ডাকওলা, সবচেয়ে নিষ্কর্মা সে, নাম তার সাধু, জানতুম সে চিঠি নিয়ে বেরোবার আগে ডাকঘরের কাছেই পুকুর-পাড়ে ছোট্ট একটি ঘরে ব'সে অনেকক্ষণ তামাক খায়—ছুটে গিয়ে তাকে ধরতে যদি পারতুম তো ভালো, নয়তো বিষণ্ণচিত্তে ফিরে আসতুম, ঐ বুড়ো দুপুরবেলার আগে কিছুতেই চিঠি নিয়ে আসতো না।

ছেলেবেলায়, প্রথম প্রেমের রোমাঞ্চ নিয়ে, আমার সঙ্গে ডাকঘরের যে-যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিলো এখন তা এতই বিস্তৃত যে সশরীরে ডাকঘরে যাবার সুযোগ বেশি হয় না। তবু, যখনই যাই, ছেলেবেলার সেই মোহ যেন মনে ফিরে আসে। নানা রঙের, নানা আকারের, নানা ছাঁদের হস্তাক্ষর-অঙ্কিত রাশি-রাশি চিঠি—এ যেন কোন রূপকথার গহন গুহার অফুরন্ত ঐশ্বর্য। অন্য যে-কোনো সরকারি আপিশে আমার ঢুকতেই বিশ্রী লাগে, ভিতরের হাওয়ায় কেমন একটা মৃত গন্ধ, দম আটকে আসে। কিন্তু ডাকঘরের গন্ধটি কী মধুর, শাদা অক্ষরে আঁকা লাল টিনের পাতগুলো এখনো জ্বলজ্বলে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আমার মন কেড়ে নেয়। দুঃখের বিষয়, এই রাজধানীর বেশির ভাগ ডাকঘরই ঠিক তা-ই, ডাকঘরের কখনো যা হওয়া উচিত নয়। ভিড়, গরম, হট্টগোল, ঠেলাঠেলি—এ-সব থাক থানায়, আদালতে, জজকোর্টে—ডাকঘরটি হোক নিরিবিলি, ছায়া-ঢাকা গলিতে ছোটো একটি একতলা বাড়ি, সামনে

সবুজ ঘাস, লাল কাঁকরের পথ শেষ ক'রে ছুটো তিনটে সিঁড়ি বেয়ে পরিষ্কার চওড়া বারান্দায় উঠবো। কলকাতায় যেমন ইশকুল-কলেজ, যেমন মানুষের থাকবার বাড়ি, তেমনি ডাকঘর; সত্যি বলতে, দোকান, রেস্তোরাঁ আর সিনেমা ছাড়া কোনো গৃহই যেমন হওয়া উচিত তেমন নয়। এখানকার বড়ো ডাকঘরও একটা মস্ত কিছু বটে, কিন্তু ওতে কোনো রস নেই; দেখে এমন তাক লাগে যে দূর থেকে সেলাম ক'রে বিদায় নিতে হয়, ভয় হয় ওর ভিতরকার বিরাট ব্যস্ততায় আমি সুদ্ধু বুঝি পিষে যাবো। ঢের ভালো মফস্বলের ছোটো-ছোটো ডাকঘরগুলো। তাদের প্রাণ আছে, দয়া আছে, মনুষ্যত্ব আছে। আমি যখনই কোনো নতুন জায়গায় যাই, প্রথমেই সেখানকার ডাকঘর খুঁজে বের করি। বিদেশে গিয়ে বেড়ানোই তো কাজ—নিজেই যাই টিকিট কিনতে, চিঠি ডাকে ফেলতে। বড়ো মনোহর এক-একটি ডাকঘর চোখে পড়েছে। দারজিলিঙে মুগ্ধ হয়েছিলুম ম্যালে যাবার মোড়ে ডাকঘরটি দেখে। যেমন চমৎকার দেখতে, তেমনি জনবিরল চুপচাপ পরিচ্ছন্ন ওর অভ্যন্তর। ওরই দোতলায় থাকেন পোস্টমাস্টার—মনে-মনে ভেবেছিলুম, ওঁর মতো সুখী আর কে। কিন্তু ওঁর চেয়েও সুখী আর-একটি ব্যক্তি যে আছেন তা আবিষ্কার করলুম কয়েকদিন পরেই জলাপাহাড়ে গিয়ে। চড়াই ভাঙতে-ভাঙতে হঠাৎ চোখে পড়লো ছবির মতো একটি দোতলা বাড়ি—সামনে অবারিত উত্তর, ধাপে-ধাপে দারজিলিঙের লাল ছাদগুলো পার হ'য়ে সোজা চ'লে গেছে কাঞ্চনজংঘার

পুঞ্জ-পুঞ্জ তুষার পর্যন্ত। আহা, কী সুন্দর। একটু এগিয়ে এসে দেখলুম, বাড়িটি ডাকঘর। নিচে আপিশ, উপরে মাস্টারবাবু থাকেন। ছেলেমানুষ আর নই, হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি কাকে বলে বাস্তব, তবু পাহাড়ি প্রকৃতির মাঝখানে কাঞ্চনজংঘার মুখোমুখি সেই ডাকঘরটি দেখে মনে-মনে একবার না-ভেবে পারিনি যে সার্থক হ'তো জীবন যদি জলাপাহাড়ের পোস্টমাস্টার হতুম।

১৯৩৯

## স্পোর্টস-এর বিরুদ্ধে

বললে হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু কলকাতার মাঠে ফুটবল ( কি অন্য-কোনো ) খেলা এ-পর্যন্ত সত্যি আমি একদিনও দেখিনি। এর কারণ, আর যা-ই হোক, আমার অবচেতনের কোনো বিকৃতি নয়। তা যদি হ'তো, তাহ'লে সবচেয়ে প্রচণ্ড, সবচেয়ে রক্তপিপাসু ক্রীড়ার উৎসাহীতম দর্শকদের আমি হতুম অন্যতম, কেননা বিপরীতের আকর্ষণ মনস্তত্ত্বের একটি মূল কথা। আমি খর্বকায়, এবং শারীরিক বিক্রমে আমাকে পরাস্ত করতে পারেন এমন বঙ্গললনাও বোধহয় বিরল নন—আর এ তো জানা কথাই যে মেয়েরা, এবং পুরুষদের মধ্যে যারা রোগাপটকা, শারীরিক ক্রীড়ার তারাই চিরকাল প্রধান পৃষ্ঠপোষক। আমার এই স্পোর্টস-বিমুখতার কারণ মনস্তত্ত্বের গূঢ় রহস্যে লুক্কায়িত নেই ; সেটা সম্পূর্ণ সচেতন, বুদ্ধিগত, চিন্তাপ্রসূত। আধুনিক জগতে শারীরিক ক্রীড়ার এই অপরূপ প্রতিষ্ঠা আমাকে মুগ্ধ করে না, আমি বরং তাতে অধঃপাতেরই লক্ষণ দেখতে পাই। আজকের দিনে স্পোর্টস-এর অবিশ্বাস্য অভ্যুত্থানে, আমার মনে হয়, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ভিতরকার ফাঁকিটাই ধরা পড়ে। একজন ভালো খেলোয়াড় কি কুস্তিগির এ-যুগে একজন মহৎ ব্যক্তি, প্রায় মহামানব ; জনপ্রিয়তায় ফিল্ম-স্টারের সে সমকক্ষ। রবীন্দ্রনাথ কিংবা আইনস্টাইন অধিকাংশ

জগৎবাসীর পক্ষেই একটা নাম মাত্র ; ব্র্যাডম্যান কিংবা শ্‌মেলিং লক্ষ-লক্ষ স্ত্রী-পুরুষের হৃদয়েশ্বর। সামাজিক, এমনকি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্পোর্টস-এর মহিমা তো অপরিসীম। ক্রীড়ায় যার আসক্তি আছে, সে কখনো মন্দ লোক হয় না, আর যার শক্তি আছে সে প্রায় আদর্শ পুরুষ, ইংরেজ শাসকশ্রেণীর মধ্যে এ-রকম একটি ধারণা বদ্ধমূল। এই স্পোর্টস-পূজা মারাত্মক জ্বরের মতোই সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। সংবাদপত্রে খেলার খবর বড়ো-বড়ো অক্ষরে ছাপা হয় ; কিন্তু বৈজ্ঞানিকের গবেষণার কিংবা সাহিত্যিকের নতুন গ্রন্থরচনার খবর বেরোয়, এমন সংবাদপত্র জগতে নেই। কোনো দিগ্বিজয়ী কবি কি দার্শনিক কি বৈজ্ঞানিক রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে কেউ লক্ষ্যই করবে না ; একজন বিশ্বখ্যাত খেলোয়াড়ের পুলিশের সাহায্য ছাড়া স্টেশন থেকে হোটেলে পৌঁছবার উপায় নেই। এ-প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়লো। আনাতোল ফ্রাঁস একদিন এক বন্ধুর সঙ্গে প্যারিসের এক কাফেতে ব'সে গল্প করছেন, এমন সময় মহা কলরব করতে-করতে একদল লোক প্রসিদ্ধ মুষ্টিযোদ্ধা জর্জ কার্পেন্তিয়ে-কে ঘাড়ে ক'রে নিয়ে চ'লে গেলো। বন্ধুটি বললেন, 'দেখলে, আনাতোল! স্বয়ং আনাতোল ফ্রাঁসের গা ঘেঁষে এতগুলো লোক চ'লে গেলো— কেউ একটু লক্ষ্য করলো না!' ফ্রাঁস মুচকি হেসে জবাব দিলেন, 'তা-ই ভালো, বন্ধু। ওরা যদি আমাকে ও-রকম ঘাড়ে ক'রে নিয়ে প্যারিসের রাস্তা টহল দিতো, তাহ'লে লজ্জার সীমা থাকতো না।'

খেলোয়াড় কি ফিল্ম-স্টার (কি রাজনৈতিক) জনতার কাছে যে গরম-গরম হাততালিটা পান তাতে কারো আপত্তি নেই। এঁদের পেশাই এমন যে তাতে সাময়িক, সংঘবদ্ধ উত্তেজনা চরমে এসে ঠেকে। আধুনিক স্পোর্টস-এর বিরুদ্ধে আমার আপত্তি প্রধানত নৈতিক। স্পোর্টস ব্যাপারটাই পৃথিবীর সেই সংখ্যায় নগণ্য শ্রেণীর জন্য, বিত্ত যাদের অনুপার্জিত ও অবসর প্রচুর; শাদা কথায় বলতে গেলে, খেটে যাদের খেতে হয় না, তাদেরই নানারকম ক্রীড়া না-হ'লে চলে না, কারণ কিছুটা শারীরিক ব্যায়াম ভিন্ন স্বাস্থ্যরক্ষা অসম্ভব। খিদে না-থাকলে ভোজের আয়োজন ব্যর্থ, শরীর ক্লান্ত না-হ'লে পালকের বিছানায় শুয়ে ছটফট করাই সার; তাছাড়া শুয়ে ব'সে হাই তুলে সময়ও কাটে না; সময় কাটাবার (ইংরিজিতে হ'লে বলতুম সময় বধ করবার) বিবিধ সুখকর উপায়ের মধ্যে স্পোর্টস অন্যতম। আমার কথার খুব ভালো উদাহরণ গল্‌ফ্‌ খেলা। স্কচ ভূস্বামীরা কোনো-এক কালে ব্যায়ামস্বরূপ মাঠে-মাঠে হেঁটে বেড়াতেন, কিন্তু মিছিমিছি হেঁটে বেড়াতে নীরস লাগে ব'লে এই গল্‌ফ্‌ খেলার (যদি একে খেলা বলা যায়) উদ্ভাবন হ'লো; প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে আত্মতাড়িত একটি ক্ষুদ্র গোলকের অনুধাবন ক'রে ডিনারের উপযুক্ত খিদে এবং ঘুমোবার আন্দাজ ক্লান্তি নিয়ে বাড়ি ফেরা যায়, সময়টাও নেহাৎ মন্দ কাটে না। এ-কথা সহজেই বোঝা যায় যে গুহা-যুগে কি আদিম কৃষি-যুগে ক্রীড়ার কোনো প্রয়োজনই মানুষ বোধ করতো না; সকলকেই যখন বুনো জানোয়ার মেরে, কিংবা লাঙল ঠেলে

জল টেনে কাঠ কেটে আহারের সংস্থান করতে হ'তো, তখন মানুষের কাজেই ছিলো যথেষ্ট ব্যায়াম। আদিম কৃষিযুগ পার হ'য়ে বেচা-কেনার যুগ যেই এলো, অমনি মানুষের সমাজে গ'ড়ে উঠলো দুটি শ্রেণী—অগণ্য যারা কাজ করে, আর নগণ্য যারা ভোগ করে, প্রভু ও দাস, ধনী ও দরিদ্র। স্বতন্ত্রভাবে ব্যায়াম নামক বস্তুটির তখনই প্রবর্তন হ'লো; যারা ব'সে খেয়েই জীবন কাটাবে, তাদের স্বাস্থ্যরক্ষা এবং আমোদের জন্য উদ্ভাবিত হ'লো বিবিধ রোমাঞ্চকর ক্রীড়াকাণ্ড। সভ্যতার প্রাথমিক অবস্থায় শারীরিক ক্রীড়ার অধিকাংশই ছিলো রণক্ষেত্রের সারসংকলন, কেননা উচ্চশ্রেণীর উপযোগী পেশা যুদ্ধ ছাড়া আর দ্বিতীয় ছিলো না। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে এমন অনেক রকম কাজ দেখা দিলো যাতে শরীরের পরিশ্রম কিছুই নেই, মুষ্টিমেয় রাজা-রাজড়ার জায়গা দখল করলো বিপুল একটি বণিকশ্রেণী, আর তারই ফলে ক্রীড়ার রক্তপিপাসা ক'মে গিয়ে ব্যাপ্ত হ'লো তার প্রতিপত্তি। আসরে এলো সুসভ্য স্পোর্টস। স্বতন্ত্রভাবে শারীরিক ব্যায়ামে যাদের প্রয়োজন তাদের সংখ্যা যত বাড়লো, আধুনিক স্পোর্টস ততই হ'লো বিচিত্র, স্ফীতকায়, প্রতিষ্ঠাবান। অবশ্য আজকের দিনেও ভারতীয় কুলি কিংবা চৈনিক রিকশওলাকে অজীর্ণরোগ দমন করার জন্য টেনিস খেলতে হয় না, বাঙালি ডেপুটিবাবুর হয়, এমনকি তাঁর গিন্নিরও দু-সেট পিংপং না-খেললে ভাত হজম হয় না।

এ পর্যন্ত অবশ্য আপত্তির কিছু নেই। শারীরিক শ্রম থেকে যন্ত্র মানুষকে যত বেশি মুক্তি দেয় ততই ভালো। শুধু

পণ্যোৎপাদনের নয়, গৃহস্থালির কাজেও যন্ত্রকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে পশু-শক্তি বিদায় নিক। কলে জল পড়ুক, কলে আগুন জ্বলুক, কল এসে ঘর ঝাঁট দিক। দৈনন্দিন কাজ থেকে শারীরিক শ্রম যখন ক্রমশ অপসৃত হচ্ছে, তখন স্বতন্ত্রভাবে শারীরিক ব্যায়ামের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, এবং সে-ব্যায়াম সুখকর হ'লেই ভালো। স্পোর্টস-এর সার্থকতা শুধু এইখানেই। এ ছাড়া ঐ বস্তুটিতে আর যে-সব গুণ আরোপিত হ'য়ে থাকে, সে-গুণ গাইবার একমাত্র জায়গা স্কুলপাঠ্য কেতাব। চরিত্রের দিক থেকে খেলোয়াড়রা অন্যান্য মানুষের চাইতে বড়ো এ-কথা নিতান্তই হাস্যকর; এবং ইংরেজ শাসকশ্রেণীর মতে যে খেলোয়াড়মাত্রেই ভদ্রলোক, এমনকি, ইংরেজি ভাষায় স্পোর্টসম্যান কথাটার মানে পর্যন্ত ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে গেছে, তার কারণ বোধহয় এ ছাড়া কিছু নয় যে সাধারণত বিত্তশালী ব্যক্তিরাই খেলোয়াড় হ'য়ে থাকেন।

তাহ'লে যা আপত্তিকর তা আসলে, স্পোর্টস নয়, স্পোর্টস সম্বন্ধে আধুনিক সভ্য জগতের মনোভাব। যে-মূঢ় স্পোর্টসভক্তি আজকের দিনে সর্বব্যাপী, তা আধুনিক সভ্যতার অসুস্থতারই একটা নিদর্শন। অবশ্য পৃথিবীর কর্মহীন শ্রেণী অনেক আগেই আবিষ্কার করেছিলো যে শুধু খেলতে নয়, খেলা দেখতেও বেশ মজা লাগে; তাই একটি খেলোয়াড়গোষ্ঠীর সৃষ্টি করতে তাঁদের দেরি হয়নি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজন্যবর্গ সপরিবারে যে-সব খেলা দেখে হাততালি দিতেন, খুন জখম ছিলো তার অপরিহার্য অঙ্গ; ক্ষুধিত

সিংহের মুখে জ্যান্ত মানুষ ছেড়ে দেয়াকেও কিছুই তাঁরা মনে করতেন না। যদিও বক্সিং-এ, কিংবা আমেরিকার রগবি খেলায়, মৃত্যুর আশঙ্কা অনুপস্থিত নয়, এবং জখম প্রাত্যহিক ঘটনা, এবং স্পেনদেশে বৃষ-যুদ্ধের শোণিতমত্ততা আজও যদিও স্মৃতিমাত্রে পরিণত হয়নি, তবু মানতে হয় যে আধুনিক যুগের ক্রীড়াকাণ্ড সভ্য হয়েছে। শারীরিক স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য, যা সর্বদাই মনোহর, কোনো-কোনো কসরতে খুব বেশি ক'রেই পরিস্ফুট হয়; কোনো-কোনো খেলায় নিছক দেহবল ছাড়া কলাকৌশলেরও একটা দিক আছে; আর নৈপুণ্যকে— তা যে-কোনো রকমেরই হোক—কিছু মূল্য দিতেই হয়। সার্কাসে যারা ট্র্যাপিজের খেলা দেখায়, তাদের নৈপুণ্য পৃথিবীর কোনো কাজেই লাগে না, কিন্তু দর্শকের গ্যালারিতে ব'সে অতি বড়ো দার্শনিকেরও বাহবা না-দিয়ে উপায় থাকবে না। সবচেয়ে দুঃখের কথা তো এটাই যে আধুনিক স্পোর্টস-এ নৈপুণ্যের মূল্য ক্রমশই ক'মে যাচ্ছে। তা-ই যদি না হবে, তাহ'লে জুয়োখেলার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান যে-ঘোড়দৌড়, তা স্পোর্ট ব'লে সম্মানিত হবে কেন। ঘোড়দৌড় মানে শুধু যদি নৈপুণ্যের প্রতিযোগিতা, তাহ'লে জুয়োর লেজটুকু আবার কেন? অথচ ঐ লেজটুকু না-থাকলে এত রকম অসংখ্য মানুষ তাতে উৎসাহী হ'তো না, এ-কথাও নিঃসন্দেহে বলা যায়। ভেবে দেখতে গেলে, বিশুদ্ধ এবং মনুষ্যোচিত স্পোর্টস-এর চর্চা একমাত্র গ্রীকদের মধ্যেই ছিলো; তাদের ক্রীড়া ছিলো নানারকম শারীরিক নৈপুণ্যেরই প্রদর্শনী, এবং তাদের ব্যায়াম-বীরদের পুরস্কার ছিলো—টাকা নয়, চাকরি নয়,

খেতাব নয়—একটিমাত্র লরেল পাতা। কোনো-কোনো বিষয়ে যে গ্রীক সভ্যতা আজও অতুলনীয় তার একটা প্রমাণ এই যে প্রাচীন গ্রীসের অলিম্পিক ক্রীড়ায় শুধু শারীরিক কসরতেরই নয়, সাহিত্যিক ও সাংগীতিক প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা থাকতো।

আমি বলি না যে আধুনিক ক্রীড়ায় নৈপুণ্যের কোনো স্থান নেই। কিন্তু সে-নৈপুণ্য এমন নয় যাতে তার পূজা করা চলে। তবু সমগ্র পাশ্চাত্ত্য জগৎ (আর সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও) আজ স্পোর্টস-পূজারি। রাসেল একটি প্রবন্ধে লিখেছেন যে মার্কিন জনসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির যে-কোনোরকম উৎকর্ষকেই সন্দেহ এবং ঈর্ষার চোখে দেখে থাকে, কিন্তু শারীরিক উৎকর্ষ যার আছে, সে একবাক্যে দেবতুল্য। খেলোয়াড়কে তারা ঈর্ষা করে না, বরং পূজা করে; কিন্তু শারীরিক ভিন্ন অন্য যে-কোনোরকম অ-সাধারণত্ব (অন্তত নিজের দেশের লোকের মধ্যে) সহজে তারা সহ্য করে না। মগজের চাইতে পেশীর প্রতি শ্রদ্ধা তাদের ঢের বেশি। রাসেল অবশ্য বলতে চান যে ইওরোপের অবস্থা ও-রকম নয়, কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায় যে তফাৎটা শুধু মাত্রার। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় আসলে ডন-কসরতের আখড়া মাত্র, এই ঠাট্টার পিছনে অনেকখানি সত্য আছে। ক্ল্যাসিক্স-এ ডবল-ফার্স্ট নিয়ে যে-ছেলে বেরোলো তার খোঁজ কে বা রাখে, কিন্তু একজন অক্সফোর্ড ব্লু সমস্ত বৃটিশজাতির প্রণয়পুত্তলি। অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের বাচখেলা, ঈটন-হ্যারোর ক্রিকেট ম্যাচ—এগুলো মর্যাদায় খাটো শুধু

ডর্বি দৌড় আর টেস্ট-ম্যাচের তুলনায়; সমস্ত জাতি তৃষিত নয়নে এই দুই 'ঐতিহাসিক' ঘটনার দিকে তাকিয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয়তম অধ্যাপক যিনি, তাঁর চেয়ে সাধারণের চোখে বাচ-খেলার কাপ্তানের মান হাজারগুণ বেশি। খবর-কাগজে, সিনেমায়, রেডিওতে এ-সব ঘটনা নিয়ে হুলুস্থূল আলোড়ন চলতে থাকে; কিন্তু বিদ্যার, বুদ্ধিবৃত্তির, প্রতিভার পরিচয় ঐ বিদ্যালয়েই যারা দিচ্ছে, তাদের সম্মান খুব বেশি হ'লে কৃপণ একটা স্কলারশিপেই শেষ। শিল্পে কিংবা বিজ্ঞানে যাঁরা কর্মী, যাঁদের না-হ'লে সভ্যতা অচল, জনসাধারণ তাঁদের সকলের নাম পর্যন্ত জানে না; এদিকে একটি কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা একটি দ্রুত-নিক্ষিপ্ত গোলকে যে বারংবার আঘাত করতে পারে তার নাম চিন থেকে পেরু পর্যন্ত আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে। এতে মাত্রাজ্ঞানের শুধু নয়, কাণ্ডজ্ঞানেরও অভাব সূচিত হয়। বলা বাহুল্য, এই মনোবৃত্তিতে আমাদের দেশেরও সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আজ কলুষিত। এমন ছেলে, মস্তিষ্কের কিছুমাত্র পরিচয় যে কোনোদিনও দেবে না, তাকে, এমনকি তার অভদ্রতাও, যে-কোনো বিদ্যালয় সহ্য করবে; শুধু তা-ই নয়, রীতিমতো খাতির ক'রে বছরের পর বছর তাকে আশ্রয় দেবে (কেননা, অনেক ক্ষেত্রে, স্বেচ্ছায় না-ছাড়লে স্বাভাবিক নিয়মে তার বিদ্যালয় থেকে বেরোবার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না), যেহেতু সে হয়তো একটা বায়ুস্ফীত চর্মপিণ্ডকে পদাঘাতে প্রান্তর-পারে পাঠাতে পারে। অথচ সেই বিদ্যালয়েই বিদ্যাচর্চায় যারা কৃতী, অবজ্ঞাই

তাদের সাধারণ ভাগ্য। হয়তো লাইব্রেরিতে বই আনাবার টাকা নেই, ল্যাবরেটরি অসম্পূর্ণ, কিন্তু স্পোর্টস-এর জন্য মোটা টাকা আছে বাঁধা। যদি ছাত্রদের স্বাস্থ্যরক্ষাই উদ্দেশ্য হ'তো, তাহ'লে এই ব্যয়সাপেক্ষ ক্রীড়াবিলাস কখনোই প্রশ্রয় পেতো না। আর যদি শারীরিক নৈপুণ্যলাভের কথা ওঠে, তাহ'লে বলতে হয় যে যে-প্রতিষ্ঠানের নাম বিদ্যালয়, তার কাছে এটুকু কি আশা করা যায় না যে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চাই সেখানে প্রধান হবে?···কিন্তু আমার এই প্রশ্ন শুনে অনেকে হয়তো রেগেই যাবেন, কারণ আজকের দিনে অন্য যে-কোনো বিদ্যার তুলনায় স্পোর্টস-এর সামাজিক মর্যাদা এবং আর্থিক মূল্য দুটোই ঢের বেশি। ঠিক কথা, আর ঠিক সেখানেই আমার আপত্তি।

১৯৩৯

# মেক-অপ-এর বিপক্ষে

কমলা রঙের বেঁটে ছাতা মাথায় ইনি ট্র্যামের জন্য অপেক্ষা করছেন। পরনে হালকা-নীল জর্জেট, নগ্ন ব্রাউন বাহু রোদে ঝলসাচ্ছে। সব মিলিয়ে তীক্ষ্ণ একটি পরিচ্ছন্নতার ছবি। ইনিই আধুনিকা বাঙালিনী। আপনি তো এঁকে চেনেন। কতবার দেখেছেন এঁকে, ট্র্যামে, বাস্‌-এ, সিনেমায়, ড্রয়িংরুমে চায়ের পার্টিতে। এঁর ঈষৎ কৃত্রিম কথা বলার ধরন আপনার মুখস্থ, এঁর অত্যন্ত সচেতনরকমের লীলায়িত ভঙ্গি আপনার চেনা। এই মুহূর্তে অবশ্য কমলা রঙের ছাতায় এঁর মুখটি ঢাকা পড়েছে, কিন্তু আপনি জানেন যে সে-মুখ খুব যত্ন নিয়ে আঁকা, প্রথম দেখলে সুন্দর ব'লে ঠেকবেই। ট্র্যাম এলো শোঁ-শোঁ শব্দে, ট্র্যাম দাঁড়ালো, ছাতা বন্ধ ক'রে ইনি উঠলেন। প্রথমে আপনার চোখে লাগলো অভিনব কেশবিন্যাস, তারপর পেন্সিলে-আঁকা ভুরু, রুজ-রঞ্জিত গাল, লিপস্টিকে লাল-রাঙানো ঠোঁট। আপনিও উঠলেন সেই ট্র্যামে, হয়তো এঁর কাছাকাছি কোনো আসনে বসতে পেলেন, একটু পরে ইনি যখন টেরচা ছাঁদের ব্যাগের মুখ খুললেন, তখন লক্ষ্য করলেন এঁর ম্যাজেণ্টা রঙের সূক্ষ্ম ত্রিকোণ নখরশ্রেণী। এখানে হয়তো দৈবাৎ আপনার চোখোচোখি হ'য়ে গেলো এঁর সঙ্গে, লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিতেই দেখলেন, ফিকে গোলাপি রঙের স্যাণ্ডেলের

ফাঁক দিয়ে এক সার টুকটুকে লাল পদাঙ্গুলি উঁকি দিচ্ছে। সবই দেখলেন; মানে, এটুকু দেখলেন যে এঁর মেক-অপে কোনো ত্রুটি নেই; সত্যি ইনি দেখতে কেমন সে-বিষয়ে কিছুই জানলেন না।

আমি এতদূর সেকেলে যে মেক-অপের গুণগ্রাহী আমি হ'তে পারি না। যখন দেখি এই প্রথা আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে দিনে-দিনে ছড়াচ্ছে, তখন তীব্র আপত্তি করার একটা ঝোঁক সামলানো শক্ত হয়। আপত্তি ওঠে নীতিজ্ঞান আর সৌন্দর্যবোধ দু-দিক থেকেই। আমার মনে হয় শ্বেতাঙ্গিনীরা তাঁদের বর্ণের দারিদ্র্য লুকোবার জন্যই রং মাখা ধরেছেন। ভাবতে অবাক লাগে যে পশুদের মধ্যে শ্বেতবর্ণ একটা ব্যাধি, অন্তত একটা গুরুতর অভাব ব'লে বিশেষজ্ঞরা গণ্য ক'রে থাকেন, অথচ মনুষ্যসমাজে বহুদিন ধ'রে এই কুসংস্কার প্রচলিত যে শাদাই শ্রেষ্ঠ গাত্রবর্ণ। মংগো পার্ক প্রথম যখন আফ্রিকায় ঢোকেন, কাফ্রিরা তাঁর শ্বেতচর্মরূপ রোগের জন্য দস্তুরমতো ওষুধ বাৎলে দিয়েছিল তাঁকে। ভাবুন একবার, বর্নার্ড শ-র ঈশ্বরান্বেষী নিগ্রো যুবতী রঙের রসায়নের কী তোয়াক্কা রাখে! তাকে সৌন্দর্যচর্চার পরামর্শ দিতে গেলে সে তার আশ্চর্য দাঁত দেখিয়ে খিলখিল ক'রে হেসে উঠবে কোঁকড়া কালো মাথা দুলিয়ে। আর কপালগুণে ভারতীয় মেয়েরাও যখন স্বভাবতই রঙিন, তখন বিলিতি দোকান থেকে কৃত্রিম লাল-হলদে কিনে আনবার তাঁদের কোন দরকার? ও-সব জিনিশে সত্যি কি তাঁদের সৌন্দর্য বাড়ায়, না তাঁদের

স্বাভাবিক সুন্দর ব্রাউন রং নষ্ট ক'রে ফেলে মাত্র, এ-প্রশ্ন [illegible] মনে ওঠে। সহজবুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে এ-কথাই মনে হয় যে ভারতীয় মেয়েরা তাঁদের স্নিগ্ধ চিক্কণ শ্যামল রংটিকেই সগর্বে প্রকাশ করবেন; প্রকৃতির অবিচারে নেহাৎই যাঁদের শাদা না-হ'য়ে উপায় নেই, তাঁদেরই জন্য সৌন্দর্যের এই দোকানদারি চলতে থাক।

কিন্তু ফ্যাশনের দাবি মেটাতেই হবে; দেখতে-দেখতে আমাদের মেয়েদের ড্রেসিং টেবিল 'রূপসজ্জার উপাদানে' ভ'রে উঠলো। কেউ তারা এসেছে লণ্ডন, প্যারিস কি নিউ ইঅর্ক থেকে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হ'য়ে, কেউ বা বিলেতির নকল করা মেকি-স্বদেশি। এ-সব জিনিশ যাঁরা তৈরি করেন এই হুজুগের পুরস্কার তাঁরা হাতে-হাতেই পাচ্ছেন মোটা মুনফায়; হুজুগের সলতেটি উশকে রাখার জন্য তাঁদের চেষ্টারও বিরাম নেই। নিত্য-নতুন 'সৃষ্টি' করছেন তাঁরা; শ্রীমতীর হাতের, ঘাড়ের, আঙুলের, চোখের, নখের জন্য পাঁচশো 'স্পেসিফিক' বাজারে বিষম ঠেলাঠেলি লাগিয়েছে। দেহের প্রত্যেক অংশের জন্য আলাদা-আলাদা মলম প্রস্তুত; ভুরু আর চোখের পল্লব তো ইচ্ছেমতো তৈরি করা যায়, আর যে-সব মেয়ে সত্যি-সত্যি স্মার্ট হ'তে চান, নখের যত্নে তাঁদের নাকি বিস্তর সময় যায়, এ-রকম জনরব শুনেছি। স্বীকার করতেই হয়, এই অধ্যবসায়ের ফল কখনো-কখনো ভালো হয়; কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা হয় না; বিশেষত, এই অভিনব অঙ্কনবিদ্যায় যাঁরা নিপুণ নন, তাঁরা দর্শককে চমৎকৃত করেন

একটু ভিন্ন অর্থে। মোটের উপর, মেক-অপ করতে গিয়ে অনেকেই স্বাভাবিক রূপটুকু হারান, বিনিময়ে কিছুই পান না। কিন্তু মেক-অপ যখন উংরেও যায়, যখন একজন মেয়েকে রং মাখলে সত্যি বেশি সুন্দরী ব'লে বোধ হয়, সেখানেও আপত্তি ওঠে নীতির দিক থেকে। চমৎকার মেক-অপ-করা একটি মেয়েকে যখন দেখি, তখন অতি সুন্দর একটি মুখোশ মাত্র দেখি, তার মুখ চোখেই পড়ে না। এ যেন নিজেকে অন্য কেউ ব'লে চালাবার চেষ্টা। (সমস্ত চেহারাটাই মিথ্যা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এ হ'লো গিয়ে 'চেহারার উপর জালিয়াতি'।) দশ বছর ধ'রে রোজ সন্ধ্যাবেলা যদি আপনি সেই মেয়েটিকে দেখেন, তবু আপনি এটুকুও জানবেন না সে ফর্শা না কালো। দৈবাৎ যদি কখনো তাকে নিজের বাড়িতে দেখে ফেলেন এমন-কোনো সময়ে, যখন পর্যন্ত সে মুখোশ আঁটবার সময় পায়নি, তাহ'লে মোহমুক্তির যে-আঘাত লাগবে তা আপনি যদি-বা সহ্য করতে পারেন মেয়েটি কখনো সামলে উঠতে পারবে না। আর আপনার সঙ্গে তার চেনাশোনার ওখানেই হবে শেষ।

এর উত্তরে মেক-অপ-এর পক্ষপাতী কেউ হয়তো বলবেন: আপনি বলছেন এতে মেয়েদের সত্যিকার চেহারা ঢাকা পড়ে, সর্বদা সতর্ক থাকতে হয় মুখোশের ফাঁক দিয়ে কেউ যাতে উঁকি দিতে না পারে। বেশ। মেক-অপ-এর ধার ধারে না এমন একটি মেয়ের কথা ধরা যাক। আপনি কি তারই সত্যিকার চেহারা দেখতে পান? সত্যিকার চেহারা বস্তুটাই বা কী? চিরকাল মেয়েরা শরীরের

সৌন্দর্য বাড়াবার চেষ্টা করেছে নানা উপায়ে। কোনো বাধা মানেনি, প্রকৃতিকে যথাসম্ভব ব্যবহার করেছে, অজস্র অর্থ উড়িয়েছে এর পিছনে। সুন্দর হবার জন্য—অর্থাৎ নিজের দেশে ও কালে প্রচলিত সৌন্দর্যের ধারণার সঙ্গে নিজেকে মেলাবার জন্য—এমন-কোনো কষ্ট নেই যা হাসিমুখে না-মেনে নিয়েছে। রোমের রানিরা গাধার দুধে স্নান করেছেন; কালিদাসের পাণ্ডুর মেয়েরা বিবিধ বনজ থেকেই প্রসাধনের সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করেছেন; চীনে মা কন্যাকে নিষ্ঠুর কষ্ট দিতে দ্বিধা করেননি পা ছোটো হবে ব'লে, কত যুগ ধ'রে জাপানি মেয়েরা শক্ত কাঠের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়েছে, পাছে খোপা নষ্ট হয়। বর্বর জাতিদের মধ্যে যে-সব বিশাল অধর ও নিতম্ব এখনো দেখা যায়, তা সভ্য স্ত্রীলোকের অলংকার ও প্রসাধনেরই শামিল। এ-সব ভাবলে আধুনিকাকে বরং এ-কারণে প্রশংসাই করতে হয় যে সৌন্দর্যের খাতিরে শরীরের কোনো কষ্ট সইতে বা অঙ্গের কোনো বিকৃতি ঘটাতে তিনি নারাজ। রুজ লিপস্টিক যদি আপনি অপছন্দ করেন, তাহ'লে সাবান পাউডরও অসহ্য হওয়া উচিত—এমনকি, আলতা সিঁদুর বর্জনের জন্যও আন্দোলন শুরু করতে পারেন। কোনটা কৃত্রিম নয়? পান খাওয়াটাও তো অনেক ভারতীয় মেয়ের পক্ষে ঠোঁট লাল করারই একটা উপায় মাত্র। একবার এক ভদ্রলোক বেশ বলেছিলেন যে বিলিতি মেয়েদের ঠোঁটে রং চড়াতে হয় সুদ্ধু এই কারণে যে তারা পান খায় না। খোঁপায় ফুল-গোঁজা সাঁওতাল মেয়ে কি ঠিক ততটাই মেক-অপ ব্যবহার করেনি, যতটা করেছে সান্ধ্য

সমারোহে সজ্জিত শ্বেতাঙ্গিনী? আপাতরূপসী হবার ইচ্ছা দু-জনেরই সমান; সাঁওতাল মেয়েটির উপকরণ যে কম তারও কারণ তার সংযম নয়, তার জীবনপরিধির সংকীর্ণতা।

স্বাস্থ্য ও সুরুচির কোথায় শেষ আর কোথায় আত্মবিজ্ঞাপনের আরম্ভ তা নির্ধারণ করা অবশ্য সোজা নয়। যদি বলি যে আজকালকার দিনে সাবানটা প্রয়োজন, কিন্তু রুজটা অনায়াসে বাদ দেয়া যায়, তাহ'লে তক্ষুণি হয়তো জবাব শোনা যাবে যে আমাদের পিতামহগণ সাবানটাকেও সুনজরে দেখেননি, এবং সভ্যতা মানেই বাহুল্যের বংশবৃদ্ধি। আমাদের বাড়িঘর, কাপড়-চোপড়, আসবাবপত্র, এমনকি আমাদের খাদ্যেও এমন অনেক কিছুই আছে, যা বাহুল্য, যদি বাহুল্য বলতে আমরা সেই জিনিশই বুঝি, সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকতে যা অপরিহার্য নয়। যে-কাপড় আমরা পরি, যে-বাসনে আমরা খাই, যে-আসনে আমরা বসি, যে-বাড়িতে আমরা থাকি তা দেখতে যাতে সুন্দর হয় তা নিয়ে আমাদের এত দুর্ভাবনা কেন? নিছক ব্যবহারের জিনিশকেও সুন্দর ক'রে গড়া সভ্যতারই একটা লক্ষণ। যা-ই বলুন না, মেয়েরা—এমনকি পুরুষরাও—সর্বদাই চাইবেন যাতে তাঁদের যথাসম্ভব সুন্দর দেখায়; আর এ-কথা যদি সত্য হয়, তাহ'লে মেক-অপ-ভূষিতা আর মেক-অপ-বিহীনায় যে-তফাৎ, সেটা জাতের নয়, শুধু মাত্রার।

এ-কথার উত্তরে বলবার আছে যে মেক-অপ-এর একটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকও আছে। যে-ফুল প্রকৃতির দান, তা তুলে খোঁপায় গুঁজলে হৃদয়ের একটি স্বতঃস্ফূর্ত

আনন্দ প্রকাশ পায়, তাতে কারো সঙ্গে প্রতিযোগিতার ভাব নেই, অন্যদের উপর 'টেক্কা দেবার' লুক্কায়িত ইচ্ছা নেই। তার সঙ্গে কি তুলনা হয় রাসায়নিক রঙের সচেতন চাতুরীর? বোতলে-ভরা সৌন্দর্যের পিছনে সারা পৃথিবী ভ'রে আজ যে-পরিমাণ অর্থ এবং সময়ের ব্যয় হচ্ছে তার বিষয়ে ভাবতে গেলে মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই হতাশ হ'তে হয়। এ কি ভয়ানক কথা নয় যে মুখোশ পরতে আর মুখোশ খুলতেই একটি আধুনিক মেয়ে তাঁর জীবনের এক তৃতীয়াংশ কাটিয়ে দিচ্ছেন! মার্কিন দেশে 'সৌন্দর্যে'র ব্যবসা এতই জাঁকিয়ে উঠেছে যে সে-দেশের বাণিজ্যবিভাগে তার স্থান প্রায় মোটর গাড়ি সিনেমার পরেই। অন্য সব জিনিশের মতো সৌন্দর্যের কারখানা খোলা হয়েছে দেশে-দেশে; সৌন্দর্যের দোকান আছে রাস্তার মোড়ে-মোড়ে, যেখান থেকে, উপযুক্ত মূল্য দিতে পারলেই, যে-কোনো নারী নাকি একেবারে ঠিক মনের মতো চেহারাটি নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারেন, পাকপ্রণালীর মতো সৌন্দর্যপ্রণালীরও বইয়ের অভাব নেই। এই সৌন্দর্যব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপন অনুসারে রূপচর্চার সমস্ত অনুষ্ঠান পালন করতে গেলে ঘুমোনো ছাড়া আর প্রায় কোনো কাজেরই সময় থাকে না। মেক-অপ আগে ছিলো অভিনেতার প্রয়োজনীয় শিল্প, এখন তা প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই 'জন্মগত অধিকার'—বিজ্ঞাপনের ভাষা চুরি ক'রে বলছি। আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট ভালো হ'লেই হ'লো। কোঁকড়া চুল, গালের টোল, ঝকঝকে চোখ, চকচকে নখ, ছিপছিপে হালকা গড়ন, মানানসইরকম গায়ের রংটি—সবই আজকাল কিনতে

পাওয়া যায়। সৌন্দর্য পোরা হচ্ছে টিনে, ভাঁড়ে, শিশিতে, বোতলে; টুকরো ক'রে কেটে তার গায়ে এঁটে দেয়া হচ্ছে কত রকম জমকালো নামের লেবেল, আর সবার শেষে উপযুক্তরকম চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে বাজারে। এই টাকা, সময় ও পরিশ্রম দিয়ে কী না করা যেতো! পৃথিবীটাকে বদলে দেয়া যেতো—যদি আমরা তা-ই চাইতাম। কিন্তু এ-বিষয়ে শেষ কথা তো ম্যাক্স বিঅরবোম অনেক আগেই বলেছেন—'Nay, but it is useless to protest'—প্রতিবাদ নিষ্ফল।

১৯৩৮

# হরিবোল

মক্ষিরানি মানুষটা কিছু ভিতু স্বভাবের। অথচ তাঁর ভয়টা আধিভৌতিক নয়, তাকে বলা যেতে পারে আধা-ভৌতিক। ইঁদুর, আরশোলা, টিকটিকি, এমনকি মোটাসোটা, কালোকেলো, শুঁড়-বের-করা বিছে দেখলেও তাঁর মুখ নীল হ'য়ে যায় না, ভব্যতা ভুলে এক লাফে তিনি খাটে চ'ড়েও বসেন না; বরং উপযুক্ত অস্ত্র হাতে উক্ত জীবটিকে তাড়না করেন এবং সম্ভব হ'লে বধ করেন। নির্জন জনপদে ডাকবাংলোয়, কিংবা অচন্দ্র নৈশ পথে গোযানে, কাল্পনিক বাঘ, সাপ, চোর কিংবা ডাকাতের ভয়ে আত্মহারা হ'তে তাঁকে দেখিনি। কোনো বিষয়ে কারো সঙ্গে মতদ্বৈধ হ'লে স্পষ্ট ও অদ্ব্যর্থ ভাষায় আপন অভিমত এমন নির্ভয়ে তিনি ব্যক্ত করেন যে দেখে-শুনে আমার রীতিমতো ঈর্ষা লাগে। আমার সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনায় স্বমতঘোষণার চর্চা তিনি এমন নিয়মিতভাবে ক'রে থাকেন যে এই শেষোক্ত বিষয়ে তাঁর বিশেষ একটু দক্ষতাই জ'ন্মে গেছে।

কিন্তু ভৌতিক ব্যাপারে ভয় তাঁর দুর্দান্ত। বাস্তব যতক্ষণ ইন্দ্রিয়ের এলাকার বাইরে আছে, অর্থাৎ যতক্ষণ আমরা তাকে দেখছি না, শুনছি না, ছুঁচ্ছি না, ততক্ষণ সে খুব কাছাকাছি থাকলেও তাকে নিশ্চিন্ত মনে ভুলে' থাকা যায়। কিন্তু যা কাল্পনিক, কল্পনা যে-কোনো সময়ে যে-কোনো স্থানে

তাকে সৃষ্টি ক'রে নিতে পারে, সুতরাং তার বিরুদ্ধে কিছুই করবার নেই। এমনি কোনো অলৌকিক ভয়ের কাছে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে দেখেছি মক্ষিরানিকে। একটা ছায়া দেখে মূর্ছিত হ'য়ে পড়া তাঁর পক্ষে কিছুই নয়, কেননা ও-ছায়া যে কোনো বস্তুর ছায়ামাত্র, তা তাঁর মনের বিশেষ কোনো অবস্থায় কিছুতেই প্রতীয়মান হবে না।

যেটা অলৌকিক, যেটা ইন্দ্রিয়ের অতীত, যেটা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বহির্ভূত, তার প্রতি কোনো-কোনো চিত্তের একটা স্বাভাবিক উন্মুখতা থাকে। তাছাড়া, বাইরের কোনো-কোনো ঘটনাও মনের মধ্যে এই আতঙ্ক-আবিল অস্বাস্থ্য ঘনিয়ে তুলতে সাহায্য করে। অনেক রাত পর্যন্ত শুয়ে-শুয়ে ভূতের গল্প পড়ার পর আলো নিবিয়ে তৎক্ষণাৎ মহা আরামে নিদ্রা যেতে পারেন, এমন বীরপুরুষ কেউ কি আছেন? কিংবা বর্ষার রাতে নিবু-নিবু আলোয় দল বেঁধে গোল হ'য়ে ব'সে কারো মুখে লোমহর্ষক গল্প শুনছি, হঠাৎ সিগারেট আনতে পাশের অন্ধকার ঘরটায় যেতে হ'লে কেমন লাগে? ভিত্তিহীন ভয়ের বীজ আছে আমাদের সকলের মনেই, তবে সুখের বিষয় আমাদের সহজ স্বাভাবিক জীবনের রোদালো, জোরালো স্রোত তাকে প্রায় সব সময়ই চাপা দিয়ে রাখে। কিন্তু কখনো-কখনো আমাদের মনকে বাইরে থেকে এমনভাবে উত্তেজিত ক'রে তোলা সম্ভব যে জীবনের সহজ প্রসন্নতা থেকে স্খলিত হ'য়ে আমরা তখনকার মতো ভয়ের পিচ্ছিল চোরাবালিতে ডুবে যাই।

সেই ভয়ই ভয়ের রাজা যা অহেতুক। যে-ভয়ের কারণ

আছে তার সঙ্গে লড়াই চলে, কিন্তু যে নিষ্কারণ সে অপ্রতিরোধ্য। অল্প মাত্রায় হ'লে সেটা উপভোগ্য হ'তে পারে, কিন্তু যদি মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, মনুষ্যত্বের পক্ষে তার মতো হানিকর আর-কিছুই নয়। এই অহেতুক ভয়কে প্রবলভাবে উত্তেজিত করবার একটি বড়োরকমের যন্ত্র আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে—সেটি হরিধ্বনি। 'বোলো হরি, হরিবো—ল' এই আওয়াজ কানে যাওয়ামাত্র অনেকের মুখই ফ্যাকাশে হ'য়ে যেতে দেখেছি। এ-বিষয়ে মক্ষিরানির শ্রুতিকাতরতা অসামান্য। একবার আমরা একটা ফ্ল্যাটে ছিলুম, ঠিক কেওড়াতলা যাবার রাস্তার উপরে। সারাদিন—এবং সারা রাত—হরিধ্বনি শুনতে হ'তো। তখন মক্ষিরানির মধ্যে ভয়ের যে রক্তশোষক মূর্তি দেখেছি, সেই অভিজ্ঞতার ফলে ভয় সম্বন্ধে আমার রীতিমতো ভয় জ'ন্মে গেছে। সে-সময়ে মধ্যরাত্রে তাঁর মশারির পাশে প্রায়ই একটি শ্বেতবসনা মেমমূর্তি এসে দাঁড়াতো, এবং কোনো-কোনো রাত্রি আলো-জ্বলা বিনিদ্র উপবেশনে আমাদের কেটে গেছে। মানুষ যেহেতু অমর নয়, আর কলকাতার মতো বড়ো শহরে জন্ম-মৃত্যুর লীলা অনবরতই চলেছে, তাই শবযাত্রীর তারস্বরে আমাদের প্রতি রাত্রের আসন্ন নিদ্রা ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যেতো। মক্ষিরানি তাঁর আতঙ্ক-জ্বরের ডিলিরিয়মে যেন ঐ শব্দটির জন্যই কান পেতে থাকতেন—হরিধ্বনি যখন অনেক দূরে এবং অত্যন্ত ক্ষীণ তখন থেকেই সেটি কর্ণগোচর হ'তো তাঁর, ক্রমে যখন উচ্চতর ও বিকটতর হ'তে-হ'তে সেটি কাছে আসতো, তাঁর মুখ দেখে

বুঝতুম, একটি শেষ হ'য়ে যাবার পরে পরবর্তী ধ্বনিটির জন্য তিনি কণ্ঠাগত প্রাণে অপেক্ষা করছেন। তারপর ঠিক আমাদেরই বাড়ির তলাকার ফুটপাতে এসে কয়েকবার উচ্চতম ও বিকটতম ধ্বনিনির্ঘোষে ভয়ের অদেহী ক্লেদাক্ত সরীসৃপটাকে আমাদের ঘরের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে শববাহীরা আস্তে-আস্তে আমাদের কর্ণেন্দ্রিয়ের সীমার বাইরে মিলিয়ে যেতো। এ-ধ্বনিই যে এ-রাত্রির মতো শেষ, তা-ই বা কে বলবে? হয়তো নিতান্ত ক্লান্ত হ'য়ে একটু ঘুমোবার উদ্যোগ করছি, এমন সময়, যেন বোবায়-ধরা দুঃস্বপ্নের মধ্যে কানে এসে লাগলো, 'বলো হরি—হরিবোল—!' আবার আসছে। আবার উঠে বসা, আলো জ্বালা, কান পেতে চুপ ক'রে থাকা, যতক্ষণ না ধ্বনির শেষ রেশটুকু মিলিয়ে যায়। আর-কিছু করবার নেই।

বলা বাহুল্য, এ-ভাবে বেশিদিন চললো না, বাড়ি-বদল করতে হ'লো।

## ২

আমি নিজে হরিনাম শুনে হর্ষে, কিংবা হরিধ্বনি শুনে ভয়ে আত্মহারা হ'য়ে পড়ি না, কিন্তু ঐ দুই প্রকার গোলমালই আমার কানে অপ্রীতিকর ঠেকে। বোষ্টমের আখড়ায় যখন বীতকচ্ছ মুণ্ডিতশির প্রায়-পুরুষের দল বিরামহীন মর্মান্তিক একতানে হরি শব্দটি সহস্রাধিকবার উচ্চারণ করতে থাকে, সঘনশিরশ্চালনে তা থেকেও আনন্দের প্রতিভাস নিংড়ে বের করতে পারে এমন পুণ্যলোভী আমাদের দেশে নিশ্চয়ই

আছে। কিন্তু হরিধ্বনিটা কারো মনেই পুলক তোলে না, এ-কথা বোধ হয় জোর ক'রেই বলা যায়। মৃতদেহ সৎকারের যত রকম ব্যবস্থা পৃথিবীতে প্রচলিত আছে, তার মধ্যে হিন্দুর প্রথাই আমার সবচেয়ে ভালো লাগে। কবরটা কবিত্বগন্ধী, কিন্তু ওতে জমির বড়ো অপচয় ঘটে—জেমস জয়স-এর এক চরিত্র যে মনে-মনে ভাবছে যে কফিনগুলোকে খাড়া ক'রে পুঁতলেই তো হয়, তাতে কত জমি বাঁচে, এটা নেহাৎ মিথ্যে ভাবনা নয়। আর, এত ভালোবাসায় প্রতিপালিত এই দেহ মৃত্যুর পরে একটা কাষ্ঠাধারে বন্দী হ'য়ে ভূমিতলবর্তী অন্ধকারে ক্রিমিকীটের খাদ্য হবে, এ-কথা ভাবতে রীতিমতো ভয়াবহ বোধ হয়। তাছাড়া সকল শ্রেণীর সকল অবস্থায় লোকের মধ্যে মৃত্যু যে-একটি সমতা এনে দেয় তার অভাব ক্রিস্টিয়ান কবরখানায় পীড়াদায়ক। মৃত্যুর পরপারেও ধনী-নির্ধনের প্রভেদ সেখানে শ্বেতমর্মরের মসৃণ উচ্চতায় উদ্‌ঘোষিত—এমনকি কবরখানার বাছা-বাছা চতুষ্কোণগুলি ধনী ব্যক্তিরা মৃত্যুর বহু পূর্বেই আপন দেহরক্ষার জন্য কিনে রাখেন, এ-রকমও শুনেছি। টলস্টয় তাঁর একটি নিদারুণ নীতিকথায় প্রমাণ করেছিলেন যে ছ-ফুট মাত্র জমিতে মানুষের প্রয়োজন, কিন্তু হিন্দু মতে অতটুকু প্রয়োজনও মানুষের নেই; শুধু একজনের পক্ষে নয়, অনন্তকালের মানবসন্ততির পক্ষেই ছ-ফুট জমি যথেষ্ট।

দাহপ্রথা ভালো—কিন্তু হরিধ্বনি?

আমাদের নশ্বর দেহের অন্তিম শরণস্বরূপ আগুনের চাইতে মাটিই শ্রেয়, কোনো-কোনো বন্ধুকে এ-রকম মত প্রকাশ

করতে শুনেছি। এ-বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করলে হয়তো কারো কাছেই অপ্রাসঙ্গিক বোধ হবে না, কেননা আমাদের সকলকেই একদিন মরতে হবে। এ-কথা সত্য যে চিতার চাইতে কবরের আপাতশোভনতা বেশি, এবং ইংরেজি সাহিত্যে কবর অবলম্বন ক'রে যে-একটি স্মৃতিমন্থিত দীর্ঘশ্বাসবিজড়িত করুণ-মধুর রসস্রোত ব'য়ে চলেছে, তা আমাদের কাছে কবরকে আরো মনোরম করেছে। ম'রে গিয়েও আমরা-যে প্রিয়জনের স্মৃতিতে বেঁচে থাকতে চাই, এই ইচ্ছাটুকু যেন কবর তার বোবা বুকের মধ্যে লালন করে। 'আমাকে মনে রেখো'—এই কথাই দিল্লি আগ্রার সব বিখ্যাত কবরের মনের কথা, কিন্তু এ-কথাটুকু এমন সুন্দর সুসম্পূর্ণ হ'য়ে কোথাও ফোটেনি, না সেকেন্দ্রায়, না তাজমহলে, যেমন ফুটেছে জাহান-আরার কবরে। সেকেন্দ্রা কি তাজমহল বেঁচে আছে স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন হ'য়েই, কিন্তু খোলা আকাশের তলায় গুচ্ছ-গুচ্ছ সবুজ ঘাস বুকে নিয়ে জাহান-আরাই যেন বেঁচে আছেন, ঐ সরল অনাড়ম্বর রোদ-বৃষ্টি-হাওয়ায় ধোওয়া কবর আমাদের কানে-কানে যেন এই কথাই বলছে—'মনে আছে?'

কিন্তু কে-ই বা মনে রাখে? 'মৃত্যুরে কে মনে রাখে, মৃত্যু মুছে যায়।' কবি হ'য়ে, রাজা হ'য়ে ক-টা লোক আর জন্মায়। তার মধ্যেই বা ক-জন চিরকালের স্মরণীয় কিংবা বরণীয়! মরলোক থেকে যে স'রে গেলো, কালক্রমে তাকে ভুলে যাওয়াই তো স্বাভাবিক। যাকে অত্যন্ত ভালোবেসেছি তাকেও তো আমরা ভুলি। এটা লজ্জার কথা নয়, দুঃখের

কথা নয়, এটাই শুভ ও স্বাস্থ্যকর। প্রিয়জনের কবরের কাছটিতে মাথা নিচু ক'রে চুপ ক'রে বসি, একটি ফুল রেখে যাই, একটু চোখের জল ফেলি—কিন্তু সে আর ক-দিন? বছরের পর বছর কেটে যায়, জীবনের স্রোত থেমে থাকে না, শোক জীর্ণ হ'য়ে আসে, তার পরেও ঐ ফুল আর চোখের জল নিতান্তই একটা নিয়মরক্ষায় পর্যবসিত হয়, এবং নিয়ম ক'রে শোক করা নিজেকে অপমান, মৃত্যুকেও অপমান। তার চেয়ে ঢের ভালো কোনো চিহ্ন না-রাখা, দেহ ছাই হ'য়ে যাক, ভেসে যাক ভস্মাবশেষ সমুদ্রগামী নদীস্রোতে, ফিরে যাক তার আদিম জন্মস্থানে, মাটিতে, আগুনে, জলে, আকাশে হাওয়ায়। প্রাণবর্জিত দেহ আবর্জনা মাত্র, অথচ ঐ আবর্জনার 'পরেও আমাদের কত মমতা, কত শ্রদ্ধা। তাই সবচেয়ে ভালো নির্মম হওয়া, তাকে একেবারে নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেয়া, যেমন কিনা পূজা শেষ হ'য়ে গেলেই অসংখ্যভক্তদৃষ্টিবিনন্দিত দেবীপ্রতিমাকে আমরা জলে ডুবিয়ে দিই। যা শেষ হ'য়ে গেছে তাকে শেষ ক'রে দাও, সে যেন কোনো চিহ্ন না রাখে, রক্তমাংসকণ্ঠহীন একটা নামমাত্র স্মৃতিকে জোর ক'রে আঁকড়ে ধ'রে রাখতে লুব্ধ কোরো না তাদের, যারা বেঁচে আছে। স্মৃতি যদি বেঁচে থাকে তো মনে-মনে থাক, যদি না থাকে না-ই বা থাকলো। এটাই মৃত্যুর প্রতি—এবং জীবনের প্রতি—যথার্থ শ্রদ্ধাপ্রকাশ। মৃত্যুর মধ্যে যে একটি চরম সমাপন আছে, শবদাহ যেন তারই প্রতীক।

সবই বুঝলুম, কিন্তু হরিধ্বনি?

৩

জানি না কবে থেকে এবং কেমন ক'রে এই প্রথা আমাদের মধ্যে এলো। ব্যাপারটা নিঃসংশয়ে বীভৎস। ঐ হৃৎকম্পকারী চীৎকারে মৃত্যুর মহিমাকে খর্ব করা হয়, যে-চরমের অভিমুখে এই যাত্রা তাকে এমন ক'রে মুখ-ভ্যাংচানো সভ্যসমাজে কেমন ক'রে সম্ভব তা ভেবে অবাক না-হ'য়ে পারা যায় না। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হ'তে পারে জীবিত ব্যক্তিদের প্রাণে মৃত্যুর ত্রাস সঞ্চারিত করা—রাস্তার দু-দিকের অধিবাসীদের এই কথাটা মনে করিয়ে দেয়া যে তাদেরও একদিন এই দশা হবে। কিন্তু এই মনে করিয়ে দেয়াটা শুধু যে অনর্থক তা নয়, এতে একটা হাস্যকর দম্ভও প্রকাশ পায়। যেন জীবনের শেষে মৃত্যু আছে ব'লে জীবনের মূল্য কিছু ক'মে গেলো। বলা বাহুল্য, আমরা যদি প্রতিদিন ব'সে-ব'সে মৃত্যুর অনিবার্যতার কথাই ভাবি, তাহ'লে জীবন অচল হয়; উপরন্তু, কোনোদিন যে আমাদের মরতে হবে এ-কথা ভুলে' না-থাকলে ফুলের চাষ থেকে রাষ্ট্রগঠন পর্যন্ত কোনো কাজই সম্ভব হয় না। কর্ম ও আনন্দের ফাঁকে-ফাঁকে মৃত্যুকে স্মরণ করা—এও একরকমের ব্যসন ছাড়া কিছু না। আনাতোল ফ্র্যাঁসের এক গল্পে এক সুন্দরী চপলপ্রকৃতি রমণী তাঁর ক্যাথলিক কুলপুরোহিতকে ভেনিস থেকে তাঁর জন্য একটি উত্তম আয়না আনতে অনুরোধ করেন। পুরোহিত ভেনিস থেকে ফিরে এসে রমণীর হাতে একটি করোটি উপহার দিলেন। 'এটা কী?' 'এই তোমার আয়না—এতে তুমি

তোমার প্রকৃত প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবে।' দেহের অনিবার্য পরিণাম উপলব্ধি ক'রে রমণী শিহরিত হলেন, এবং—এখানেই লেখকের সত্য দৃষ্টির আলো পড়েছে—সেই রাত্রেই আত্মসমর্পণ করলেন তাঁর এতকাল-বঞ্চিত ব্যাকুল প্রেমিকের কাছে।

বস্তুত, শেষের সেই ভয়ংকর দিনের কথা হঠাৎ যদি প্রবলভাবে মনে পড়ে তাহ'লে এই নায়িকার অনুরূপ প্রতিক্রিয়াই স্বাভাবিক। তাতে চিত্তশুদ্ধি হয় না, বরং ভালো-মন্দ কিছু না-ভেবে জীবনের সমস্ত ভোগবিলাস গ্রাস করার জন্য মন মরীয়া হ'য়ে ওঠে। যুদ্ধের সময়ে সৈনিকদের ইতিহাস-কীর্তিত উচ্ছৃঙ্খলতা এর প্রমাণ। যদি চোখের সামনে কঙ্কাল রাখলেই মানুষ ভালো হ'তো, তাহ'লে ডাক্তারদের মধ্যে প্রত্যেকেই মহাপুরুষ হতেন। 'ভাবো মন সেদিনের কথা!' কিন্তু সেদিনের কথা খুব বেশি ক'রে ভাবলে হয় সংসারত্যাগ নয় আত্মহত্যা করতে হয়, নয়তো শিক্ষা-সংযমের ছন্দ-সুষমা সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে একেবারে বন্য প্রবৃত্তির তাড়নায় উদ্‌ভ্রান্ত হ'তে হয়—এর কোনোটাই মনুষ্যধর্ম নয়। যে-চিন্তা মানুষকে আর মানুষ রাখে না, সে-চিন্তা ক'রে লাভ কী? মানুষের কাছ থেকে তার সবচেয়ে ভালোটুকু আদায় ক'রে নিতে হ'লে বরং তার মনে এই ভ্রান্তিই সঞ্চার করা প্রয়োজন যে সে অমর।

অতএব দূর হোক হরিধ্বনি। শববাহীর মুখের হরিবোল চীৎকার নীরব হোক। একজন মানুষ মরেছে ব'লে জীবিতদের আধ-মরা ক'রে দেবার এই অপচেষ্টা কেন? আসলে শববাহীরা নিজেরাই হয়তো ভয় পান (অনেক

সময়ই তাঁরা মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয় হন না, এবং নির্জন নিশীথে তাঁদের পক্ষে ঈষৎ ভীত হওয়াটা খুব যে অন্যায় তাও বলা যায় না ), এবং সেই ভয় কাটাবার জন্যই দুর্মানুষিক তারস্বরে হরিধ্বনি রটনা ক'রে নির্দোষ গৃহস্থের নিদ্রাভঙ্গ ও অন্তত কিছুক্ষণের জন্য শান্তিহরণ করেন। এই ধ্বনির সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় আমার মনে হয় রাত তিনটের সময় রাস্তায় পাহারওলার হাঁক—অমন অকথ্য আওয়াজ পৃথিবীতে আর-কিছু আছে ব'লে আমার জানা নেই। এ-ক্ষেত্রেও আমার মনে হয় পাহারওলা নিজেই ভয় পায়—এই ব্ল্যাক-আউটের ঘুটঘুট্টি রাত্তিরে না-ই বা ভয় পাবে কেন, পাহারওলাও তো মানুষ—এবং তার এই কণ্ঠ-কসরতের উদ্দেশ্য নিজের প্রাণে সাহসসঞ্চার ছাড়া আর কিছু নয়। দুষ্কর্মীর উপর ওর প্রতিক্রিয়া কী-রকম হয় জানি না, কিন্তু আমাদের কানে গেলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বুক ধড়ফড় করে; হৃৎযন্ত্র দুর্বল থাকলে তার ধাক্কায় অকস্মাৎ অপমৃত্যু হওয়াও আশ্চর্য নয়।

একদিন সন্ধ্যার আবছায়ায় সার্কুলর রোডে মুসলমানের একটি শবযাত্রা চোখে পড়েছিলো। সমস্ত জিনিশটির মধ্যে এমন একটি নিঃশব্দ গাম্ভীর্য ছিলো যে মনের মধ্যে স্বতঃই একটি শান্ত শ্রদ্ধার ভাবের উদয় হ'লো। এই তো মৃত্যুর স্বরূপ। জীবনের সব কলরোল যেখানে গিয়ে স্তব্ধ হ'লো, সেখানে দেবতার নাম ধ'রে একটা উন্মত্ত চীৎকার যে কত বড়ো ছন্দোভঙ্গ তাও কি বুঝিয়ে বলতে হবে? খৃস্টানদের শবযাত্রা আমার ভালো লাগে না; জমকালো গাড়ির

মধ্যে কারুকার্যখচিত কফিন, পিছনে সারি-সারি গাড়িতে চোখে-রুমাল-চাপা সুসজ্জিত শোকার্তদল—এ যেন বড়োই পার্থিব, বড়োই প্রাত্যহিক, মৃত্যুর অনির্বচনীয় মহিমার সঙ্গে এর যেন কোনোখানেই মিল নেই। মৃতজনকে তার আত্মীয়বন্ধুরাই নগ্নপদে নতমুখে বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, এই দৃশ্যটির মধ্যে এমন একটি বেদনার্দ্র বিনয়ের আভাস আছে, যার কাছে আমরা যারা রাস্তার লোক আমাদেরও মাথা নত হয়। কিন্তু একবার হরিবোল ব'লে চীৎকার করলেই সুর যাবে কেটে, মৃত্যু তার রহস্যলোক ছেড়ে লুটিয়ে পড়বে পথের ধুলোয়, আর সেটা হবে মৃত্যুর চেয়েও শোচনীয় ঘটনা। সম্প্রতি হিন্দুদেরও দু-একটা শবযাত্রা দেখা যাচ্ছে, যাতে অনুগামীরা সকলেই নীরব; যদি-বা তাঁরা কিছু উচ্চারণ করেন, তা এতই মৃদুস্বরে যে শোনা যায় না। দেখে মনে ভয় জাগে না, বৈরাগ্যও জাগে না, জাগে সুগম্ভীর সম্ভ্রম, তখনকার মতো মনের মধ্যে বিরল একটি পবিত্রতা অনুভব করি। জীবিতের উদ্দেশে এ-ই তো মৃত্যুর শ্রেষ্ঠ উপহার। তাকে চীৎকার, কীর্তন এবং আনুষঙ্গিক নৃত্য দ্বারা বিধ্বস্ত করবার অধিকার মানুষকে যে-প্রথা দিয়েছে, সে-প্রথা ভ্রান্ত ও অবশ্যপরিহার্য। দেবতার নাম? সে তো মনে-মনেই বলবার, যদি দেবতা থাকেন মনে-মনে বললে তবেই তাঁর কানে পৌঁছবে।

১৯৪৩

# আড্ডা

পণ্ডিত নই, কথাটার উৎপত্তি জানি না। আওয়াজটা অ-সংস্কৃত, মুসলমানি। যদি ওকে হিন্দু ক'রে বলি সভা, তাহ'লে ওর কিছুই থাকে না। যদি ইংরেজি ক'রে বলি পার্টি, তাহ'লে ও প্রাণে মরে। মীটিঙের কাপড় খাকি কিংবা খাদি; পার্টির কাপড় ফুরফুরে কিন্তু ইস্ত্রি বড়ো কড়া; সভা শুভ্র, শোভন ও আরামহীন। ফরাশি সালঁর অস্তিত্ব এখনো আছে কিনা জানি না, বর্ণনা প'ড়ে মনে হয় এত সমারোহ ভালো না। আড্ডার ঠিক প্রতিশব্দটি পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষাতেই আছে কি? ভাষাবিদ না হ'য়েও বলতে পারি, নেই; কারণ আড্ডার মেজাজ নেই অন্য-কোনো দেশে, কিংবা মেজাজ থাকলেও যথোচিত পরিবেশ নেই। অন্যান্য দেশের লোক বক্তৃতা দেয়, রসিকতা করে, তর্ক চালায়, ফুর্তি ক'রে রাত কাটিয়েও দেয়, কিন্তু আড্ডা দেয় না। অত্যন্ত হাসি পায় যখন শুভানুধ্যায়ী ইংরেজ আমাদের করুণা ক'রে বলে—আহা বেচারা, ক্লব কাকে বলে ওরা জানে না! আড্ডা যাদের আছে, ক্লব দিয়ে তারা করবে কী? আমাদের ক্লবের প্রচেষ্টা কলের পুতুলের হাত-পা নাড়ার মতো, ওতে আবয়বিক সম্পূর্ণতা আছে, প্রাণের স্পন্দন নেই। যারা আড্ডাদেনেওলা জাত, তারা যে ঘর ভাড়া নিয়ে, চিঠির কাগজ ছাপিয়ে, চাকরদের চাপরাশ পরিয়ে ক্লবের পত্তন করে,

এর চেয়ে হাস্যকর এবং শোচনীয় আর-কিছু আছে কিনা জানি না।

আড্ডা জিনিশটা সর্বভারতীয়, কিন্তু বাংলাদেশের সজল কোমল মাটিতেই তার পূর্ণবিকাশ। আমাদের ঋতুগুলি যেমন কবিতা জাগায়, তেমনি আড্ডাও জমায়। আমাদের চৈত্রসন্ধ্যা, শ্রাবণের রিমঝিম দুপুর, শরতের জ্যোছনা-ঢালা রাত্রি, শীতের মধুর উজ্জ্বল সকাল—সবই আড্ডার নীরব ঘণ্টা বাজিয়ে যায়, কেউ শোনে, কেউ শোনে না। যে-দেশে শীত-গ্রীষ্ম দুই-ই অতি তীব্র, সেখানে আড্ডার ক্ষীণতা অনিবার্য। বাংলার কমনীয় আবহাওয়ায় গাছপালার ঘন শ্যামলিমার মতোই আড্ডার উচ্ছ্বাস। ছেলেবেলা থেকে এই আড্ডার প্রেমে আমি আত্মহারা। সভায় যেতে আমার বুক কাঁপে, পার্টির নামে দৌড়ে পালাই, কিন্তু আড্ডা! ও না-হ'লে আমি বাঁচি না। বলতে গেলে আড্ডার হাতেই আমি মানুষ। বই প'ড়ে যা শিখেছি তার চেয়ে বেশি শিখেছি আড্ডা দিয়ে। বিশ্ববিদ্যাবৃক্ষের উচ্চশাখা থেকে আপাতরমণীয় ফলগুলি একটু সহজেই পেড়েছিলুম—সেটা আড্ডারই উপহার। আমার সাহিত্যরচনায় প্রধান নির্ভররূপেও আড্ডাকে বরণ করি। ছেলেবেলায় গুরুজনেরা আশঙ্কা করেছিলেন যে আড্ডায় আমার সর্বনাশ হবে, এখন দেখছি আড্ডায় আমার সর্বলাভ হ'লো। তাই শুধু উপাসক হ'য়ে আমার তৃপ্তি নেই, পুরোহিত হ'য়ে তার মহিমা প্রচার করতে বসেছি।

যে-কাপড় আমি ভালোবাসি আড্ডার ঠিক সেই কাপড়। ফর্শা, কিন্তু অত্যন্ত বেশি ফর্শা নয়, অনেকটা ঢোলা, প্রয়োজন

পার হ'য়েও খানিকটা বাহুল্য আছে, স্পর্শকোমল, নমনীয়। গায়ের কোথাও কড়কড় করে না, হাত-পা ছড়াতে হ'লে বাধা দেয় না, লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়তে চাইলে তাতেও মানা নেই। অথচ তা মলিন নয়, তাতে মাছের ঝোল কিংবা পানের পিক লাগেনি; কিংবা দাওয়ায় ব'সে গা-খোলা জটলার বেআব্রু শৈথিল্য তাকে কুঁচকিয়ে দেয়নি। তাতে আরাম আছে, অযত্ন নেই; তার স্বাচ্ছন্দ্য কোনোখানেই ছন্দোহীনতার নামান্তর নয়।

শুনতে মনে হয় যে ইচ্ছে করলেই আড্ডা দেয়া যায়। কিন্তু তার আত্মা বড়ো কোমল, বড়ো খামখেয়ালি তার মেজাজ, অতি সূক্ষ্ম কারণেই উপকরণের অবয়ব ত্যাগ ক'রে সে এমন অলক্ষ্যে উবে যায় যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছু বোঝাই যায় না। আড্ডা দিতে গিয়ে প্রায়ই আমরা পরাবিদ্যার—মানে পড়া-বিদ্যার আসর জমাই, আর নয়তো পরচর্চার চণ্ডীমণ্ডপ গ'ড়ে তুলি। হয়তো স্থির করলুম যে সপ্তাহে একদিন কি মাসে দু-দিন সাহিত্যসভা ডাকবো, তাতে জ্ঞানীগুণীরা আসবেন এবং নানারকম সদালাপ হবে। পরিকল্পনাটি মনোরম তাতে সন্দেহ নেই; প্রথম কয়েকটি অধিবেশন এমন জমলো যে নিজেরাই অবাক হ'য়ে গেলাম, কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গেলো যে সেটি আড্ডার স্বর্গ থেকে চ্যুত হ'য়ে কর্তব্যপালনের বন্ধ্যা জমিতে পতিত হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে কর্মস্থলে যাওয়ার মতো নির্দিষ্ট দিনে যেখানে যেতে হয় তাকে, আর যা-ই হোক, আড্ডা বলা যায় না। কেননা আড্ডার প্রথম নিয়ম এই যে তার কোনো নিয়মই নেই; সেটা যে

অনিয়মিত, অসাময়িক, অনায়োজিত, সে-বিষয়ে সচেতন হ'লেও চলবে না। ও যেন বেড়াতে যাবার জায়গা নয়, ও যেন বাড়ি; কাজের শেষে সেখানেই ফিরবো, এবং কাজ পালিয়ে যখন-তখন এসে পড়লেও কেউ কোনো প্রশ্ন করবে না।

তাই ব'লে এমন নয় যে এলোমেলোভাবেই আড্ডা গ'ড়ে ওঠে। নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে তার পিছনে কোনো-একজনের প্রচ্ছন্ন কিন্তু প্রখর রচনাশক্তি চাই। অনেকগুলি শর্ত পূরণ হ'লে তবে আড্ডা ঠিক আড্ডা হ'য়ে ওঠে। একে-একে সেগুলি পেশ করি।

আড্ডায় সকলেরই মর্যাদা সমান হওয়া চাই। ব্যবহারিক জীবনে মানুষে-মানুষে নানা রকম প্রভেদ অনিবার্য, কিন্তু সেই ভেদবুদ্ধি আপিশের কাপড়ের সঙ্গে-সঙ্গেই যারা ঝেড়ে ফেলতে না জানে, আড্ডার স্বাদ তারা কোনোদিন পাবে না। যদি এমন কেউ থাকেন যিনি এতই বড়ো যে তাঁর মহিমা কখনো ভুলে' থাকা যায় না, তাঁর পায়ের কাছে আমরা ভক্তের মতো বসবো, কিন্তু আমাদের আনন্দে তাঁর নিমন্ত্রণ নেই, কেননা তাঁর দৃষ্টিপাতেই আড্ডার ঝর্নাধারা তুষার হ'য়ে জ'মে যাবে। আবার অন্যদের তুলনায় অনেকখানি নিচুতে যার মনের স্তর, তাকেও বাইরে রাখা দরকার, তাতে তারও শান্তি। আড্ডার লোকসংখ্যার একটা স্বাভাবিক সীমা আছে; ঊর্ধ্বসংখ্যা দশ কি বারো, নিম্নতম তিন। দশ-বারোজনের বেশি হ'লে অ্যালবার্ট হল হ'য়ে ওঠে, কিংবা বিয়ে-বাড়িও হ'তে পারে; আর যদি হয় ঠিক দু-জন তার

সঙ্গে কূজনই মেলে—পদ্যেও, জীবনেও। যে-ক'জন থাকবেন তাঁদের স্বভাবের উপর-তলায় বৈচিত্র্য তো থাকবেই, কিন্তু নিচের তলায় মিল না-থাকলে পদে-পদে ছন্দপতন ঘটবে। অনুরাগ এবং পারস্পরিক জ্ঞাতিত্ববোধ স্বতই যাদের কাছে টানে, আড্ডা তাদেরই জন্য, এবং তাদেরই মধ্যে আবদ্ধ থাকা উচিত; চেষ্টা ক'রে সংখ্যা বাড়াতে গেলে আড্ডার প্রাণপাখি কখন উড়ে পালাবে কেউ জানতেও পাবে না।

কিন্তু এমনও নয় যে ঐ ক-জন এক-সুরে-বাঁধা মানুষ একত্র হ'লেই আড্ডা জ'মে উঠবে। জায়গাটিও অনুকূল হওয়া চাই। আড্ডার জন্য ঘর ভাড়া করা আর শোক করার জন্য কাঁদুনে ভাড়া করা একই কথা। অধিগম্য বাড়িগুলির মধ্যে যেটির আবহাওয়া সবচেয়ে অনুকূল, সেই বাড়িই হবে আড্ডার প্রধান পীঠস্থান। সেই সঙ্গে একটি দুটি পারিপার্শ্বিক তীর্থ থাকাও ভালো, মাঝে-মাঝে জায়গা-বদল করাটা মনের ফলকে শান দেয়ার শামিল; ঋতুর বৈচিত্র্য এবং চাঁদের ভাঙা-গড়া অনুসারে ঘর থেকে বারান্দায়, বারান্দা থেকে ছাতে, এবং ছাত থেকে খোলা মাঠে বদলি হ'লে সেই সম্পূর্ণতা লাভ করা যায়, যা প্রকৃতিরই আপন হাতের সৃষ্টি। কিন্তু কোনো কারণেই, কোনো প্রলোভনেই ভুল জায়গায় যেন যাওয়া না হয়। ভুল জায়গায় মানুষগুলোকেও ভুল মনে হয়, ঠিক সুরটি কিছুতেই লাগে না।

আড্ডার জায়গাটিতে আরাম থাকবে পুরোপুরি, আড়ম্বর

থাকবে না। আসবাব হবে নিচু, নরম, অত্যন্ত বেশি ঝকঝকে নয়; যদি মরজি-মতো অযথাস্থানে সরিয়ে নেবার আন্দাজ হালকা হয় তাহ'লে তো খুবই ভালো। চেয়ার-টেবিলের কাছাকাছি একটা ফরাশও থাকবে—যদি রাত বেড়ে যায়, কিংবা কেউ খুব ক্লান্ত থাকে, তাহ'লে শুয়ে পড়ার জন্য কারো অনুমতি নিতে হবে না। পানীয় থাকবে কাচের গেলাশে ঠাণ্ডা জল, আর পাৎলা শাদা পেয়ালায় সোনালি সুগন্ধি চা; আর খাদ্য যদি কিছু থাকে তা হবে স্বাদু, স্বল্প, এবং শুকনো, যেন শুয়ে-শুয়েও খাওয়া যায়, আর খাবার পরে হাত-মুখ ধোবার জন্য উঠতে হয় না। বাসনগুলি জমকালো হবে না, পরিচ্ছন্ন হবে; এবং ভৃত্যদের ছুটি দিয়ে গৃহকর্ত্রী নিজেই যদি খাদ্যপানীয় নিয়ে আসেন এবং বিতরণ করেন তাহ'লেই আড্ডার যথার্থ মানরক্ষা হয়।

কথাবার্তা চলবে মসৃণ, মন্থর, স্বচ্ছন্দ স্রোতে, তার জন্য কোনো চেষ্টা কি চিন্তা থাকবে না; মনের মধ্যে যে-সব ঢেউ সব সময় উঠছে পড়ছে, কেজো দিনের আবর্তের তলায় যা চাপা প'ড়ে থাকে, কথাগুলি তারই যেন ছলছলানি। এখানে সংকোচ নেই, বিষয়বুদ্ধি নেই, দায়িত্ববোধ নেই। ভালো কথা বলবার দায় নেই এখানে। ভালো কথা না আসে, এমনি কথাই বলবো; এমনি কথারও যদি খেই হারিয়ে যায়, থাকবো চুপ ক'রে—চুপ ক'রে থাকতে ভয় কিসের। জোর ক'রে মেকি কথার অবতারণার চাইতে ঢের ভালো চুপ ক'রে থাকা। নানা

কথার টানা-পোড়েনে যে-কাপড়টি বোনা হয়, চুপ ক'রে থাকা তো তারই সোনালি পাড়। পাড় জিনিশটা কাপড়কে রূপ দেয়, চুপ ক'রে থাকাটা কথাকে সুস্পষ্ট ক'রে তোলে। এইজন্যই চুপ ক'রে থাকাকে যাঁরা বুদ্ধির পরাভব কিংবা সৌজন্যের ত্রুটি ব'লে মনে করেন, আড্ডা জিনিশটা তাঁরা বোঝেন না। তার্কিক এবং পেশাদার হাস্যরসিক, আড্ডায় এই দুই শ্রেণীর মানুষের প্রবেশ নিষেধ। যাঁরা প্রাজ্ঞজন, কিংবা যাঁরা লোকহিতে বদ্ধপরিকর, তাঁদেরও সসম্মানে বাইরে রাখতে হবে। কেননা আড্ডার ইডেন থেকে যে-সূক্ষ্ম সর্প বার-বার আমাদের ভ্রষ্ট করে, তারই নাম উদ্দেশ্য। যত মহৎই হোক, কিংবা যত তুচ্ছই হোক, কোনো উদ্দেশ্যকে ভ্রমক্রমেও কখনো ঢুকতে দিতে নেই। এটা ধ'রে নিতে হবে যে আড্ডা কোনো উদ্দেশ্যসাধনের উপায় নয়, তা থেকে কোনো কাজ হবে না, নিজের কিংবা অন্যের কিছুমাত্র উপকার হবে না। আড্ডা বিশুদ্ধ, নিষ্কাম, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ।

শুধু পুরুষদের নিয়ে, কিংবা শুধু মেয়েদের নিয়ে, আড্ডা জমে না। শুধু পুরুষরা একত্র হ'লে কথার গাড়ি শেষ পর্যন্ত কাজের লাইন ধ'রেই চলবে; আবার কখনো লাইন থেকে চ্যুত হ'লে গড়াতে-গড়াতে একেবারে সুরুচির সীমাও পেরিয়ে যাবে হয়তো। শুধু মেয়েরা একত্র হ'লে ঘরকন্না, ছেলেপুলে, শাড়ি-গয়নার কথা কেউ ঠেকাতে পারবে না। আড্ডার উন্মীলন স্ত্রী-পুরুষের মিশ্রণে। মেয়েরা কাছে থাকলে পুরুষের, এবং পুরুষ কাছে থাকলে মেয়েদের রসনা

মার্জিত হয়, কণ্ঠস্বর নিচু পর্দায় থাকে, অঙ্গভঙ্গি শ্রীহীন হ'তে পারে না। মেয়েরা দেন তাঁদের স্নেহ, তাঁদের লাবণ্য, ন্যূনতম অনুষ্ঠানের সূক্ষ্মতম বন্ধন ; পুরুষ আনে তার ঘর-ছাড়া মনের উদ্দামতা। বিচ্ছিন্নভাবে মেয়েদের দ্বারা এবং পুরুষের দ্বারা পৃথিবীতে অনেক ছোটো-বড়ো কাজ হ'য়ে থাকে ; ছন্দ হয় দুয়ের মিলনে।

আড্ডা স্থিতিশীল নয়, নদীর স্রোতের মতো প্রবহমাণ। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে তার রূপের বদল হয়। মন যখন যা চায়, তা-ই পাওয়া যায় আড্ডাতে। কখনো কৌতুকে উজ্জ্বল, কখনো খামকা ভালো-লাগায় ভরপুর, কখনো স্বপ্নে মদির। বুদ্ধিতে লাগে হৃদয়ের স্পর্শ, হৃদয়ে পড়ে বুদ্ধির আলো। আড্ডা যা দিতে পারে, আর-কিছুই তা পারে না। আর-কিছুই আড্ডার মতো নয়। বিশ্বসভায় অখ্যাতির কোণে আমরা নির্বাসিত ; যারা ব্যস্ত এবং মস্ত জাত, যাদের কৃপাকটাক্ষ প্রতি মুহূর্তে আমাদের বুকে এসে বিঁধছে, তারা এখনো জানে না যে পৃথিবীর সভ্যতায় আড্ডা আমাদের অতুলনীয় দান। যারা ছিলো বিশ্বজয়ী, তারা আজ স্বরচিত পুঞ্জ-পুঞ্জ উপকরণের তলায় চাপা প'ড়ে মরছে—প্রকৃতির প্রতিশোধের হাত থেকে তো বিশ্বজয়ীরও নিস্তার নেই। এই প্রায়শ্চিত্তের মহাযজ্ঞ যখন শেষ হবে, তখন নবজন্মের দুয়ার খুলে বেরিয়ে পড়বো আমরা, অস্ত্র নিয়ে নয়, মানদণ্ড নিয়ে নয়, ধর্মগ্রন্থ নিয়েও নয়, বেরিয়ে পড়বো নিশান উড়িয়ে, বিশুদ্ধ বেঁচে থাকার মন্ত্র নিয়ে, আনন্দের উদ্দেশ্যহীন ব্রত নিয়ে, আড্ডা দিয়ে পৃথিবী জয় করবো

আমরা, জয় করবো কিন্তু ধ'রে রাখবো না ;—কেননা আমরা জানি যে ধ'রে রাখতে গেলেই হারাতে হয়, ছেড়ে দিলেই পাওয়া যায়। পৃথিবীর রাষ্ট্রনীতি বলে, কাড়ো ; আমাদের আড্ডা-নীতি বলে, ছাড়ো।

১৯৪৪

# সবচেয়ে দুঃখের দু-ঘণ্টা

দু-মাসে একবার এই দুঃখ আমাকে মাথা পেতে নিতে হয়, মাথা পেতে দিতে হয় এমন লোকের কাছে—যাকে চিনি না, যার নাম জানি না, আবছা-আবছা একটু মুখচেনা ছাড়া আমার মনোলোকে যার অস্তিত্বই নেই। জীবনের একমাত্র ও পরম মূলধনরূপে যে-মাথাটি পেয়েছিলাম, সেই মাথা সমর্পণ করি তার হাতে; সে তা নিয়ে যেমন খুশি নাড়াচাড়া করে, এ-পাশে ঘোরায়, ও-পাশে ফেরায়, কখনো অঙ্গুলি-ইঙ্গিতে আনত ক'রে দেয়, কখনো বা ঊর্ধ্বমুখ অসহায় অবস্থায় আমাকে পরিত্যাগ ক'রে পাশের টেবিলে দু-নম্বর ক্লিপ আনতে গিয়ে সহকর্মীর সঙ্গে কোনো চিত্রতারকার দীপ্তিনিরূপণে নিবিষ্ট হয়। একবার তার হাতে গিয়ে পড়লে আমার আর কিছুই করবার থাকে না; সে আমার কান ধ'রে টানে, মেরুদণ্ড আর মস্তিষ্কের সুকোমল সন্ধিস্থলে এমন চপেটাঘাত করে যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চিন্তাশক্তির কেন্দ্র অবশ হ'য়ে থাকে; তার লক্ষ্যভ্রষ্ট কাঁচি বার-বার বেঁধে আমার ঘাড়ে, বৈদ্যুতিক বুরুশ ছিটকে এসে গালের প্রায় ছাল ছাড়িয়ে নেয়;—আমি কিছুই করতে পারি না, কিছুই বলতে পারি না, কখন যে এই যন্ত্রণার অবসান হবে, এবং পুনর্বার মুক্তপুরুষ হ'য়ে সিগারেট ধরিয়ে রাস্তায় বেরোতে পারবো, সেই আশায় উন্মুখ হ'য়ে থাকি। ততক্ষণে সেই অনামী

ব্যক্তি কোত্থেকে একটা ময়লা তোয়ালে বের করেছে, আমি বারণ করতে-না-করতে সেটা আমার চোখে-মুখে বুলিয়ে নিয়ে বেঁধে দিয়েছে গলায়। এই গণবস্ত্রটাকে গলবস্ত্ররূপে ধারণ ক'রে আমি যখন স্পর্শবহ বীজাণুর বিভীষিকায় মনে-মনে কাঁপছি, সে তখন তার কেশকর্তনশিল্পের শেষ সূক্ষ্ম সুচারুতা সম্পাদন করছে—দু-আঙুলের মধ্যে আমার মাথাটিকে নিশ্চল রেখে দু-পাশের জুলপির সমতা নিরীক্ষণ করছে, ভ্রূভঙ্গি সহকারে একটু তাকিয়ে থেকে হঠাৎ একটা কাঁচি তুলে নিয়ে ললাটের প্রান্তদেশে খচ ক'রে একবার শব্দ ক'রেই মিনিটখানেক স্তব্ধ থেকে আবার সেই প্রাথমিক ক্লিপটা তুলে নিচ্ছে ;—আর আমি ধৈর্যের প্রতিমূর্তির মতো চক্ষু মুদ্রিত ক'রে গোলাকৃতি চেয়ারটায় প'ড়ে আছি আর ভাবছি—যাক, দু-মাসের মতো তো নিশ্চিন্ত !

কিন্তু হায়, একটি মাসও শান্তিতে কাটে না।

আসলে হয়েছে কী, আমি স্বভাবতই ঘন এবং দ্রুতবর্ধিষ্ণু কেশগুচ্ছের অধিকারী। উনিশ শতকে জন্মালে প্রকৃতির অভিপ্রেত এই অলংকার কবিজনোচিত কুঞ্চিত দীর্ঘতায় সগৌরবে বিলম্বিত করতে পারতুম, কিন্তু এই কাটাছাঁটা বিশ শতক কোনো বাহুল্যকেই প্রশ্রয় দেয় না, পুরুষমানুষের—এমনকি মেয়েদের চুলের পর্যন্ত না। উত্তরতিরিশে ললাট যাঁদের দুর্বার বেগে প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হচ্ছে, তাঁরা হয়তো আমার মাথার দিকে তাকিয়ে মনে-মনে একটু ঈর্ষাই করেন ; আর মেজাজ যাঁদের সাহেবি, যাঁরা এই টুপিহীন যুগে কোনো-কিছুকেই মাথায় চ'ড়ে বসতে দিতে রাজি নন,

স্পর্ধিত চুলগুলিকে যাঁরা করোটির সঙ্গে একেবারে লীন ক'রে রাখেন, আমার মাথার প্রতি কটাক্ষপাতে তাঁদের পক্ষপাত নিশ্চয়ই প্রকাশ পায় না। মোটের উপর, আমার কেশঘনতার অশোভনতা সম্বন্ধে অনেকেই নিঃসংশয়, এবং কেশশিল্পীর নিষ্করুণ কবল থেকে একবার নিস্তার পেয়ে বেরিয়ে আসার মাত্র সপ্তাহ দুই পর থেকেই নানারকম অপ্রীতিকর মন্তব্য আমার মস্তকের উপর বর্ষিত হ'তে থাকে।

মনে করুন, একটানা আট ঘণ্টার সুখনিদ্রার পর উশকোখুশকো চুলে বিছানায় ব'সে সকালবেলাকার প্রথম চা খাচ্ছি, এমন সময় আমার পেন্সন-পাওয়া পিসেমশাইর প্রবেশ হ'লো। আমার দিকে একবার মাত্র তাকিয়ে তিনি ব'লে উঠলেন—'এ কী! মাথাটাকে কাকের বাসা ক'রে রেখেছো কেন?'

আমি আর কী বলবো—ঠিক আমার জানলার সামনে রাস্তায় একটা গাছ উঠেছে, সেখানে বাসা বেঁধেছে এক জোড়া কাক—সেদিকে তাকিয়ে কাকপক্ষীর আবাসের সঙ্গে আমার কেশদামের আকৃতিগত সাদৃশ্য আবিষ্কারের চেষ্টায় লিপ্ত হই।

বর্তমানে কলেজে কত বেতন পাই, সংসার চলে কিনা, বড়ো মেয়েটি তার মা-র মতোই রোগা হচ্ছে কেন, এবংবিধ কুশলপ্রশ্নাদির পর পিসেমশাই আবার বললেন, 'ইশ, কী বিশ্রী বড়ো-বড়ো চুল হয়েছে মাথায়! আছো কী ক'রে?'

আমি যে দুঃখে আছি এ-কথা জানতে পারলেই

পিসেমশাই বেশ সুখী হন, অতএব কী ক'রে আছি সেই রহস্যের মর্মোদ্ঘাটন তাঁর কাছে আর করি না।

কয়েকদিন পরে ট্র্যামে উঠে যাঁর পাশে বসলাম, তিনি একটি পত্রিকার সম্পাদক। একবার এ-পাশ থেকে একবার ও-পাশ থেকে আমাকে নিরীক্ষণ ক'রে তিনি বললেন, 'কই, না!'

'কী?'

'আমি শুনেছিলাম আপনি বাবরি রাখছেন, কিন্তু না তো!' বেশ উচ্চস্বরে কথাটা বললেন তিনি, আশে-পাশের চার জোড়া চোখ আমার উপর এসে পড়লো।

তারপর একদিন একটি তরুণ কবি আমার বাড়িতে বেড়াতে এলেন। অনেকক্ষণ সদালাপ ক'রে তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে নির্লজ্জ হ'লেই প্রেমের কবিতা লেখা যায়, আর নির্লজ্জ যদি হ'তেই হয় তাহ'লে নির্লজ্জের মতো প্রেমের কথা না-লিখে নির্লজ্জের মতো প্রেম করাই ভালো। ওঠবার সময় একটু তাকিয়ে, একটু মুচকি হেসে তিনি বললেন, 'আপনার চুলটি বেশ হচ্ছে—উদয়শঙ্করের মতো।'

এটাও সহ্য করা গিয়েছিলো, কিন্তু এর দিন দশেক পরে মনে-মনে একটা সদ্যোজাত কবিতার প্রথম স্তবক বিড়বিড় করতে-করতে ভিজে চুলে স্নানের ঘর থেকে বেরিয়েছি, মক্ষিরানি হঠাৎ তীক্ষ্ণ স্বরে ব'লে উঠলেন, 'তুমি আজই চুল ছাঁটতে যাবে কিনা বলো।'

'আজই? কেন?'

'কেন আবার কী? সেদিন ডলি কী ব'লে গেলো, জানো? বললো—বুদ্ধদেববাবুর দিকে আর তাকানো যায় না। তাঁকে চুল ছাঁটতে বোলো তো!'

'তোমার সখী ভুল বলেছেন। এই তো আমি বেশ তাকিয়ে আছি বুদ্ধদেববাবুর দিকে,' ব'লে আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চারদিকে জল ছিটিয়ে চুল আঁচড়াতে লাগলাম।

'ঠিক বলেছে ডলি! নিজে তো আর নিজের পিছনটা দেখতে পাও না—পুরুষমানুষের ঘাড় বেয়ে চুল নামলে বিকট দেখায়।'

'কী কথায়-কথায় বিকট বলো—কথাটা সত্যিই বিকট। সাবধান না-হ'লে ওটা তোমার মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে যাবে।'

'সত্যি—কী যে একটা বিকট বদভ্যাস হয়েছে আমার—'

'এই! আবার।'

মক্ষিরানি হেসে ফেললেন, কিন্তু আসল কথা ভুললেন না। —'যাও, এক্ষুনি যাও, চুল ছেঁটে এসো।'

জীবনকে যাঁরা নিশার স্বপন ব'লে থাকেন, তাঁদের চেয়েও কাতরস্বরে আমি বললাম, 'আজ তো সময় হবে না—আজ আমার অনেক কাজ—'

'—কাজ তুমি একলাই করো নাকি পৃথিবীতে! সব মানুষই কাজ করে—'

'—সব পুরুষমানুষ, বলো!'

আমার সংশোধনটা অগ্রাহ্য ক'রে মক্ষিরানি বললেন, 'সকলেই কাজ করে, কিন্তু তোমার মতো এ-রকম অখাদ্য চেহারা ক'রে কাউকে তো থাকতে দেখি না।'

বিশেষণটা যে ব্যাকরণসংগত হ'লো না, সে-বিষয়ে মক্ষিরানিকে সচেতন করবার চেষ্টা না-ক'রে আমি টেবিলে ব'সে কলম তুলে নিয়ে মাথা নিচু করলুম, খাতার এক কোণে কবিতার প্রথম স্তবকটা লিখে সরিয়ে রাখলুম— ঈশ্বরের দয়া হ'লে কোনোদিন হয়তো শেষ করতে পারবো। আপাতত অর্ধ-সমাপ্ত গল্পটা—

'আজ তাহ'লে যাবে না তুমি?' চেয়ারের পিছনে মক্ষিরানির কণ্ঠস্বর।

'না—না—যাবো না! কী করতে পারো?' লিখতে হ'লেই দেহের ভঙ্গিটা নম্র হয়—মনটাও বিনত হওয়া বোধহয় ভালো—তাই বলতে-বলতে চেয়ার ছেড়ে একেবারে উঠেই দাঁড়ালুম, মক্ষিরানি একটা তীক্ষ্ণ এবং সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ক'রে তখনকার মতো নীরব হলেন।

মুখে যতই বীরত্ব করি, মনে-মনে বুঝেছিলুম যে আর দেরি নেই, সবচেয়ে দুঃখের দু-ঘণ্টা আবার ঘনিয়ে আসছে জীবনে। মনে পড়লো সেই সুশ্রী সুঠাম কৃষ্ণবর্ণ তরুণকে, যে বারো বছর আগে আমার ভবানীপুরের একতলায় আমার কেশ-সংস্কার করতে আসতো। পরামানিকের মানিক ছিলো সে। কাঁচি ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করতো না ('কাঁচি চালাতে জানলে আর ক্লিপ লাগে কিসে!') অথচ পয়সা নিতো সেলুনের সমান, এবং সে-পয়সা শুধু তাঁদের কাছেই

নিতো তার নিজের মতে যাঁরা বিশিষ্টতম বাবু। বাবু শব্দটা এখানে শ্রেণীবাচক নয়, গুণবাচক। বৈদগ্ধ্যে তেমন উন্নত যারা নয়, যারা নির্বিচারে যে-কোনো সেলুনে ঢুকে পড়ে, ভবানীপুরের শ্রেষ্ঠ কেশশিল্পীর পদার্পণের আশায় লম্বিত চুলে অপেক্ষা করে না, তাদের স্থূল মুণ্ডে গোবিন্দ পরামানিকের লঘু অঙ্গুলি কখনো লীলায়িত হয়নি। তৎকালীন দক্ষিণ কলকাতার সবচেয়ে সুবেশ, সবচেয়ে সুকান্ত, সবচেয়ে শৌখিন যুবক ছিলেন অনিমেষ সেন; তাঁর কেশদামের ঈষৎ-বঙ্কিত মসৃণ চিক্কণ ভঙ্গিমার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থেকেছি আমরা; একমাত্র গোবিন্দ ছাড়া আর-কোনো নরসুন্দরের সাধ্য ছিলো না তাঁর কেশাগ্র কখনো স্পর্শ করে। আমার মতো আলুথালু মানুষকেও গোবিন্দ-যে তার অনুগ্রহমণ্ডলের অন্তর্গত করেছিলো, এ নিয়ে রীতিমতো একটু গর্বই ছিলো আমার মনে। একটু পুরোনো আমলের ইংরেজি সাহিত্যে বর্ণিত কেশকর্তকের মতো কাঁচির সঙ্গে-সঙ্গে তার মুখও চলতো অনর্গল, একটানা ব'সে থাকার ক্লান্তির উপশম হ'তো তার তরল কলস্বরে, প্রাণের স্পর্শে পীড়িত পেশীর শুশ্রূষা হ'তো। সেই গোবিন্দ ফুটবল খেলতে গিয়ে হঠাৎ একদিন ধনুষ্টংকার হ'য়ে ম'রে গেলো। তার কোনো জুড়ি ছিলো না তখন, এ-যুগে আর হবেও না। ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি বিবিধ যন্ত্রসহযোগে মনুষ্যদেহের উপর যারা কারিগরি করে তারাই লোকের বাড়ি-বাড়ি আসে, কিন্তু সেই সেকেলে যুগ গোবিন্দর সঙ্গে-সঙ্গেই শেষ হ'য়ে গেছে, গোবিন্দ চ'লে গেছে আমার

বাল্য, আমার কৈশোর, আমার যৌবনকে হরণ ক'রে। এখন আর নরসুন্দর কারো বাড়িতে আসে না, এখন তার কাছে যেতে হয়; আমাকেও যেতে হয় তার অভিসারে, যাদের চিনি না, নাম জানি না, যারা আমার চিত্তবিনোদনের জন্য নিজের বাড়ির বা পরের হাঁড়ির কোনো খবরই বলে না, শুধু নিজেদের মধ্যে থিয়েটার-সিনেমার গল্প করে, সেই নিরুপাধি নৈর্ব্যক্তিক যন্ত্রকুশলের হাতে নিঃশব্দে আত্ম-সমর্পণ করতে হয়।

কিন্তু যাওয়া কি সোজা! কত যে শক্ত মক্ষিরানি তার কী বুঝবেন! কত কথা ভাবতে হয়, মনে-মনে কত অঙ্ক মিলিয়ে তবে বাড়ি থেকে পা বাড়াই। সপ্তাহের মধ্যে বৃহস্পতিবার দোকান বন্ধ, শুক্রবার অর্ধেক দিন খোলা। সেই অর্ধেকটা সকালের দিকে না বিকেলের দিকে তা কিছুতেই মনে রাখতে পারি না, তাই মনে-মনে দুটো দিনই বাদ দিয়ে রেখেছি। শনি, রবি ও অন্যান্য ছুটির দিনও ছেড়ে দিতে হয়—আপিশওলাদের ভিড়ে আমি কি আর পাত্তা পাবো! সকালে সন্ধ্যায় রোজই যা ভিড় হয়, ভাবতেই ভয় করে; দুপুরবেলায় যেতে না-পারলে আর যাওয়াই হয় না আমার;—তাহ'লে আর কতটুকুই বা সময় হাতে থাকে! ছুটির দিন নয়, এবং আমারও তেমন জরুরি কাজ হাতে নেই, এমন কোনো সোম, মঙ্গল কিংবা বুধবারের দুপুরবেলা—এ কি জীবনে সহজে আসে! আর শুধু কি তা-ই! ট্র্যামে চ'ড়ে হাজরা রোডের মোড়ে যাওয়া, আবার ফিরে আসা, হয়তো একটু ব'সে থাকা—সব সুদ্ধু দু-টি ঘণ্টা সময় ধ'রে রাখতে হয়—এই দু-ঘণ্টা কাটবে কেমন ক'রে, হাতে একখানা বই

চাই তো। তাও যে-কোনো বই হ'লেই হবে না—কবিতার বই পড়া যাবে না ওখানে, গুরুগম্ভীর বইও না, চুল ছাঁটতে ব'সে বইয়ের সঙ্গে চোখের যে-দূরত্ব রাখতে হয়, তাতে ছোটো অক্ষর অচল, খুব মোটাসোটা ভারি বই হ'লে বহন করা অসুবিধে ; অত্যুৎকৃষ্ট বাঁধাই যদি হয় তাহ'লে আবার নোংরা হবার ভয়। এমন বই চাই, যা সহজ, সরস ও বড়ো অক্ষরে ছাপা, যাতে মন অক্লেশে নিবিষ্ট হ'য়ে কেশকর্তনযন্ত্রণা ভুলে থাকতে পারে, অথচ যার পাতাগুলি ছোটো-ছোটো ছাঁটা চুলে আচ্ছন্ন হ'লে গ্রন্থের বা গ্রন্থকারের প্রতি অমার্জনীয় অসৌজন্য মনে হবে না—একটি ফুৎকারেই সে-চিন্তা মন থেকে সরিয়ে দেয়া যাবে। সবচেয়ে ভালো কোনো উজ্জ্বল সজীব সাময়িক পত্র কিংবা এমন কোনো লেখকের ছোটোগল্পের বই, যিনি প্রাণ দিয়ে এবং মন দিয়ে গল্প লেখেন, বই-পড়া বুদ্ধি দিয়ে লেখেন না— কিংবা এই-যে আমি প্রবন্ধটি লিখছি এই ধরনের প্রবন্ধের বই। দুঃখের বিষয়, এ-ধরনের সাহিত্যরচনা ক্রমেই দুর্লভ হ'য়ে আসছে। আজকালকার পাঠক তথ্য চায়, তত্ত্ব চায়, তর্ক চায় ; লেখকের ছাত্র হ'তে ভালোবাসে তারা, লেখকের দোসর হ'তে চায় না। তাই বিভিন্ন ইস্কুলের গুরুমশাইদের অনুশাসনে—আর সে-সব অনুশাসনের শিশুপাঠ্য সংস্করণে—ইংরেজি বাংলা বইয়ের দোকান আজ ভরতি। হতভাগ্য দীর্ঘকেশ পুরুষকে তাই অপেক্ষা করতে হয়, যতদিন না দৈবগুণে এমন-কোনো পাঠ্যবস্তু তার হাতে এসে পড়ে, যা সেই অনিবার্য দু-ঘণ্টার দুঃসময়ে তার বেঁচে থাকাকে সহনীয় করতে পারে। লুব্ধ

হ'য়েও সে-বই সে তখনই প'ড়ে ফেলে না, তুলে রেখে দেয় সেই দিনের জন্য যখন ঘরে-বাইরে উত্থিত সুতীব্র প্রতিবাদ তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে ঘর থেকে বাইরে। একখানা বই হাতে নিয়ে পাংশুমুখে সে ট্র্যামে চ'ড়ে বসলো ( হায় রে, ঐ লেখাটা আজ আর শেষ হ'লো না ! ), মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলো যে এবারে এমন করবে যাতে শিগগির আর এ-বিড়ম্বনা ভোগ করতে না হয় ; রিক্ত কেশে ক্লান্ত দেহে ফিরে এলো যখন, বাড়ির ভিতরে পা দিতে-না-দিতেই তার কন্যা চেঁচিয়ে উঠলো—'ও মা ! কী বিশ্রী দেখাচ্ছে তোমাকে, বাবা !' —তারপর দু-দিন যেতে-না-যেতেই পূর্বোল্লিখিত নাটিকার পুনরাবৃত্তি। পুরুষের জীবনে এই এক পৌনঃপুনিক দুর্ভোগ !

লেখাটা এই পর্যন্ত প'ড়ে মক্ষিরানি বললেন, 'পুরুষের দুঃখের কাঁদুনি তো খুব গেয়েছো, এদিকে মেয়েদের যে রোজ চুল বাঁধতে হয় সে-কথা ভাবো একবার !'

একবার নয়, বহুবার ভেবেছি সে-কথা। কিন্তু মেয়েদের প্রসাধনের কোনো প্রক্রিয়াই তো কষ্টের নয়, সুন্দর হবার উপায়টাও তাদের সুন্দর। যে-কাজে পুরুষের ঔচিত্যবোধ ছাড়া কিছুই প্রকাশ পায় না, সে-কাজেই মেয়েদের লালিত্য ঝরে। যেটুকু প্রসাধন পুরুষের পক্ষে অনুমোদিত, ঠিক সেটুকুই অপরিহার্য ; তার বেশি হ'লে উপহাস্য আর কম হ'লে অবজ্ঞেয় হ'তে হয়। অধিকাংশ পুরুষ যে প্রত্যহ দাড়ি কামায়, সে তো নেহাৎই সামাজিক নিয়মের অনুগামী হবার

জন্য—নয়তো কি ঐ যন্ত্রণা কেউ গাল পেতে নেয়! আমার মতে ক্ষৌরকর্মটা বাথরুমের নেপথ্যেই সম্পন্ন হওয়া ভালো—ওর আনুষঙ্গিক মুখভঙ্গিগুলি ঠিক রঙ্গমঞ্চে প্রকাশ্য নয়, অনিবার্য কারণেই সেগুলি-যে নিজে না-দেখে পারা যায় না, সেটাই কি যথেষ্ট শাস্তি নয়? আপন মুখমণ্ডলের সঙ্গে রক্তাক্ত সংগ্রামটাকে গোপন রেখে তার ফলটাকেই আমরা বাইরে প্রকাশ করি। এর সঙ্গে কি তুলনা হয় মেয়েদের চুল বাঁধার! পুরুষের প্রসাধন কর্তব্যসম্পাদনের অংশ মাত্র, মেয়েদের প্রসাধন জীবনসাধনার অঙ্গ। পুরুষ দাড়ি কামিয়ে, চুল আঁচড়ে, ফর্শা কাপড় প'রে বেরোবে, এটুকুই তার কাছে সমাজের দাবি, এবং সমাজের দাবি ছাড়া এটা তার কাছে আর-কিছুই নয়। কিন্তু মেয়েদের কেশবিন্যাস বেশভূষার সঙ্গে তাদের প্রাণশক্তিও জড়িত, সমাজ সেখানে কোনো সীমা টানেনি, বাহুল্য সেখানে অলংকার, আতিশয্যেই আনন্দ সেখানে—একটু লীলা, একটু উচ্ছলতার বিচিত্র বিমিশ্র তরঙ্গের পর তরঙ্গে রূপচর্চা অপরূপের স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়। একটি মেয়ে যখন স্নানের পর চুল এলিয়ে রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে দাঁড়ায়, যখন বিকেলবেলা ঘাড় বেঁকিয়ে বিনুনি করতে-করতে পাইচারি করে, যখন সে দাঁতের ফাঁকে ফিতে চেপে দু-হাত তুলে খোঁপা বাঁধে, আর যখন শান্ত নিভৃত অবসরে চুলের মধ্যে চিরুনি চালাতে-চালাতে গান করে গুনগুন—এই সবগুলি অবস্থাতেই সে সুন্দর, সুন্দরী না-হ'লেও সুন্দর, কারণ এই সবগুলি কাজের পিছনেই রয়েছে তার প্রাণের প্রেরণা। চুল বাঁধার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত

এমন কোনো ভঙ্গি নেই যা স্বভাব থেকে চ্যুত, জীবনের আদিম ছন্দ থেকে ভ্রষ্ট। একলা একটি মেয়ে যখন চুল বাঁধে, তাকে ঘিরে থাকে প্রশান্তির পরিমণ্ডল, যখন সে চুল খুলে দিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে আঁচড়ায়, তখন তার আঙুলের সঙ্গে চিরুনির, চিরুনির সঙ্গে চুলের, এবং চুলের সঙ্গে আঙুলের এমন একটি নিবিড়মধুর সম্বন্ধ স্থাপিত হয় যে দেখে মনে হয় সমস্ত বিক্ষোভ, সমস্ত অস্থিরতা অতিক্রম ক'রে সে-মেয়ে নিজের মধ্যে একটি পূর্ণতা পেয়েছে। আবার যখন একদল মেয়ে বিকেলের রঙিন রোদ্দুরে বারান্দায় ব'সে পরস্পরের চুল বেঁধে দেয়, কলহাস্যে, কৌতুকে, কটাক্ষে, গ্রীবার ঘূর্ণনে, বাহুর আন্দোলনে, রোদের হলুদে আর আলতার লালে সমস্তটা মিশিয়ে যেন আনন্দ আর ধরে না। কেননা, চুল বাঁধা তো নিছক একটা নিয়মরক্ষা নয়, ওর ভিতর দিয়ে মেয়েরা নিজেদের ব্যক্ত করে, তাদের সমগ্র জীবনের সঙ্গে ওটা যুক্ত। এইজন্যই যে-মেয়ে রাঁধে সে অনায়াসেই চুল বাঁধবার সময় পায়, কিন্তু যে-পুরুষ ছড়া কাটে তার পক্ষে চুল ছাঁটা সহজ নয়। কোনো পুরুষের পক্ষেই নয় হয়তো। তাই, অন্তত আমাদের দেশে, চুল ছাঁটার দোকানগুলি এত নীরস, এমন রুটিন-মানা গুরুগম্ভীর কর্তব্যপরায়ণ তাদের চেহারা।

আমি কল্পনা করতে পারি, যদি শ্রী-পতিদের বদলে সারি-সারি শ্রীমতীদের বসিয়ে দেয়া যেতো, তাহ'লে শান্তির দেবতা রাজত্ব করতেন সেখানে; মুখোমুখি দর্পণে আপন মুখাবয়বের অন্তহীন প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করতে-করতে স্নিগ্ধ গভীর পরিতৃপ্তিতে মগ্ন হ'তো সকলেই। রূপ সম্বন্ধে মেয়েরা

অপরিসীম বিনয়ী ব'লে, যাঁর যেমন চেহারা তা-ই নিয়ে প্রত্যেকে খুশি ব'লে, স্বীয় মুখাবলোকনে সহজে তাঁদের ক্লান্তি হয় না। কিন্তু পুরুষের মনে-মনে ভারি দেমাক যে সে দেখতে ভালো, অথচ এমন আয়না নেই যাতে তার সেই ধারণার সম্পূর্ণ সমর্থন করে; সেইজন্য আয়নার দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকতেই সে ভালোবাসে। বেশির ভাগ ভদ্রলোকই চুল ছাঁটতে ব'সে দেহের ক্লান্তি বা মনের শূন্যতার চাপে ঘুমিয়ে পড়েন; যাঁরা দাড়ি কামাতে আসেন তারা তো চোখে সাবান যাবার ভয়ে আগে থেকেই চোখ বোজেন; আয়নার দিকে বেশ সপ্রেম দৃষ্টিপাত করতে তাঁদেরই শুধু দেখেছি অদৃষ্টদোষে যাঁরা কদাকার। ওখানে অনেকে বিশ্রাম বা আরাম উপভোগ করেন সেটাও সম্ভব; কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত দুশ্চিন্তা সরিয়ে দিয়ে একটা নির্ভয় নিরাপদ ঈষদুষ্ণ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হওয়া যায়, কিন্তু প্রাণের সচলতা নেই সেখানে; দোকানে জিনিশ কিনতে গিয়ে যে-কৌতূহল, যে-ঔৎসুক্য অনুভব করি, তার সমস্ত পথ সেখানে অবরুদ্ধ। পরস্পরের সম্পূর্ণ অপরিচিত কতিপয় ব্যক্তি একই ঘরে আবদ্ধ হ'য়ে এমন বিষয়ে লিপ্ত আছে, যাতে তাদের নিজেদের করবার কিছু নেই, অথচ সশরীরে উপস্থিতি অপরিহার্য—এই চিন্তা মনে আনলেই আমার যেন শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। কত দুঃখে যে ঘষা কাচের কাটা দরজাটি ঠেলে কেশকণাকীর্ণ ঘরটিতে প্রবেশ করি, অন্যে তার কী বুঝবে। অথচ এ-দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য যে প্রার্থনা করবো তারও উপায় নেই, কেননা এ-দুঃখ ঠিক ততদিনই

আছে, দেহ আছে যত দিন, আর দেহের অচির অবসান আমি কিছুতেই ইচ্ছা করি না। তবু তো এমন দিন আসবেই যখন এ-দেহ আমাকে আর ধারণ করবে না—সেই বিদায়ের মুহূর্তে মনে-মনে এই প্রার্থনাই জানাবো যে আর জন্মে যেন মেয়ে হ'য়ে জন্মাই। কিন্তু না—আজকালই যে-রকম হ্রস্বকেশী রূপসী সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি, যতদিনে আমি ম'রে গিয়ে পুনরায় জন্ম নেবো, ততদিন বঙ্গললনার দীর্ঘ কেশ শৃঙ্খলচিহ্নের তালিকাভুক্ত হ'য়ে ইতিহাসের ধূসর কুয়াশায় বিলীন হবে নিশ্চয়ই। সেই সঙ্গে বিদায় নেবে মাথার কাপড়, কপালের সিঁদুর, কণ্ঠস্বরের মৃদুতা, চলাফেরার নম্রতা এবং পুরুষ-প্রভুর প্রবর্তিত আরো অনেক কুসংস্কার। আমার এই এক জন্মেই যখন উপন্যাসের নায়িকাদের চুল গুল্‌ফ থেকে জানুতে এবং জানু থেকে স্কন্ধদেশে উন্নীত হ'লো, তখন পরজন্মে দেশের মধ্যে এমন মেয়ে নিশ্চয়ই থাকবেন না, পরামানিকের কাছে নিয়মিত যিনি যাতায়াত না করবেন। আবার ভুল বললাম—পরামানিক তো আর নয়, তারা হবে রূপশিল্পী, কেশকলাবিদ, সৌন্দর্যসম্পাদক; খুব সম্ভব মার্কিনদেশ থেকে ও-বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি সংগ্রহ ক'রে এনে নিজেদের নামের পুরোভাগে তারা কেউ-কেউ প্রোফেসরের পতাকাও ওড়াবে।—নাঃ, ভেবে দেখেছি, আবার না-জন্মালেও ক্ষতি নেই।

১৯৪৫

# নোয়াখালি

প্রথম চোখ ফুটলো নোয়াখালিতে। তার আগে অন্ধকার, আর সেই অন্ধকারে আলোর ফুটকি কয়েকটি মাত্র। সন্ধ্যাবেলা চাঁদ ওঠার আগে উঠোন ভ'রে আলপনা দিচ্ছেন বাড়ির বৃদ্ধা, মুগ্ধ হ'য়ে দেখছি। রাতের বিছানা দিনের বেলায় পাহাড়ের ঢালুর মতো ক'রে ওল্টানো, তাইতে ঠেশান দিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছি মস্ত বড়ো লাল মলাটের 'বালক' পত্রিকার। রোদ্দুর-মাখা বিকেলে টেনিস খেলা হচ্ছে; একটি সুগোল মসৃণ ধবধবে বল এসে লাগলো আমার পেরাম্বুলেটরের চাকায়, বলটি আমি উপহার পেয়ে গেলুম। কিন্তু সে কোন মাঠ, কোন দেশ, সে কবেকার কথা, আজ পর্যন্ত তা আমি জানি না। আমার জীবনের ধারাবাহিকতার সঙ্গে তাদের যোগ নেই: তারা যেন কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ছবি, অনেক আগে দেখা স্বপ্নের মতো, বছরের পর বছরের আবর্তনেও যে-স্বপ্ন ভুলতে পারিনি। সচেতন জীবন অনবচ্ছিন্নভাবে আরম্ভ হ'লো নোয়াখালিতে: প্রথম যে-জনপদের নাম আমি জানলুম তা নোয়াখালি; নোয়াখালির পথে এবং অপথে আমার প্রথম ভূগোলশিক্ষা, আর সেখানেই এই প্রাথমিক ইতিহাসবোধের বিকাশ যে বছর-বছর আমাদের বয়স বাড়ে। আমার কাছে নোয়াখালি মানেই ছেলেবেলা, ছেলেবেলা মানেই নোয়াখালি।

সব-আগের বাড়িটি একটি বৃহৎ ফল-বাগানের মধ্যে: লোকে বলতো ফেরুল সাহেবের বাগিচা। জানি না ফেরুল কোন পর্তুগিজ নামের অপভ্রংশ। ফলের এত প্রাচুর্য যে মহিলারা ডাবের জলে পা ধুতেন। খুব সবুজ, মনে পড়ে। একটু অন্ধকার। কাছেই গির্জে। শাদা প্যাণ্ট-কোট পরা কালো-কালো লোকেদের অনাত্মীয় লাগতো। গির্জের ভিতরে গিয়েছি; ভিতরটা ছমছমে, থমথমে, বাইরে সবুজ ঘাস, লম্বা ঝাউগাছ, রোদ্দুর। বনবহুল ঘনসবুজ দেশ, সমুদ্র কাছে, মেঘনার রাক্ষসী মোহানার ভীষণ আলিঙ্গনে বাঁধা। সবচেয়ে সুন্দর রাস্তাটির দু-দিকে ঝাউয়ের সারি, সেখানে সারা দিন গোল-গোল আলো-ছায়ার ঝিকিমিকি, আর ঝাউয়ের ডালে-ডালে দীর্ঘশ্বাস, সারা দিন, সারা রাত। দলে-দলে নারকেল গাছ আকাশের দিকে উঠেছে, ছিপছিপে শুপুরি-সখীদের পাশে-পাশে; যেখানে-সেখানে পুকুর, ডোবা, নালা, গাবের আঠা, মাদারের কাঁটা, সাপের ভয়। শাদা ছোটো-ছোটো দ্রোণফুলে প্রজাপতির আশাতীত ভিড়—আর-কোথাও আর-কখনো দেখিনি সে-ফুল—আর কী-একটা গাছে ছোটো গোল-গোল কাঁটাওলা গুটি ধরতো, মজার খেলা ছিলো সেগুলি পরস্পরের কাপড়ে-জামায় ছুঁড়ে মারা—কী তার নাম ভুলে গেছি। হলদে লাল ম্যাজেণ্টা গাঁদায় সারাটা শীত রঙিন, এমন বাড়ি প্রায় ছিলো না যার আঙিনায় গুচ্ছ-গুচ্ছ গাঁদা ধ'রে না থাকতো—শ্যামল সুঠাম এক-একটি বাড়ি, বেড়া-দেয়া বাগান, নিকোনো উঠোন, চোখ-জুড়োনো খড়ের চাল, মাচার উপর সবুজ উদ্গ্রীব

লাউ-কুমড়োর লতায় ফোঁটা-ফোঁটা শিশির। শহরের শ্রেষ্ঠ বাড়িটিতেও থেকেছি আমরা, কিন্তু ও-রকম বাড়িতে কখনো না : কেননা, সরকারি চাকুরেরূপী অধিপতিদের বাসা নয় ওগুলো, অধিবাসীদের বাস্তুভিটা। কতগুলি বাড়ি ছিলো—এমন নিষ্কলঙ্ক-নিকোনো তাদের উঠোন, এমন অস্বাভাবিক পরিচ্ছন্ন, যে যতবার চোখে পড়েছে ততবার অবাক লেগেছে। ও-বাড়িগুলিতে কারা থাকে জিগেস ক'রে জবাব পাইনি। পরে জানতে পেরেছিলুম ওগুলি শহরের গণিকালয়, যদিও গণিকা বলতে ঠিক কী বোঝায় তা তখনও বোধগম্য হয়নি।

এমন কোনো পথ ছিলো না নোয়াখালির, যাতে হাঁটিনি, এমন মাঠ ছিলো না যা মাড়াইনি, দূরতম প্রান্ত থেকে প্রান্তে, শহর ছাড়িয়ে, বনের কিনারে, নদীর এবড়োখেবড়ো পাড়িতে, কালো-কালো কাদায়, খোঁচা-খোঁচা কাঁটায়, চোরাবালির বিপদে। শীতের ভোরবেলা নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি; যদিও অলস্টর আর কানঢাকা টুপিতে মোড়া, তবু বিশ্ববিধান আমার অসম্মান করেনি, শান্তাসীতার নীলাভ রেখাটি যেখানে শেষ হয়েছে, দিগন্তের সেই কুহক থেকে দেখা দিয়েছে আগুন-রঙের সূর্য, প্রথমে কেঁপে-কেঁপে, তারপর লম্বা লাফে উঠে গেছে আকাশে, দুরন্ত জলকে ঝলকে-ঝলকে লাল ক'রে দিয়ে। আবার সন্ধ্যাবেলা লাল-সোনার খেলা পশ্চিমে। কখনো গেছি সুদূর রেল-স্টেশনে রেল-লাইনের নুড়ি কুড়োতে, কখনো জেলখানার পিছনে ভূতুড়ে মাঠে, কি নৌকো-চলা খালের ধারে বাঁশ-পচা গন্ধে। একবার কী-কারণে পুলিশ

লাইনে তাঁবু পড়েছিলো, দুপুরবেলা তাঁবুর মধ্যে শুয়ে-শুয়ে ঘাসের গন্ধে নেশার মতো লেগেছিলো আমার, প্রায় ঘুমিয়ে পড়তে-পড়তে মনে হয়েছিলো সংসারটা জঞ্জাল, সমস্ত গোলমাল অর্থহীন, সবচেয়ে ভালো রাখাল হ'য়ে মাঠে-মাঠে ঘুরে বেড়ানো, গাছের ছায়ায় ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়া। হয়তো এখানে বলা দরকার যে তখন পর্যন্ত আমি রবীন্দ্রনাথ পড়িনি—রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতাই না।

অন্য সব যখন শেষ হ'লো, তখন ফিরতে হয় নদীর কাছেই। নোয়াখালির সর্বস্ব ঐ নদী, নোয়াখালির সর্বনাশ। সবচেয়ে জমকালো সম্পত্তি, সবচেয়ে নিদারুণ বিপদ। সে-নদী মনোহরণ নয়; বাংলা দেশের অন্য কোনো নদীর মতোই নয় সে, না গঙ্গা, না পদ্মা, না কোপাই। বিশাল, শ্রীহীন, দুর্দান্ত, অমিত্র, অসেতুসম্ভব। কেউ স্নান করতে নামে না; উপায় নেই। নানা রঙের শাড়ি-পরা ছিপছিপে তরুণীদের মতো নানা রঙের পাল-তোলা নৌকো এখানে কোথায়—বছরে দু-এক মাস, ভরা গ্রীষ্মের সময়, অর্ধেকটা নদী জুড়ে প'ড়ে থাকে বালি আর কাদা, তখন একটি খেয়া অতি কষ্টে পারাপার করে, আর বর্ষাকালে যে-একটি নড়বড়ে স্টিমার কুমির-রঙের ঢেউয়ের উপর দিয়ে কেঁপে-কেঁপে সন্দীপে যায়, কিংবা হাতিয়ায়, তার দিকে তাকালেই ভয় হয় এই ডুবলো বুঝি। মানুষের লাভের বা লোভের দিন-মজুরি এ-নদী করলো না; মানুষের ভালোবাসাকেও ভাসিয়ে দিলো কুটিল গোগ্রাসী আবর্তে। ধারে-ধারে না উঠলো কারখানা, না বাগান-বাড়ি; ধার দিয়ে বেড়াবার একটি পাকা

শড়ক—তা পর্যন্ত হ'তে দিলো না। মেয়েদের সঙ্গে গলাগলি ভাব ক'রে গ'লে যাওয়া তার কোষ্ঠীতে লেখেনি, বাবুদের নৌকো চড়িয়ে হাওয়া খাওয়াবে এমন দিন যদি আসেই তার আগে গলায় দড়ি দিয়ে মরবে সে। আর-কিছু না, শুধু ভাঙবে। খাড়া পাড়, পাহাড়ের গায়ের মতো ফাটা-ফাটা, ভাঙা-ভাঙা; তার ঠিক নিচেই ঘুরপাক-খাওয়া তীব্র মত্ত জল; আর ঝুপঝুপ ক'রে ধ্ব'সে পড়ছে মাটি, যারা দাঁড়িয়ে আছে কি হেঁটে-চ'লে বেড়াচ্ছে, একেবারে তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি যাচ্ছে স'রে, ফাটল ধরছে আবার একটু দূরে, কখনো প্রকাণ্ড চাকে গাছপালা সুদ্ধু ভেঙে পড়লো কান-ফাটানো শব্দে, কাছের বাড়িগুলি বলির পাঁঠার মতো দাঁড়িয়ে। আদি শহরটি অত্যন্তই ছোটো হয়তো ছিলো না, নদী নাকি ছিলো তিন-চার মাইল দূরে, কিন্তু ঘোড়ার মতো লাফিয়ে-লাফিয়ে নদী এগিয়ে এলো এমন দ্রুতবেগে যে দেখতে-দেখতে কুঁকড়ে ছোট্ট হ'য়ে গেলো নোয়াখালি। আমি শেষ দেখেছি শহরের ঠিক মাঝখানটিতে টাউন হলের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে অমিতক্ষুধা জল, তার পর শুনেছি আরো ক্ষয়েছে; যে-নোয়াখালি আমি দেখেছি, যাকে আমি বহন করছি আমার মনে, আমার জীবনে, আমার স্মৃতিসত্তায়, আজ তার নাম মাত্রই হয়তো আছে—কিংবা কিছু নেই, কিছুই নেই।

আর সেই সব মানুষ? সেই আধ-বুড়ো পর্তুগিজ, যে-দুর্দম জলদস্যুরা বঙ্গোপসাগরের প্রতিটি উপকূলে একদিন

তাণ্ডব বাধিয়েছিলো, তাদেরই প্রক্ষিপ্ত, উচ্ছিন্ন, সর্বশেষ ধ্বংসাবশেষ? গায়ের রং তার আমাদের মতোই কালো, চুলের রং পুরোনো পয়সার মতো, ময়লা প্যাণ্ট-কোট পরনে, পায়ে জুতো নেই। খাশ নোয়াখালির বাংলা বলতো সে, প্রায় সারা দিনই পথে-পথে ঘুরে বেড়াতো, পথের কোনো ভদ্রলোককে ধ'রে জুড়ে দিতো আলাপ, চেয়ে নিতো চুরুট কিংবা দু-চার আনা পয়সা। আর সেই অদ্ভুত রহস্যময় প্রায়-অলৌকিক মূর্তি—লম্বা, পাথরের মতো মুখে জ্বলজ্বলে চোখ বসানো, গোড়ালি থেকে গলা পর্যন্ত মস্ত ফোলা-ফোলা আলখাল্লায় ঢাকা, পিঠে ঝুলি, হাতে—বোধহয় একটা শানাই কিংবা ঐ-রকম কোনো যন্ত্র। মনে পড়ে না সে-যন্ত্রে সে কখনো ফুঁ দিয়েছে, মনে পড়ে না কখনো তাকে কথা বলতে শুনেছি। বেশির ভাগ তাকে দেখা যেতো হাটে-বাজারে, আর যত দূর থেকেই হোক, তাকে দেখামাত্র একটা কিলবিলে লিকলিকে অস্বাভাবিক ভয়ে আমি প্রায় ম'রে যেতুম, হাতের আঙুল যদি গুরুজনের মুঠোয় ধরা থাকতো, তবু সে-ভয় পোষ মানতো না। ঋজু, নিঃশব্দ, ঘনগম্ভীর ঐ মূর্তিকে কিছুতেই আমি ভাবতে পারতুম না মানুষ ব'লে। ঐ ঝুলিতে কী আছে? ভাবতে শিউরে উঠতুম। ও কোথায় যায়, কী খায়, কী করে? ভাবতে কাঁটা দিতো গায়ে। এমন সব কথা আমার মনে হ'তো যার কোনো ভাষা নেই; সে যেন বালকের কল্পনা মাত্র নয়, পূর্বপুরুষের সমস্ত ভীতিকর অভিজ্ঞতার অচেতন সঞ্চয়। যাতে অকল্যাণ, যাতে অন্ধকার, যাতে অবরোধ, আর যা-কিছু বিকৃত, বীভৎস, পিচ্ছিল,

পৈশাচিক, সেই সমস্ত-কিছুর অবতার ছিলো আমার কাছে ঐ—খুব সম্ভব নিরীহ পাগল। পাগল হোক আর না-ই হোক, সে যে নিরীহ ছিলো এখন তা বোঝা সহজ, তবু তার কথা ভাবলে আজ পর্যন্ত একটা ছমছমানির ঢেউ ওঠে আমার শরীরে।

যারা প্রধানত আমার সঙ্গী ছিলো, তাদের বাবারা কেউ এস. ডি. ও, কেউ পি. ডব্লিউ. ডি,র কর্তা, কেউ বা পুলিশের ইন্সপেক্টর। অনেকেই তারা নোয়াখালিতে এসেছে আমার পরে, অনেকেই বিদায় নিয়েছে বদলির ধাক্কায় আমার আগেই। কিন্তু আরো অনেকে ছিলো যারা বদলির ঘুরপাকের বাইরে, বিলেতি কিংবা স্বদেশি সরকারের খুচরো কিংবা পাইকেড়ি বদলির হুকুমে উন্মূলিত হবে না যে-সব মানুষ। তারা আমার অস্তিত্বের অংশ ছিলো তখন। কয়েকটি পরিবার ছিলো একটু উঁচ-কপালে, গুহ, গুহরায়, রায়চৌধুরী; ছেলেরা পড়তো কলকাতায় কলেজে, ছুটিতে এসে হৈ-হৈ করতো শহর ভ'রে, নাটক করতো টাউন হলে, ডাকের জন্য দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিতো পোস্টাপিশের বাইরে সকালবেলায়। নন-কো-অপারেশনের ঝড় যখন উঠলো, তাদের কেউ-কেউ উড়ে গিয়ে জেলে পড়লো, হিংসেয় বুক ফেটে গেলো আমার, শতবার ধিক্কার দিলুম নিজেকে আর কয়েকটা বছর আগে জন্মাইনি ব'লে। আর সেই সঙ্গে তারা ছিলো, যারা অনেক এবং অনুল্লেখ্য, যারা কোনোদিন জেলে যায়নি বা দ্রষ্টব্য কিছু করেনি; যারা বেঁচেছে তেমনি নিঃশব্দে, যেমন নিঃশব্দ আমাদের নিশ্বাস। যামিনী মাস্টার

অঙ্ক কষাতেন আমাকে, তাঁর রাতের আহারের বরাদ্দ ছিলো আমাদের সঙ্গে, ঠিক আটটায় বারান্দায় শোনা যেতো তাঁর কাশি, হ্রস্ব, কুণ্ঠিত, সশ্রদ্ধ—ক্ষুধার সঙ্গে যার পরিচয় আছে, খাদ্যের প্রতি সেই মানুষের শ্রদ্ধা স্বল্পতম শব্দে তিনি প্রকাশ করতেন। তালতলার অশ্বিনী কবিরাজের নাম-ডাক ছিলো শহরে—সময়ে-অসময়ে এবং কারণে-অকারণে তাঁর লাল-কালো বড়ি আমাদের খেতে হ'তো; তাঁর নিজের চেহারা তাঁর ওষুধের বিজ্ঞাপনের কাজ করতো না, কিন্তু বৈঠকখানাটি করতো—রোদালো ঘর, পরিষ্কার ফরাশ, ঝকঝকে দেয়াল-ঘড়ি, আর ঘন একটা কবরেজি গন্ধ। এই সব পারিবারিক চেনাশোনার বাইরেও দু-একজন বন্ধু হয়েছিলো আমার, মুসলমান তারা, অত্যন্ত বিনীত, আমার বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ। একজন পোস্টাপিশে চিঠির টিকিটে ছাপ মারতো, সুশ্রী ছিলো সে, নম্র ছিলো কণ্ঠস্বর। আর-একজনের সঙ্গে গিয়েছিলুম বনপথ দিয়ে অনেকদূর হেঁটে তাদের গ্রামের বাড়িতে, খেতে দিয়েছিলো ডাবের জল আর ডাবের শাঁস, ঘন গাছপালার ভিতর দিয়ে বিকেলের লাল রোদ্দুর এসে পড়েছিলো। জানি না এরা সব কোথায় আছে এখন, জানি না এরা সব এখন কেমন আছে।

ভোর আসতো নোয়াখালিতে মোরগ-ডাকের সোনালি রথে চ'ড়ে—কোক্-কোরোক্-কো, কোক্-কোরোক্-কো—দিনের অভ্যর্থনা ধ্বনির ফোয়ারায় লাফিয়ে উঠতো আকাশে, আর সেই সঙ্গে শোনা যেতো পথে-পথে খোলা গলার উল্লাস, গ্রাম থেকে যারা শহরে আসছে শজি দুধ গুড়ের হাঁড়ি

বেচতে তারা শীতের কুয়াশায় পরস্পরকে হারিয়ে ফেলে, কিংবা মিছিমিছি, নিছক ফুর্তিতে চীৎকার ক'রে ডাকছে: এড়িও—আড়িড়্—ৎ! এড়িও—আড়িড়—ৎ! একজন ডাকলো তো চার জন জবাব দিলো চার দিক থেকে, সমস্ত সকালটা ভ'রে উঠলো সেই তীক্ষ্ণ লম্বা গিটকিরি আওয়াজে, শেষের দিকটা ছুঁচোলো হ'য়ে প্রতিধ্বনির পিন ফুটিয়ে দিয়ে গেলো। আর কোথাও শুনিনি ঐ ডাক, ঐ ভাষা, ঐ উচ্চারণের ভঙ্গি। বাংলার দক্ষিণপূর্ব সীমান্তের ভাষাবৈশিষ্ট্য বিস্ময়কর। চাটগাঁর যেটা খাঁটি ভাষা তাকে তো বাংলাই বলা যায় না, আর নোয়াখালির ভাষা, আমার মতো জাত-বাঙালকেও, কথায়-কথায় চমকে দিতো। শুধু-যে ক্রিয়াপদের প্রত্যয় অন্য রকম তা নয়, শুধু-যে উচ্চারণে অর্ধস্ফুট 'হ'-এর ছড়াছড়ি তাও নয়, নানা জিনিশের নামই শুনতুম আলাদা। সে-সমস্ত কথাই মুসলমানি ব'লে মনে করতে পারি না, অনেক তার মগ, কিছু হয়তো বর্মি, আর পর্তুগিজের কোন না ছিটেফোঁটা। একে তো সমস্ত বাংলাই পাণ্ডববর্জিত, তার উপর বাংলার মধ্যেও অনার্যতর হ'লো বাঙালদেশ, আবার সেই বাঙালদেশেও সবচেয়ে দূর, বিচ্ছিন্ন, মিশ্রিত, অশ্রুত এই নোয়াখালি।

নোয়াখালির নগণ্যতা নিয়ে তীব্র আক্ষেপ ছিলো আমার মনে। ভেবে পেতুম না, বিধাতা বেছে-বেছে আমাকে এমন জায়গায় ছুঁড়ে ফেললেন কেন, যার নাম কখনো ছাপার অক্ষরে ওঠে না। কলকাতা দিল্লি বম্বাইয়ের কথা ছেড়েই দিচ্ছি—ও-সব তো স্বপ্ন—খবরকাগজে দেখতুম

ঢাকা বরিশাল বাঁকুড়া শিলচরের কথা, এমনকি তমলুক নেত্রকোনা সিরাজগঞ্জের খবরও মাঝে-মাঝে ছাপা হ'তো, কিন্তু নোয়াখালি—ও আবার একটা জায়গা, আর তার আবার একটা খবর! যদি-বা দু-চার মাসে একবার মফস্বল নোটস-এর মধ্যে একটু জায়গা হ'তো নোয়াখালির, সে এতই ছোটো আর এতই ছোটো অক্ষরে যে রীতিমতো অপমান বোধ হ'তো আমার। কেন, এমনই কী তুচ্ছ জায়গাটা? এখানে এমন কয়েকটি যুবক তো আছেন যাঁরা নূতনকে লেখেন নতুন আর নতুন লেখেন ন-এ ওকার দিয়ে; এখানে 'সবুজপত্রে'র একজন অন্তত গ্রাহক আছেন—শুধু তা-ই নয়, এমন একজন ভদ্রলোকও আছেন যাঁর প্রবন্ধ 'সবুজপত্রে' ছাপা হ'য়ে 'প্রবাসী'র কষ্টিপাথরে উদ্ধৃত হয়েছে! আর অসহযোগের উন্মাদনার দিনে নোয়াখালি কি পেছিয়ে ছিলো কারো তুলনায়? স্কুল ছাড়া বলো, জেলে যাওয়া বলো, মীটিং, বক্তৃতা, গান—কোনটাতে কম! বন্দে মাতরম্ আর আল্লা-হো-আকবর, এই যুগ্ম-নিনাদ কি উচ্ছ্বসিত হয়নি গানের দুই চরণের মতো; মোটা খদ্দর প'রে এঁটেল গ্রীষ্মে কি ঘামিনি আমরা, কুলির রক্ত জ্ঞান ক'রে ত্যাগ করিনি চা? তবু, তবু কাগজওলাদের চোখে পড়লো না নোয়াখালি, এমনি অন্ধ তারা! এই নীরন্ধ্র অখ্যাতির মধ্যে বসবাস করতে আমার আর ভালোই লাগছিলো না; কিন্তু চোখের উপর অমুক-অমুক বাবু বদলি হ'য়ে গেলেন কেউ চট্টগ্রামে, কেউ রংপুরে, কেউ ময়মনসিংহে; আমাদের ভাগ্যে শুধু বাসা-বদল এ-পাড়া

থেকে ও-পাড়ায়, আমরা প'ড়ে আছি যে-তিমিরে সে-তিমিরে। শেষ পর্যন্ত যখন নোয়াখালি ছাড়বার দিন এলো আমাদের, এবং বোঝা গেলো আর আমরা ফিরবো না সেখানে, সেদিন আমি সুখীই হয়েছিলাম, আমার কিশোর প্রাণ একবারও কাঁদেনি বাল্যকালের লীলাভূমিকে পিছনে ফেলে যেতে।

এতদিনে প্রতিশোধ নিয়েছে নোয়াখালি, ভীষণ প্রতিশোধ; ছড়িয়ে দিয়েছে তার নাম বড়ো-বড়ো অক্ষরে, শুধু বাংলার বা ভারতের নয়, লণ্ডন, নিউ ইঅর্কের খবর-কাগজে, এঁকে দিয়েছে তার নাম আরক্ত অক্ষরে মেয়েদের হৃৎকম্পনে, মায়েদের হৃৎপিণ্ডে। এমনকি সেই রামগঞ্জ থানা, যেখানে খালের উপর বাঁকা সাঁকো, আর খালের জলে কচুরি পানার বেগনি ফুলের আলো, যেখানে একবার নৌকো ক'রে বেড়াতে গিয়ে নারকোল দিয়ে রাঁধা কইমাছ অমৃতের মতো খেয়েছিলুম, যার অস্তিত্ব সমস্ত পৃথিবীতে কেউ জানতো না, সেই রামগঞ্জের নাম আজ সারা বাংলার মুখে-মুখে। রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, শ্রীরামপুর···তুচ্ছ ভেবেছি এই সব নাম, অতি তুচ্ছ, আর আজ তারা কত বড়ো, কী মারাত্মকরকম বড়ো। ঈর্ষাযোগ্য নয় এই ভাগ্য, কিন্তু···কে জানে। গান্ধী আজ সেখানে, আর গান্ধীর চেয়ে বাঞ্ছনীয় আজকের পৃথিবীতে আর কী?

ইতিমধ্যেই খবর-কাগজে নোয়াখালির খবরের অক্ষর হয়েছে ছোটো, স্থান সংকুচিত। তাতে অবাক হবার কিছু নেই: কেননা খবর-কাগজে ঠিক জায়গায় ঠিক খবরটি প্রায়ই

বেরোয় না, পৃথিবীর সত্যিকার বড়ো খবরগুলি তো একেবারেই বাদ।১ জীবনে যাদের প্রধান উৎসাহ ধনবৃদ্ধি, ঘোড়দৌড় আর পলিটিক্স নামক সংঘবদ্ধ প্রতারণা, মুখ্যত তাদেরই জন্ম পৃথিবীর সব ক-টি সর্বোত্তম সংবাদপত্র, অনুত্তমদের কথা কিছু না-ই বললাম। পয়লা পাতায় আবার জাঁকিয়ে বসেছে দিল্লি লণ্ডন নিউ ইঅর্ক; কিন্তু বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা আস্তে-আস্তে উন্মীলিত হচ্ছে বাংলার অখ্যাততম অনার্যভূমিতে; বর্তমান সময়ের শুধু নয়, চিরকালের চরম একটি প্রশ্নের উত্তর সেখানে রচিত হ'লো, যার প্রভাব আজ মনে হ'তে পারে অকিঞ্চিৎকর;—কিন্তু ছড়াবে, ছড়িয়ে পড়বে, ছড়িয়ে দেবে মাটির তলে-তলে শিকড়, দূরান্তরে, যুগান্তরে, বিকশিত হবে ফুলে পল্লবে ভ্রমরে, তারপর হয়তো ফলে নীড়ে পাখিতে তু-চার শতাব্দী পরেকার কোনো প্রভাতে। মানুষের মধ্যে যে-অংশ জীব, তার ইতিহাস আজ যুদ্ধের পরে গ'ড়ে উঠছে পৃথিবীর নামজাদা নগরগুলিতে; কিন্তু মানুষের মধ্যে যে-অংশ দেবতা, অন্তত দেবাভিমুখী, তার ইতিহাসের ক্ষেত্র আজ সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র নোয়াখালি।

নিষ্ঠুর শোনাবে কথাটা, তবু বলবো, ভাগ্যিশ নোয়াখালি ঘটেছিলো। তাই তো গান্ধী মুক্তি পেলেন দিল্লি-লণ্ডনের কূটচক্র থেকে; বম্বাই-আহমেদাবাদের ঘনজটিল জাল থেকে; সভা, সমিতি, দল, দলপতি, বিতর্ক, মন্ত্রণার অশেষ-বিষাক্ত পরিমণ্ডল থেকে; সংখ্যা, তথ্য ও আইনের পিচ্ছিলতা থেকে; লোভীর সঙ্গে লোভীর বিশ্বব্যাপী

প্রতিযোগিতার প্রচ্ছন্ন-প্রখর আবর্ত থেকে; স্বর্গরাজ্যের সর্বনাশী পরিকল্পনা থেকে; মিথ্যা থেকে, মত্ততা থেকে; গণ-নেতার আবশ্যিক আত্মহত্যা থেকে। গণ-নেতার নেতাই তো জনগণ, আর জনতার প্রমত্ততা যেহেতু সমাজের একটা মৌল সত্য, তাই নেতৃপদে একবার অভিষিক্ত হ'লে বার-বার চারিত্রচ্যুত না-হ'য়ে উপায় থাকে না কোনো মানুষের। মানুষের পক্ষে ভালো হওয়া সম্ভব শুধু একলা হ'লে, সংঘবদ্ধ হ'লেই সে মন্দ; অথচ এমনি আমরা বোকা যে মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যে ছ-ছ-বার সংঘবদ্ধ মানুষের নারকীয়তা প্রত্যক্ষ ক'রেও, এবং তার অনেকগুলি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রীতিমতো মুখস্থ থাকা সত্ত্বেও, এখনো আমরা জনগণের উদ্ধারকারীকে বিশ্বাস করি। এখনো এ-শিক্ষা আমাদের হ'লো না যে রাজনৈতিকের হাত থেকে যে-স্বাধীনতা আমরা পেতে পারি, তাতে আমরা বাঁচবো না; রাজনৈতিকরা যা দিতে পারেন, তার প্রত্যেকটিই মারণাস্ত্র, যুগে-যুগে শুধু অস্ত্র-বদল হয়, আর আমরা হৈ-চৈ করি প্রথম কিছুদিন তা-ই নিয়েই; পুরোনো মরচে-পড়া খাঁড়ার বদলে ঝকঝকে নতুন তলোয়ার দেখে তাকেই ভুল করি জীয়ন-কাঠি ব'লে। ইতিহাসের প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত এ-ই আমরা দেখে এলাম, তবু ভুল ভাঙলো না, তবু আমরা মোহাচ্ছন্ন।

এই মোহ থেকে বেরিয়ে এলেন পৃথিবীতে একজন মানুষ। সমস্ত জীবন তিনি স্বদেশের জন্য ক্ষয় করলেন রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায়, দীর্ঘ, তিক্ত, উন্মথিত বছরের

পর বছর ;—তারপর সেই রাষ্ট্রগঠনের সময় যখন এলো, তখন? তখন দেখলেন, যে-স্বাধীনতার জন্য সমস্ত দেশকে খেপিয়ে দিয়েছিলেন, তার প্রথমতম সম্ভাবনাতেই হিংসা উঠলো উদ্বেল হ'য়ে। তাহ'লে কী হ'লো, তাহ'লে কী হ'লো? স্তম্ভিত হ'য়ে রইলেন কয়েক দিন, তারপর যাত্রা শুরু হ'লো। দিল্লি তাঁকে দলে পেলো না, ওয়ার্ধা তাঁকে বেঁধে রাখলো না, মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেলো লণ্ডন প্যারিস নিউ ইঅর্ক। পথের মানুষ আবার পথে নামলেন। ভেঙে দিলেন আশ্রম, ছেড়ে দিলেন সঙ্গীদের, দেহের ন্যূনতম প্রয়োজনের অভ্যাসকেও ফেলে দিলেন ছুঁড়ে, একলা হলেন, শুদ্ধ হলেন, মুক্ত হলেন। এ-মুক্তিতে তাঁর প্রয়োজন ছিলো। এ না-হ'লে ব্যর্থ হ'তো তাঁর সমস্ত জীবনের সাধনা। এই তাঁর পূর্ণতা, তাঁর প্রায়শ্চিত্ত, যুধিষ্ঠিরের মতো কঠিন শোকাচ্ছন্ন নিঃসঙ্গ স্বর্গারোহণ।

কোন স্বর্গে? যেখানে সব আলো, সব খোলা, সব সহজ। যেখানে ভয় নেই, বীরত্বও নেই। লোভ নেই, ত্যাগও নেই। ক্রোধ নেই, সংযমও নেই। যেখানে আশ্রয় নেই, তবু নিশ্চয়তা আছে। যেখানে বিফলতা নিশ্চিত, তবু আশা অন্তহীন। তিনি বেরিয়ে পড়লেন নোয়াখালির পথে, পায়ে হেঁটে, একা। গেলেন গ্রাম থেকে গ্রামে, বাড়ি থেকে বাড়িতে, কথা বললেন প্রত্যেকের সঙ্গে, অংশ নিলেন প্রত্যেকের জীবনের। বয়স তাঁর আটাত্তর। স্বজন বহুদূরে। বজ্র-কঠিন শরীর, তবু মানুষের রক্তমাংস। অমিতশান্ত স্বভাব, তবু মানুষের মন। কোথায়

প'ড়ে রইলো তাঁর দেশ, যেখানে বছরের পর বছর তিনি কাটিয়েছেন ভক্ত বন্ধুদের সাহচর্যে, আর কোথায় এই সিক্ত, কর্দমাক্ত, অসংস্কৃত, অবান্ধব নোয়াখালি! কোথায় তাঁর পথের শেষ জানেন না; কখনো ফিরবেন কিনা তাও জানেন না।...কিন্তু কেন? অহিংসার অগ্নিপরীক্ষা হবে ব'লে? চিরস্থায়ী শান্তি আনবেন ব'লে? ও-সব কথা কিছু বলতে হয় ব'লেই বলা: ও-সব কিছু না। আসল কথা, স্বর্গকে তিনি পেয়েছেন এতদিনে; সেই স্বর্গ নয়, যা দিয়ে পারলৌকিকে রচনা করেন জনগণের সমস্ত বঞ্চিত কামনার, ঈর্ষার, কুসংস্কারের তৃপ্তিস্থল, আর পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করতে-না-করতে যা প্রতিপন্ন হয় আরো একটি যুদ্ধের মাতৃজঠর; সেই স্বর্গ, যা ছাড়া আর স্বর্গ নেই, যা মানুষ সৃষ্টি করে একলা তার আপন মনে, সব মানুষ নয়, অনেক মানুষও নয়, কেউ-কেউ যার একটুমাত্র আভাস মাঝে-মাঝে হয়তো পায়, কিন্তু যাকে সম্পূর্ণ রচনা ক'রে সম্পূর্ণ ধারণ করতে যিনি পারেন তেমন মানুষ কমই আসেন পৃথিবীতে, খুবই কম;—আর তেমনি একজনকে আজ আমরা চোখের উপর দেখছি বিদীর্ণ বিহ্বল নোয়াখালির জলে, জঙ্গলে, ধুলোয়। নম্র হও, নোয়াখালি; পৃথিবী, প্রণাম করো।

১৯৪৭